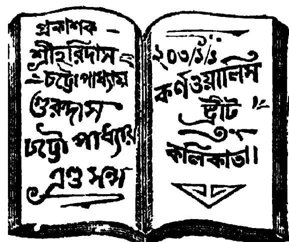
বামুন-বাগ্দী

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

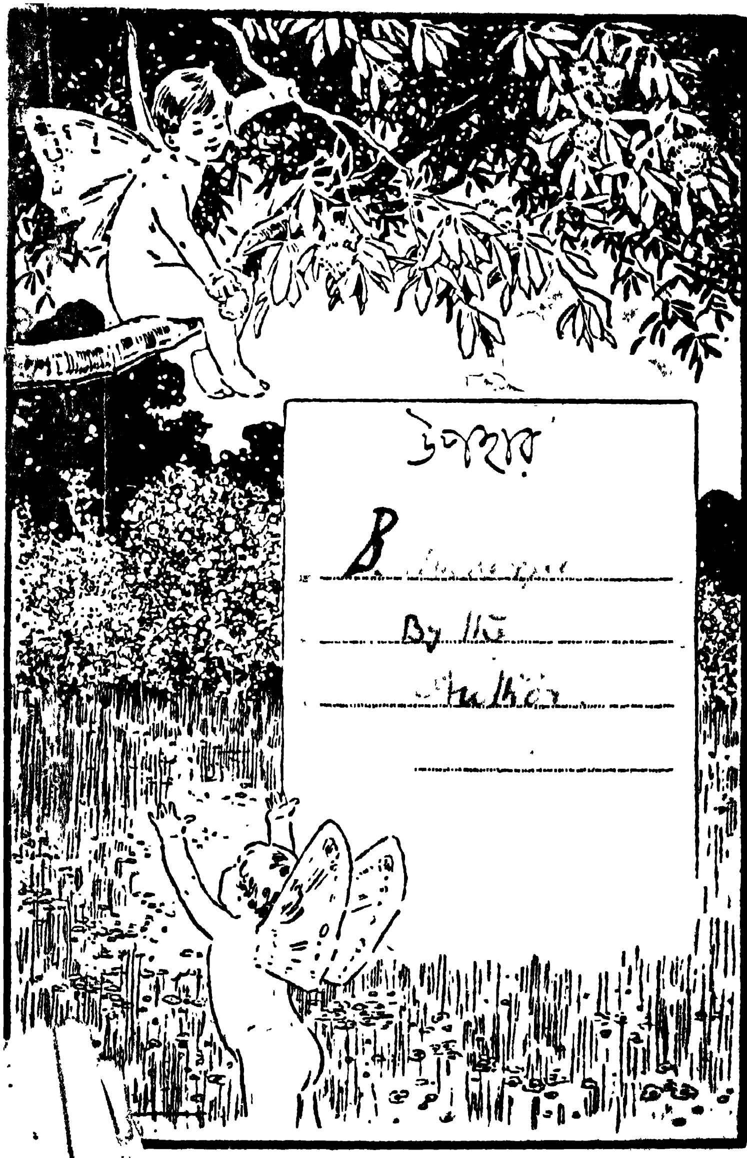
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ফাল্গুন—১৩৩২

মূল্য দুই টাকা



প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা


উপহার
By the
Author

উপহার

।জ্যোতির্ম্ময়ি,

নিষ্ঠুর কাল তা'র আচম্‌কা আঘাতে তোমার বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে! কিন্তু মা, সত্যের এ সম্বন্ধ—এ নিগূঢ় যোগ ছিন্ন করিবার শক্তি তা'র আছে কি? প্রকৃতির কার্য্য—আকস্মিকের স্পর্শে চঞ্চল করা; আর শক্তিমানের কার্য্য—তাহাতে অবিচলিত থাকা। নৈরাশ্য আর বিড়ম্বনা দিয়াই সংসারে মানব জীবনের পরীক্ষা। তুমি শক্তিমতী, এ কঠোর পরীক্ষায় জয়ী হইতে পারিবে, আমার ভরসা আছে। তোমাকে আনন্দ দিয়া জাগ্রত রাখিবার কোন বস্তুই হাতে পাই না। "বামুন-বাগ্দীকে" তোমার হাতে দিলাম, যদি ক্ষণিকের জন্য তোমার মুখে আনন্দের মৃদু-দীপ্তিও ফুটিয়া উঠে, সার্থকতায় আমার স্নেহের দাবী পূর্ণ হইবে।

আশীর্ব্বাদ—

তোমার ছোট কাকাবাবু

নিবেদন

আমার প্রণীত "প্রণয়-প্রতিমা" শীর্ষক উপন্যাসখানি মাদ্রাজে তেলিগু ভাষায় অনুদিত হওয়ায় আমাকে কম উৎসাহিত করে নাই। "বামুন-বাগদী" সুপ্রসিদ্ধ প্রবাসী পত্রে সুদীর্ঘকাল ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। দেশবাসীর আগ্রহ ও তাড়নায় অতি সত্বরই তাহাকে কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে হইল। আমি নিদারুণ শোকে কাতর। যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া থাকে সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহ প্রকাশে মার্জ্জনা করিবেন।

খেশরা—খুলনা
১৩৩২ সাল—১লা ফাল্গুন

বিনীত
গ্রন্থকার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুখেন্দু বাড়ীর ভিতরে আসিয়া দেখিলেন, মহেশ্বরী রোজকার মতই পূজায় বসিয়াছেন। শিশুটি পূজার ঘরের বারাণ্ডায় দরজার নিকট বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে কতকগুলি কাঠের খেল্‌না এবং সন্দেশ, খেজুর, কিস্‌মিস্‌ ইত্যাদি মিষ্টদ্রব্য কতক মাটিতে ও কতক বাসনের চারিধারে ছড়ানো রহিয়াছে। বালকটি কখন খেল্‌না লইয়া খেলা করিতেছে, কখন বা সেগুলি ফেলিয়া মিষ্টদ্রব্যগুলি উদরসাৎ করিবার জন্য মনোযোগী হইতেছে। সুখেন্দু তাঁহার স্ত্রী শৈলবালার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ছেলেটি-সম্বন্ধে কোন সংবাদই স্বামীকে দিতে পারিলেন না, বলিলেন, "আমি তখন স্নান করিতে গিয়েছিলাম। এসে দেখি ছেলেটি ঐখানে বসে' আপন মনে খেলা কর্‌ছে। এ-ছাড়া আর কোনো খবর আমি জানিনে।"

মহেশ্বরী যখন পূজা শেষ করিয়া বাহির হইলেন, তখন সুখেন্দু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! নবীন গেল কোথায়? এখানে ছেলেটাকে ফেলে গেল নাকি?"

মহেশ্বরী পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন,—এই শিশুকে লইয়া তাঁহার অনেক ভোগই ভুগিতে হইবে। তিনি হাসিয়া নরম-সুরে বলিলেন, "হাঁ বাবা! আমিই রেখে দিয়েছি।"

সুখেন্দু ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "তোমরা আগুপিছু ভেবে ত কোন কর্‌বে না। ঐ দুধের বালক, ওকে নাওয়াতে খাওয়াতে হবে; তেও ত পার্‌বে না একা, এ-সব কি করে' চালাবে?"

মহেশ্বরী তেমনি শান্তস্বরেই কহিলেন, "বাবা! আমাদের হাতে আশ্রয় আগু-পিছু দেখ্‌তে নেই। ওর-ও ত একটা আশ্রয় চাই। তোদের খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছেন—ওকে-ও তিনি মানুষ কর্‌বেন।"

সুখেন্দু একটু উগ্রস্বরেই কহিলেন, "তুমি দিবারাত্র পূজা-আহ্নিক নিয়ে আছ;—একটা বাগ্দীর ছেলে—যার নাড়ী-নক্ষত্তর জ্ঞান হয়নি তাকে তুমি মানুষ কর্‌বে?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "বাবা! মানুষ যখন অসহায় হ'য়ে পড়ে তখন তার সহায় হ'তে হ'লে বিচার-আচার চলে না। শুধু মর্য্যাদার খাতিরে নিরাশ্রয় আত্মাকে আত্মা থেকে পৃথক করে' আপনাকে বৃথা একটা তৃপ্তি ও স্বস্তির মধ্যে ডুবিয়ে রাখ্‌তে বলিস্‌নে বাবা!"

সুখেন্দু কহিলেন, "তুমি সোজা কথায় বলো, তুমি তা হ'লে ঐ বাগ্দীর ছেলেটাকে নিয়ে একাকার করে' তুল্‌তে চাও?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তা চাইনে, তা কর্‌বও না। কিন্তু মনে ঐ-রকম একটা বিকার থাকাই দোষের। ভিতরের চেয়ে বাইরের দিকে কেন অযথা অতটা জোর দিস্‌? তুই দেখিস্‌, ওকে বাঁচিয়ে তুল্‌তে আমার জা'ত খোয়াতে হবে না। বাগ্দীর ছেলে বলে'ই এমন সুযোগ ছেড়ে আতঙ্কে পিছিয়ে যেতে বলিস্‌? ছাখ্‌ সুখেন! আমার জা'তকে আমি যেমন বাঁচিয়ে চলি, সেইরূপ অপর একজন তার নিজের জা'তকেও বাঁচিয়ে চলে, সেজন্য কেহ কাহারও গ্লানি করে না। যার যেটুকু পেতে বাধে না, সেটুকু না পেলেই বিচ্ছেদ ঘটে, দুয়েরই বলক্ষয় হয়।"

অগত্যা সুখেন্দু একটুকু স্বর নামাইয়া কহিলেন, "কিন্তু তুমি বুঝ্‌তে পারছ না মা! ওকে নিয়ে তোমাকে কতটা অসুবিধের মধ্যে হবে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তা বুঝ্‌বার দরকার নেই ত বাবা! সে বুঝবো

গেলে সেবাধর্ম্ম চলে না। ওর যে সেবা পাবার একান্তই দরকার! এখানে নিজের অসুবিধার চেয়ে ওর অসুবিধাটাই বেশী বড় করে' দেখ্‌বার কথা। আর তাও বলি, ওকে বিমুখ কর্‌লে শুধু জাতি নিয়ে কতটা পুণ্য সঞ্চয় হবে ?"

মহেশ্বরীর সঙ্গে পারা গেল না। তর্ক ফেলিয়া সুখেন্দু আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার মাতার নিরলস সেবাবৃত্তি আজ নূতন নহে। সুতরাং তিনি ইহাতে আশ্চর্য্য হইলেন না, কিন্তু এই অস্পৃশ্য শিশুটিকে লইয়া তাঁহার শুদ্ধাচারিণী বিধবা জননী যে কিরূপে ঘরকন্না করিবেন, তিনি তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

ছেলেটির দেহের সন্ধিস্থলগুলিতে ময়লা জমিয়া চাপ বাঁধিয়া গিয়াছিল। সুখেন্দু চলিয়া গেলে মহেশ্বরী উঠানে একখানা চৌকী পাতিলেন, ঘড়া ভরিয়া জল আনিলেন, নূতন গামছা বাহির করিলেন। তার পর ছেলেটিকে লইয়া সাবান দিয়া রগ্‌ড়াইয়া-রগ্‌ড়াইয়া মাজিয়া-ঘষিয়া, তাহাকে পরিষ্কার করিয়া স্নান করাইয়া দিলেন। চিরুণী দিয়া মাথার তিনপুরু ময়লা তুলিয়া কেশ রচনা করিয়া কপালে একটি খয়ের-টিপ পরাইলেন এবং কাজললতা লইয়া চোখে কাজল দিয়া দিলেন। ছেলের চেহারা— একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল। মহেশ্বরী পুত্রবধূকে ডাকিয়া গর্ব্বভরে কহিলেন,

"শৈল! বের হ'য়ে একবার ত্থাখ!"

মহেশ্বরীর কন্যাসন্তান না থাকায় পুত্রবধূর নাম ধরিয়া ডাকিয়া সে-সাধ পূর্ণ করিতেন। শৈলবালা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং হাসিতে হাসিতে কহিল, "মা'র অসাধ্য কাজ নেই!"

ছেলেটি গৌরবর্ণ ও দিব্য মোটা-সোটা। মহেশ্বরীর পারিপাট্যে তাহাকে আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। মহেশ্বরী পুত্রবধূকে সম্বোধন করিয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, "ছেলেটি কিন্তু তোকে দিলাম।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহেশ্বরীর ক্রোড়ে কানাইলাল দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পাড়া-প্রতিবাসীরা মহেশ্বরীর গুণে একান্ত মুগ্ধ ছিলেন। তাহা হইলেও মহেশ্বরী যখন প্রথম এই বাগ্দীর ছেলেকে গৃহে স্থান দিলেন, তখন একটা অতৃপ্তি ও উত্তেজনা অতি নম্রভাবে প্রত্যেকের মনকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু যখন সকলেই দেখিতে পাইলেন, এই নিষ্কামা রমণী—আপনার নিষ্ঠাটুকু পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া নিঃসহায় ছেলেটিকে কেমন মানুষ করিয়া তুলিতেছেন, তখন অধিকাংশই আপন আপন মনের গ্লানি ভুলিয়া—শতমুখে আবার তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অবশ্য অধিকাংশ কেন, সকলেই করিতে পারিতেন, কিন্তু পৃথিবীতে সকলের প্রশংসা পাইবার মত পুণ্য কাজ কিছুই নাই।

বালকের অজ্ঞতার ফলে প্রথম প্রথম মহেশ্বরীর কাজ চতুর্গুণ বাড়িয়া যাইত। মহেশ্বরী হয়ত পূজায় বসিয়াছেন,—সে মাকে চমক্ দিবার জন্য চুপি চুপি ঘরে ঢুকিয়া পিছন হইতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে; তখন পূজার উপকরণ ফেলিয়া দিতে হইত, স্নান করিতে হইত, এবং নূতন করিয়া সকল সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইয়া আবার তাঁহাকে পূজায় বসিতে হইত। নানা কাজে প্রায়ই এইরূপ ঘটিত। শৈলবালা সময়-সময় বিরক্ত হইতেন—সুখেন্দু মাঝে মাঝে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেন—কিন্তু মহেশ্বরীর একটুও ক্লান্তি বা বিরক্তি ছিল না। তিনি হাসিমুখেই বলিতেন, "ওকে কেন বকাবকি করছিস্? বালকের স্বভাব বালকের দ্বারাই প্রকাশ পায়। ও-কি এই বয়সে তোদের মত বুঝে-সুঝে' চল্‌বে? তবে সংসারে ছেলে-মানুষের ঠাঁই থাকৃত না।"

রাগটা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কানাইলাল যখন একটু বুঝিতে সুঝিতে শিখিল, নির্মম মন তাহার মনে সর্ব্বদা এই প্রশ্ন উঠিত,—কেন সে রান্নাঘরে—পূজার অতর ঢুকিতে পায় না? সে ছুঁইলে জলটুকু কেন ফেলিয়া দিতে হয়? কেন তাহার খাওয়া সন্দেশ বলাইকে দিতে পারা যায় না? বলাই ছুঁইলে কোনো জিনিস ফেলা যায় না, তাহার এঁটো সন্দেশ কানাই অনায়াসে খায়, তবে তার বেলা সবই উল্টা কেন? শৈলবালা এবং সুখেন্দুই তাহাকে বেশী সঙ্কোচ করিয়া চলিতেন। কিন্তু যাঁহাকে সে ভালোবাসে তাহার সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িত সেই মহেশ্বরীর উপরে। সে ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার ফুলগুলি ছুঁইত, কাপড়খানি টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া দিত। মহেশ্বরী বলিতেন, "বাবা! এমন করিতে নাই।" সে সকল কথা তাহার কর্ণে পৌঁছাইত না। তাহার দুষ্টামি দিন দিন বাড়িয়াই চলিত। সকলের খুঁটিনাটি ছুঁই-ছুঁই-এর ধাক্কায় শিশুর অভিমান যত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত, মার উপর আক্রোশে তাহা ততই প্রকাশ পাইত।

বলাই-এর সঙ্গে তাহার প্রায়ই ঝগড়া বাধিত। সে কোন কোন দিন আঁচড়াইয়া তাহার রক্তপাতও করিয়া দিত। কানাই ছিল হৃষ্টপুষ্ট, দুষ্ট ঘোড়ার মত, বলাই তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিত না। শৈলবালা ছেলের লাঞ্ছনায় মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে এই পরের ছেলেটার উপরেই রাগ করিতেন। কানাইকে বলিলে শাশুড়ীকেই বলা হয়, এই ভয়ে বধূর রাগ মনেই জমা থাকিত। কিন্তু সুখেন্দু মাঝে মাঝে মিষ্টমুখে জননীকে দশ কথা শুনাইয়া দিতেন। তাঁহার ত কাহাকেও সমীহ করিয়া চলিবার বালাই ছিল না।

দর-দালানে আলনার উপর সুখেন্দুর জামা কাপড় থাকিত। তাঁহার জামার পকেটের ভিতরটা কানাইলালের কাছে একটা রহস্যাগার ছিল।

তার লুব্ধদৃষ্টি সর্ব্বদাই সুযোগ খুঁজিত কি করিয়া উহার ভিতরটা এব লুট করিয়া আসা যায়। একদিন সুবিধা পাইয়া সে জামার পকেট হ সুখেন্দুব সোনাব ঘড়িটি উদ্ধাব কবিয়া লইয়া বাহিরে রকের উপর আসি বসিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এপিঠ ওপিঠ করিয়া দেখিল, কান পাতিয়া টিক্‌টিক্ শব্দ শুনিল। কিন্তু ঐ শব্দ কেন হইতেছে, কেমন কবিয়া হইতেছে, কাচেব আববণের আড়ালে বসিয়া কে কথা কহিতেছে, জানিবাব আগ্রহে ঘড়িটা সে রকের উপরে আছড়াইয়া চূর্ণবিচূর্ণ কবিয়া ভিতবটা ভালো কবিয়া দেখিবার উপায় করিয়া লইল। ঠিক্ সেই সময়ই কি কাজে সুখেন্দু তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বালকের হস্তে তাঁহাব মূল্যবান্ ঘড়িটিকে এইরূপে রূপান্তরিত হইতে দেখিয়া রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহাব যেন কাণ্ডজ্ঞানসুদ্ধ লোপ পাইল। উঠানে দবমাব জন্য বাঁশ চাঁছা হইতেছিল, সেখান হইতে এক গাছা কঞ্চির ছড়ি লইয়া সবেগে তাহাব পৃষ্ঠে কয়েক ঘা বসাইয়া দিয়া কহিলেন,

"পাজি, নচ্ছাব, ঘড়িটা শেষ করেছিস্?"

বালক এতক্ষণ মুগ্ধনেত্রে ঘড়ির চাকাব গতি নিবীক্ষণ কবিতেছিল; আচম্‌কা বিষম আঘাত পাইয়া কানাইলাল যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মহেশ্বরী পূজায় বসিয়াছিলেন। শিশুর আর্ত্তনাদ দূব হইতে তীবের মত তাঁহাব বুকে গিয়া লাগিল। তিনি পূজা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। শৈলবালা রান্নাঘরের উনানের উপর কড়া ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। বলাই ও শান্তি খেলা ফেলিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। কানাই এমন করিয়া কাঁদিয়া উঠিল কেন তাহা জানিতে তাহার শিশু সাথীদের মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

মহেশ্বরী দেখিলেন, বালকের পৃষ্ঠ দিয়া রক্তের ধারা বহিয়া চলিতে। বেদনায় তাঁহাব চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিতেছিল, পুত্রের উপরে

রাগটা কোনোপ্রকারে তাহা ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। নির্ম্মম পুত্রের নির্ম্মমতা দ্বিগুণ করিয়া দেখাইয়া তাহার অভিমানী মা শিশুর উপর নূতন অত্যাচার সুরু করিলেন। তিনি সজোরে কানাইলালের কান টানিয়া ধরিয়া উঠানের একদিক হইতে অন্যদিকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "যা, এখনি বের হ এবাড়ী থেকে, এঁটো পাত কখন স্বর্গে যায়? বের হ বল্‌ছি—নচেৎ ঐ কঞ্চি দিয়ে আমি আবার দু'ঘা বসিয়ে দিচ্ছি। সেয়ানা হয়েছিস্‌—যা নিজের বাড়ী চলে যা।"

কানাইলাল কাঁদিতে-কাঁদিতে যখন স্থির হইল, তখন মায়ের আঁচল চাপিয়া ধরিয়াই কহিল, "মা, বড্ড জ্বলছে—আর কর্‌ব না; বাড়ী কোথায় মা?"

মহেশ্বরী তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া আঁচল টানিয়া লইয়া তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "বাড়ী তোর সাত চুলোয়। যা, ঐ ঘরে গিয়ে বস্‌বি। ঘর থেকে যদি বের হবি—মেরে খুন কর্‌ব।"

এই বলিয়া কানাইলাল যে ঘরে থাকিত তিনি আঙুল নাড়িয়া তাহাকে সেই ঘর দেখাইয়া দিলেন।

অশ্রু মুছিতে মুছিতে ম্লানমুখে বালক তথায় যাইতে উদ্যত হইলে তিনি আবার ছুটিয়া আসিয়া ধমক দিয়া বলিলেন, "নে—আর যেতে হবে না, দাঁড়া।"

বিস্মিত বালক স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মহেশ্বরী তখন মহাব্যস্ত হইয়া সাবান ও জল লইয়া গিয়া বালকের ক্ষত-স্থান ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন। শৈলবালা ইতিমধ্যে কতকগুলি গাঁদাফুলের পাতা হাতে রগ্‌ড়াইয়া সরস করিল। মহেশ্বরী তাহা ক্ষতস্থানে লাগাইয়া একটা পটি বাঁধিয়া দিলেন; এবং তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া, তিনি তাহার পার্শ্বে ঝুঁকিয়া বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন, ও ক্ষণে ক্ষণে মাথায়

হাতে পায়ে হাত বুলাইয়া যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গের বেদনা মুছিয়া লইতে লাগিলেন।

সুখেন্দু আহাবাদি করিয়া চলিয়া গেলে, শৈলবালা অন্নব্যঞ্জন লইয়া কতক্ষণ রান্নাঘরে বসিয়া রহিল। কিন্তু যখন কানাই বা তাহার শুশ্রূ কাহারও ঘরেব বাহিবে আসিবার সম্ভাবনা দেখিল না, তখন সে ভীতভাবে আস্তে-আস্তে মহেশ্ববীর কক্ষের নিকটে আসিল। এবং চোরেব মত দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। এইরূপে কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সে বলিয়া উঠিল, "মা! কানাই খাবে না? ভাত বেড়েছি।"

মহেশ্ববী বাতাস কবিতেছিলেন। বলিলেন, "যে-আঘাতটা লেগেছে,—এবেলা আব ভাত দিয়ে কাজ নেই।"

শৈল বলিল, "তবে তুমি এস, বেলা ত কম হয়নি, কখন্ স্নান কর্‌বে —আর কখন্ বা খাবে?"

মহেশ্ববী কহিলেন, "তুমি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওগে, আমাব দেরী হবে।"

শৈলবালা আরও কিছুকাল বসিয়া থাকিয়া চলিয়া গেল; এবং স্বামীকে ডাকিয়া দিল।

বালকের পৃষ্ঠে ক্ষত করিয়া দিয়া সুখেন্দু বিশেষ অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মায়ের কাছে তখনকার মত মুখ দেখাইতে তাঁহার সাহস হইতেছিল না, কিন্তু যখন শুনিলেন, তাঁহার জননী তখনও পর্য্যন্ত আহার কবেন নাই, তখন কলঙ্কিত হস্তখানি লইয়া তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই অতি সত্বব আবার মায়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল।

সুখেন্দু দেখিলেন, মহেশ্বরী তখন পর্য্যন্ত সেই অস্পৃশ্য বালকটিকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার সেবা করিতেছেন। জননীকে ডাকিতে তাঁহার

হইল না। তিনি গৃহমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মহেশ্বরী সব দেখিতেছিলেন। কিন্তু যেন কিছুই দেখিতেছেন না, এইভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। সুখেন্দু কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া সেইরূপে বেড়াইতে-বেড়াইতে আপন মনেই বালকের ভাষায় বলিয়া উঠিলেন, "মা যে ছেলেকে এমন করে' ভুলতে পারে, তা জানলে ওটাকে এ বাড়ীতে ঠাঁই দিই ?"

পুত্রের এ অভিমান যে অনুতাপেরই রূপান্তর তাহা মহেশ্বরীর বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি সেইরূপ চক্ষু বুজিয়া থাকিয়াই কহিলেন, "কিন্তু স্নেহটা যে পুত্রের চেয়ে পৌত্রে গিয়ে বেশী ভর করে' দাঁড়ায়, তা জানিস ?"

সুখেন্দু যে এত শীঘ্র জননীকে এমন সরলভাবে কথা বলাইতে পারিবেন, আশা করিতে পারেন নাই। তিনি কিছু পুলকিত হইয়া কহিলেন, "কিন্তু তুমি আদর দিয়ে দিয়েই ওকে এতটা বাড়িয়ে তুলেছ, নইলে ওর সাহস হয়, পকেট থেকে ঘড়িটা বের করতে আর ভাঙতে ?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "ছেলেমানুষে অমন কত কি করে। (তোমার একটা ঘড়ি গেছে, আর একটা করতে পারবে। কিন্তু ওর পিঠে যে দাগ দাঁড়িয়ে দিয়েছ, তা জীবন থাকতে মুছে' ফেলতে পারবে না। ইতরের অস্ত্র আর ভদ্রের অস্ত্র পৃথক হ'তে পারে, কিন্তু অস্ত্র ব্যবহারের অপরাধ ভিন্ন নয়। তোমার হাতের কঞ্চি আর চাষার হাতের কোদাল, অস্ত্র-দুটি ভিন্ন—মানুষও ভিন্ন—কিন্তু ক্রোধটা একই।"

মহেশ্বরী পুত্রকে এত বড় একটা রূঢ় বাক্য বলিয়া পরক্ষণেই ... পড়িলেন। কিন্তু সুখেন্দু ইহাতে তৃপ্তি লাভ করিলেন। উঠানের তাহার চিত্ত-বিক্ষোভ অন্তরে না চাপিয়া সরল-মনে ব্যক্ত ...লেন, তখনও

ইহাতে যতই রূঢ়তা প্রকাশিত হউক না কেন, তিনি যে ক্ষমা ক'তে পারিয়াছেন তাহা বেশ স্পষ্টই ব্যক্ত হইল।

সুখেন্দু কহিলেন, "আমার এই জন্যে রাগ হয়,—তুমি ওকে যে ভাবে গড়ে তুল্‌ছ, তাতে ও যখন নিজেকে বেশ জান্‌তে পার্‌বে তখন মস্ত একটা ধাঁধায় পড়ে' যাবে।"

সুখেন্দুর এ বাক্যটি এ-সময় তেমন সুপ্রযুক্ত হইল না।

মহেশ্বরী কহিলেন, "তা'তে আমাব উপরই রাগ হওয়াবই কথা, ওর উপর হ'য়ে লাভ নেই।"

সুখেন্দু কহিলেন, "যাক্‌গে, যা হ'য়ে বয়ে' গেছে,—গেছে। কিন্তু কানাই যে এখনও খেলে না, তুমিও খেলে না।"

"ওকে এ-বেলা আর কিছু খেতে দেবো না। কি জানি যদি জ্বর-জাড়ি হ'য়ে পড়ে। যদি কুইনাইন থাকে, দুটো বড়ি দিয়ে যা।"

সুখেন্দু দুইটি কুইনাইনেব পিল আনিয়া দিলেন। কানাইলালকে এক বড়ি খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। তার পর তাহার জন্য রুটি প্রস্তত করিতে বলিয়া মহেশ্বরী স্নান করিতে গেলেন।

বাধ্য হ
সুখেন্দু দো
ক্রোড়ে লইয়া, ত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিশুদিগের একটা প্রধান গুণ এই,—তাহারা পরস্পরের মধ্যে যত শীঘ্র বিচ্ছেদ ঘটায়, আবার তত শীঘ্র ঘনিষ্ঠতাও করে। সে ঘনিষ্ঠতায় একে অন্যের অপরাধের প্রতি অন্ধ হইয়া তাহার দুঃখের অংশটাই এমন সহজ ও সরলভাবে অতি শীঘ্র গ্রহণ করিয়া বসে যে, তাহাদের সরলতায় কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার থাকে না। বলাই, শান্তি এবং কানাইলাল তিন জন একত্রে অঙ্গনের একপার্শ্বে খেলাঘরে বসিয়া পুতুল লইয়া [illegible]তেছিল। বলাই ও শান্তির পুত্র-কন্যার বিবাহে কানাইলালের বি[illegible]ব্যবস্থার সহিত যখন তাহাদের মতের ঐক্য হইল না, তখন সে [illegible]াঁটি করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া আসিল। এবং এই সঙ্গী-[illegible] বেদনা ঝট্‌পট্‌ মনের মধ্যে ঢুকাইয়া ফেলিতে সে যখন হাতের [illegible]কোন কাজই পাইল না, তখন দরদালানে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ [illegible]। সুখেন্দুর জামার পকেট হইতে ঘড়িটা টানিয়া বাহির ক[illegible] একটা বড় নিগ্রহ ঘাড়ে লইবার জন্য তাহার পঞ্চত্বও ঘটা[illegible]

ক[illegible]লের পৃষ্ঠে সুখেন্দু—রক্তের নদী বহাইয়া দিলে তাহার [illegible] চীৎকারের শব্দে বলাই ও শান্তি খেলা ফেলিয়া তথায় ছুটিয়া [illegible]ল। দুই ভাই-বোনে ভয়ে জড়সড় হইয়া বিস্মিত-নেত্রে একপার্শ্বে [illegible]ইয়া দেখিতে লাগিল। তার পর মহেশ্বরী আসিয়া যখন কানাই-[illegible]ক বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাহার কান ধরিয়া উঠানের [illegible]পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখনও

তাহারা পুতুলের মত নিশ্চলভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকি ... চক্ষু চারিটা কানাইলালের পিঠ-জোড়া ক্ষতটার উপর ... সমবেদনা জানাইতেছিল। কানাইলালের আর্ত্তনাদে তাহাদের শিশু-হৃদয়ের স্নেহ-তন্ত্রীগুলি একই সুরে কাঁপিয়া উঠিতে চাহিতেছিল। মহেশ্বরী কানাইকে সঙ্গে লইয়া বিছানায় যাইয়া শয়ন করিলে তাহার শিশু সাথী দুটিও ধীরে-ধীরে ম্লানমুখে সেই গৃহের দ্বারে আসিয়া বসিল। এবং পলকহীন হইয়া কানাইলালের দিকে তাকাইয়া রহিল। উদ্বেগ ও কৌতূহল, বিস্ময় ও করুণা, তাহাদের ছোট হৃদয়গুলির ভিতর এমন ভিড় করিয়া তুলিয়াছিল যে, কথায় তাহার কোনোটাকেই তাহারা প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না।

ভাত খাইবার জন্য রান্নাঘর হইতে শৈলবালা কয়েকবার বলাই ও শান্তিকে ডাকাডাকি করিলেন, তাহারা উঠিল না। কানাইকে ফেলিয়া তাহারা যায় কি করিয়া? ক্ষুধা-তৃষ্ণা যাহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই জাগ্রত, তাহারা অনায়াসে আহারের কথা ভুলিল, চুপ করিয়া সেইখানে বসিয়া রহিল। শেষে শৈলবালা এক সময় তাহাদের হাত ধরিয়া উঠাইয়া লইয়া গেলেন। না খাওয়াইয়া ত আর ছেলেদের ফেলিয়া রাখা যায় না? মা টানিয়া আনিলে না খাইয়া উপায় নাই, তাই খাইতে হইল। কিন্তু কোন-মতে নাকে-মুখে চারিটি গুঁজিয়া আবার তাহারা সেইখানে আসিয়া বসিল। কিসের পর কি যে খাইল আজ তাহা তাহাদের চোখেই পড়িল না। তারপর মহেশ্বরী যখন স্নান করিতে গেলেন, তখন সেই অবসরে তাহারা গৃহে ঢুকিল। কানাইলালের সঙ্গে দু'টা কথা বলিবার জন্য বন্ধুদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এতক্ষণে বাক্-শক্তিও তাহারা ফিরিয়া পাইয়াছিল। বলাই ডাকিল, "কানাইদা! ঘুমিয়েছ?" তাহার কথার স্বরে মমতা ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কানাইলালের পৃষ্ঠে ক্ষত। সে উপুড় হইয়া শুইয়াছিল। বলাই-এর ডাকে সে খুঁতিটি বালিশের উপর ভর করিয়া মাথা উঁচু করিল। ডাগর চোখে বলাইএর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "বিছানার উপর বস্‌বি?—আয়।"

মুহূর্ত্তে বলাই ও শান্তি বিছানার উপর উঠিয়া কানাইলালের পৃষ্ঠের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। কানাই ডাকিয়াছে—আর কি দূরে থাকা যায়? কাপড়ের পটিটা রক্তে ভিজিয়া গিয়াছিল, বলাই দরদের সহিত বলিল, "দেখেছ দিদি, কি কাটাই কেটেছে!"

দিদির মত সস্নেহ-স্বরে শান্তি কহিল, "বড্ড কি জ্বল্‌ছে ভাই,—বাতাস কর্‌ব?"

বালিশে মুখ গুঁজিয়া কানাই বলিল, "খুবই জ্বল্‌ছিল, বড়-মা বাতাস কর্‌তে-কর্‌তে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে।" শান্তির আদরে তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। মুখে ঢাকা দিয়া সে সঙ্গীদের দৃষ্টি এড়াইতেছিল।

বলাই কহিল, "আচ্ছা? তুমি ঘড়িটা ভাঙ্‌তে গেলে কেন?"

কানাইলালের সন্তপ্তপীড়িত মনে আবার ব্যথা লাগিবার ভয়ে শান্তি তাড়াতাড়ি বলাইকে ধমক দিয়া কহিল, "যাঃ! নিজের জ্বালায় বাঁচ্‌ছে না, এখন তোকে তাই শোনাতে বস্‌বে?"

তবু বলাই বলিল, "তোমার মোটে বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই। আমাদের [illegible]ার ঘরে নিয়ে গিয়ে যদি ভাঙ্‌তে, তা হ'লে কি আর বাবা দেখ্‌তে পেত?" এমন উপদেশটা দিদির ধমকেও সে সাম্‌লাইয়া রাখিতে পারিল না। এবার শান্তির গাম্ভীর্য্যও টুটিয়া গেল। কথায় মাতিয়া সে নিজেই [illegible], "ঘড়ির মধ্যে শব্দটা কে করে, তাই দেখ্‌বার জন্যে বোধ হয় ছিলে—না কানাই?"

[illegible]ানাই বিমর্ষমুখে কহিল, "হুঁ।"

কানাই তাহার নিজের অপরাধটা তখন একটু-একটু বুঝিতেছিল; বিজ্ঞভাবে শাস্তি বুঝাইয়া কহিল, "ও আর কিছু না, ঘড়ির মধ্যে যে চাকা ঘোরে, তারই দাঁতে-দাঁতে আর-একটা ডাণ্টা লেগে অমন শব্দ হয়।" এ-ব্যাপারের বিচার-বিভ্রাটটা বলাইকে তখনও ভাবাইতেছিল। সে তাই কহিল, "বড়-মারও কিন্তু বড় দোষ! বাবা এই মার্‌লে, তার পর বড়-মা আবার কান ধরে' সমস্ত উঠানটায় টানাটানি কর্‌তে লাগল। দু-জনে মিলে' কেন মার্‌বে? একটা ত মোটে দোষ করেছে।"

কানাইলালের চোখের কোণে জল আসিয়া জমিতে লাগিল। এততেও তাহার মায়ের নিন্দা সহিল না। সে কহিল, "বড়-মা বুঝি সেইজন্যে মেরেছে?"

রাগিয়া বলাই উঁচু গলায় কহিল, "না—সেইজন্যে না ত কি জন্যে?"

কানাই কহিল, "ও বড়-বাবুর উপর রাগ করে।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য সে আবার কহিল, "নইলে পটি বেঁধে দেয়—বসে'-বসে' বাতাস করে?"

মহেশ্বরী বাহিরে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষু-দুটিও সজল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠি[illegible]ন, "হারামজাদা! সেজন্যে মেরেছি না, কি জন্যে মেরেছি? তুই তা[illegible]র ছেলের ঘড়িটা ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো কর্‌লি—আর রাগ কর্‌তে গে[illegible] বড় বাবুর ওপরে?"

শিশুদের সমস্ত বিচার-বিতর্ক থামিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে গৃহটি [illegible] হইয়া গেল।

মহেশ্বরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বস্ত্র ত্যাগ করিতে-ক[illegible] আপন-মনে বলিতে লাগিলেন, "নইলে পটি বেঁধে দেয়—বাতাস ক[illegible] নইলে যে মরে' যেতিস্, গায়ে কি আর রক্ত আছে? আমার [illegible]! ভোগ ছিল—শেষকালে এমন বন্ধনে লোকে পড়ে?"

মহেশ্বরী বকিতে-বকিতে রান্না-ঘরে চলিয়া গেলেন। গৃহের মধ্যে তখন আবার তাহাদের কথা-বার্ত্তা জমিয়া উঠিল।

বলাই বলিল, "দিদি? দেখ্‌লে বড়-মায়ের কাণ্ডটা? এখনও পর্য্যন্ত গাল-মন্দ কর্‌ছে, বড়-মা ভাই বড় নিষ্ঠুর।"

কানাই পাশ ফিরিয়া শুইল। তাহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া বিছানা ভিজিতে লাগিল।

কানাইলালের মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "ক্ষিধে পেয়েছে? কিছু খেতে দেন্‌নি বোধ হয়?" কথার গতিটা অন্য পথে ফিরাইয়া দিবার তাহার ইচ্ছা ছিল।

কানাইলালের ক্ষুধার উদ্রেক খুবই হইয়াছিল। সে তাহাদের দিকে ফিরিয়া শুইল। কহিল, "বড়-বাবুর সঙ্গে বল্‌ছিল, আজ আর কিছুই খেতে দেবে না, ক্ষিধে যা লেগেছে—।"

শান্তি বলাইকে কহিল, "বলা! তুই এক কাজ কর্‌। আমাদের ঘরে সয়্‌দেওয়ালের উপর হাঁড়িতে সন্দেশ আছে, খাটের উপর দাঁড়িয়ে গোটা-চারেক পেড়ে নিয়ে আয়; আমি চুপি-চুপি গিয়ে রান্না-ঘর থেকে চিঁড়ে নিয়ে আসি।"

দুই ভাই-বোনে সাবধানে খাদ্য-দুইটি আনিয়া কানাইলালকে খাওয়াইল। মহেশ্বরী কানাইকে ছোট একটি টিনের বাক্স দিয়াছিলেন। সে তাহার মধ্যে চোপড়-চোপড় হইতে বই, শ্লেট, সন্দেশ, খেজুর, খেলনা সবই রাখিত। কোমর হইতে সে চাবিকাঠিটা খুলিয়া বলাইকে দিল। বলিল, না বাক্সটা খোল।"

বলাই বাক্স খুলিলে কানাই কহিল, "লাটিমটা বের কর্‌।"

বলাই বাহির করিল।

"হনুমানটা আর-একটা বড় দাঁড়ানো পুতুল আছে। সে-দু'টোও বের কর্‌।"

বলাই বাহির করিল। কানাই কহিল, "লাটিমটা তুই নে, আ: পুতুল দু'টো দিদিকে দে।"

বলাই বলিল, "আমার লাটিম আছে যে!"

কানাই কহিল, "নে না—যা' বলি তাই কর্। লাটিম আছে—তা'র কাঁটাটা কি আস্ত রেখেছিস্? সে যে ভেঙে গেছে।"

বলাই পুতুল-দু'টি তাহাব দিদিকে দিতে গেল।

সে হাজার হইলেও দিদি। সহজে ছোট হয় কি করিয়া? কহিল, "কেন কানাই, তুমি এ-সব আমাদেব দিচ্ছ? আমাব ত পুতুল রয়েছে। তুমি সেরে উঠ্‌লে ত খেল্‌তে হবে?"

কানাই কহিল, "তুমিও দেখি কম বোকা নও। দু'চাবটা পুতুলে কি বে-থার কাজ হয়? নিয়ে যাও।"

শান্তি বলিল, "তুমি কি দিয়ে খেল্‌বে?"

কানাই বলিল, "সে তখন হবে। আমার ত খেলার জন্য বড় ভাবনা পড়ে' গেছে? নাও—বড়-মা এল বলে'।"

মহেশ্বরী কানাইলালেব জন্য রুটি-তরকাবী লইয়া ঘরে আসিতে শান্তি ও কানাই তাহাদের লব্ধ সামগ্রী কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কানাইলালের জ্ঞান-বুদ্ধি যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই সে বলাই ও শান্তির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই পরিবার হইতে সকল অধিকারটুকু সমানভাবে ভোগ করিতে চাহিত। সে নিজেকে বাহিরের মানুষ বলিয়া বুঝিত না, তাই ভিন্ন ব্যবহারে ব্যথা পাইত। কিন্তু লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন ভোগ করিবার জন্য তাহার জন্মের গোড়ায় যে একটা প্রতিকূল শক্তি চাপিয়া বসিয়াছিল, সে-ই এই বালকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সকলের ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দিত। কেবলমাত্র মহেশ্বরীর প্রগাঢ় অনুরাগই দুঃখের মধ্যে সুখ সুপ্তি আনিয়া তাহাকে শান্ত রাখিতেছিল। তথাপি, বালকের অজ্ঞতা ও দুর্ব্যবহারের ফলে এমন এক-একটা ক্ষণ আসিত, যে সময়ে বালকের সপক্ষে বলিবার সুযুক্তির রিক্ততায় মহেশ্বরীকেও অত্যন্ত চঞ্চল ও বিব্রত করিয়া তুলিত।

একদিন শিলাবৃষ্টি হইতেছিল। কানাই, বলাই ও শান্তি দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা এক-একবার দৌড়াইয়া গিয়া রকের উপর শিল সংগ্রহ করিতেছিল এবং আবার দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। একবার একটা বৃহৎ শিল পড়িল। তিন জনেরই সেটা পাইবার ইচ্ছা; তবু শান্তি ভিতরেই রহিল, কিন্তু কানাই ও বলাই দুইজনেই তাহার দিকে ছুটিয়া, বলাই যখন শিলটি সংগ্রহ করিল, তখন কানাই এক ধাক্কা দিয়া তাহাকে উঠানে ফেলিয়া দিল। বলাই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। [র] কান্না মায়ের কানে পৌঁছিতে দেরি হইল না। শৈলবালা [তা]ড়াতাড়ি গৃহের বাহির হইয়া জলে ভিজিতে-ভিজিতেই তাহাকে তুলিয়া

আনিলেন। আঁচল দিয়া সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় লেগেছে ?"

বলাই কাঁদিতে-কাঁদিতে কহিল, "ওমা, আমি গেছি—আমার হাতখানা ভেঙে গেছে।"

শৈলবালা দেখিলেন, সত্যই তাহাব দক্ষিণ হস্তের কব্জার সন্ধিস্থানটা অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিয়াছে। তিনি আহত স্থানে তৈল মালিশ করিয়া দিতে লাগিলেন এবং বাহিব বাড়ীতে সুখেন্দুব নিকট খবব পাঠাইলেন। বাগে দুঃখে তাঁহাব আপাদমস্তক জ্বলিতেছিল।

কানাইলাল অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। এবং কেহ বলিবার পূর্ব্বে চোবেব মত একপার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে যখন দেখিল, সুখেন্দুব নিকট খবর গেল, তখন তাহার অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। না জানি বলাইএর কতগুণ শাস্তিই আজ তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সে একটুও নড়িল না। সেইখানে ম্লানমুখে একভাবেই দাঁড়াইয়া বহিল।

খবব পাইয়া ব্যস্ত হইয়া সুখেন্দু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শৈলবালা কহিল, "দেখ ছেলেটা আর নেই, হাতখানা একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো কবে' দিয়েছে।"

সুখেন্দু বিরক্তিপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দিলে ?"

শৈলবালা কহিল, "আব কে দেবে ? যে দেবার সেই দিয়েছে।" তাব পর সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, "নিতাইএর ছেলে ত! প্রজা-মনিব সম্বন্ধ, কাঁহাতক এসকল বরদাস্ত করা যায় ?"

সুখেন্দু রোষপূর্ণ-দৃষ্টিতে একবার কানাইলালের দিকে চাহিলেন। কিন্তু কিছুই বলিলেন না। শান্তির দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "ছোটে... একবার ডেকে আন্‌বি—যা ত ?"

মহেশ্বরী নিজে ঘরে বসিয়া ময়নার সহিত কথা বলিতেছিলেন। বৃষ্টির শব্দে তিনি এসকল কিছুই শুনিতে পান নাই। শান্তি ভীতমুখে গিয়া কহিল, "বড়-মা! বাবা ডাকছেন।"

মহেশ্বরী বলিলেন, "কেন রে?" কিসের একটা আশঙ্কায় তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শান্তি কেবল বলিল, "তুমি, শীগ্‌গির করে' এস—দেখ্‌বে।"

শান্তি সেই পায়ে ফিরিয়া গেল।

মহেশ্বরী চঞ্চলপদে আসিয়া দেখিলেন, বলাই তাহার মাতার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। শৈলবালা চুণ ও হলুদ গরম করিয়া তাহার হাতে লাগাইয়া দিতেছেন। কানাই জড়সড় হইয়া নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় এক-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। মহেশ্বরীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তাঁহার অশান্ত ছেলেটি এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে।

সুখেন্দু বিরক্তিপূর্ণ-স্বরে কহিলেন, "মা! কানাইটে বড় বেড়ে উঠেছে। ওকে আর একমুহূর্ত্তও এখানে রাখা যায় না। আমি এখনিই নবীনকে আন্‌তে লোক পাঠাচ্ছি।"

মহেশ্বরী যেন অনায়াসেই কহিলেন, "তা পাঠাও—নিয়ে যাক্ এসে। এখন ত সেয়ানা হয়েছে—আপদ্-বালাই নেই।" তার পর কানাইএর এক-গোছ চুল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিব্যি ভালোমানুষের মতন দাঁড়িয়ে আছিস্ যে! বলি এ হয়েছে কি?" এই বলিয়া চুল ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিলেন।

কানাই আর্ত্তস্বরে কহিল, "আমার শিলটে নিলে কেন?"

বলাই তাহার বেদনা ভুলিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, "ওর বুঝি? আমি ধরলাম না?"

মহেশ্বরী চুলে আর-একটা ঝাঁকুনি দিয়া কহিলেন, "হতভাগা কোথা-

কার,—আমার শিলটে নিলে কেন ?—আকাশ থেকে তোর নাম
পাঠিয়েছিল—নয় ?"

মহেশ্বরী তখন বলাইকে তাহার মাতার ক্রোড় হইতে নিজের
লইয়া বসিলেন। এবং বেদনার স্থানে আগুনের সেক দিতে লাগিলেন

সুখেন্দু কহিলেন, "শেষটা একদিন একটা প্রাণ নষ্ট করে' ব
কি বলো মা ?"

সে-কথার উত্তর না দিয়া মহেশ্বরী বলিলেন, "বল্‌লাম যে নবীন
ডেকে পাঠা ! নিয়ে যাক্ না যেখানকার আপদ্ সেইখানে !"

মার মত আছে বুঝিয়া সুখেন্দু তখন নবীনকে আনিবার জন্য
পাঠাইলেন।

মহেশ্বরী আপনার ঘরে আসিয়া বাক্স খুলিয়া কানাইএর কাপড়, জা
জুতা যেখানে যাহা ছিল খুঁজিয়া-খুঁজিয়া বাহির করিতে লাগি
বলিলেন, "নে—তোর জিনিস-পত্তর কোথায় কি আছে
গুনে নে।"

জিনিস-পত্রগুলি গোছাইয়া লইয়া বোঁচকা বাঁধা যে তাহার
সাধ্যায়ত্ত নহে, সে তাহা বুঝিতেছিল, এবং গালের মধ্যে একটি আঙ্গুল
দিয়া সজল চক্ষে দাঁড়াইয়া ছিল। মহেশ্বরী একে-একে সকল বা
খুলিয়া, কোথায় কি আছে না আছে সকলই খুঁজিতে লাগিলেন।
যখন যে-পরিচ্ছদটি বাহির হইতে লাগিল, অমনি টান মারিয়া
ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। একবার বালকের দিকে মুখ ফি
কহিলেন, "হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইলি যে! দেখে' নে না, কোথা
আছে! আমাকে জ্বালা'তে দু-একটা রেখে যাবি নাকি ?"

কানাই এবার কথা বলিল। আস্তে-আস্তে কহিল, " াগে
বড়-মা ?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "কেন, নবীনের কথা তোকে দু'শো দিন বলিনি? তোর দাদা হয়। ডাক্‌তে পাঠিয়েছে, এলে তা'র সঙ্গে চলে' যা।"

গাল ফুলাইয়া কানাই বলিল, "আমি যাবো না।"

মহেশ্বরী জোর-গলায় কহিলেন, "যাবিনে—থাক্‌বি কোথায়? এ বাড়ীতে তোর জায়গা হবে না।"

স্বচ্ছন্দে সে বলিল, "কেন?"

"কেন তা এখনও বুঝতে পারিস্‌নি? ও আমার কপাল! তুই লোকের হাত-পা খোঁড়া করবি—চোখ কানা করবি—লোকে সইবে কেন?"

কানাই যুক্তিতে হারিবার পাত্র নয়। সে কহিল, "আমি ত তাদের কাছে থাক্‌তে যাচ্ছিনে!"

মহেশ্বরী হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "হারামজাদার জোর দেখ! তুই আমার ছেলেদের খুন করবি, আর আমি—"। মহেশ্বরীর ঠোঁটে আট্‌কাইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, "তোকে নিয়ে পড়ে' থাকব?"

কানাই সেইখানে বসিয়া পড়িল। বলিল, "আর করব না।"

"সে-কথা আমার কাছে বল্‌লে কি হবে, তা'রা শুন্‌বে কেন?"

মহেশ্বরী তখন কানাইলালের জিনিসপত্রগুলি একে-একে পাট করিয়া তাহার টিনের বাক্সে পূরিয়া রাখিলেন। তার পর গৃহের বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার জীবনের সায়াহ্নে এই যে একটা আকর্ষণ—নক্ষত্রের ন্যায় ছিট্‌কাইয়া আসিয়া তাঁহার প্রাণের গোড়ায় বাঁধন ফেলিয়াছে, ইহাকে তিনি আর কিছুতেই ঠেলিয়া ফেলিতে পারিতেছিলেন না; তিনি সেই চাটুয্যেদের বাড়ী আসিয়া ডাকিলেন, "ক্ষান্ত-দি নাকি বাপের বাড়ী [illegible] শুনছিলাম?"

ক্ষান্ত তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন বলিলেন, "হাঁ। ভাই এসে বসে' রয়েছে, কাল যাবো ভাব্‌ছি।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "আমি ও ত যাবো-যাবো অনেক দিন থেকে মনে কর্‌ছি। চল—তোমার সঙ্গেই গিয়ে দিন কতক বেড়িয়ে আসি।"

ক্ষান্ত পুলকিত হইয়া কহিলেন, "বেশ ত! ভালোই হবে। দূরের পথ—দুই বোনে বেশ যাওয়া যাবে।"

এইরূপে ক্ষান্তর সহিত পিতৃভবনে যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া মহেশ্বরী গৃহে ফিরিলেন। নবীনের আসার পূর্ব্বেই যে তাঁহার কোথাও-না-কোথাও বাহির হইয়া পড়া চাই। মহেশ্বরী গৃহে আসিয়া আবার বাক্স-পেঁট্‌রা খুলিলেন ও নিজের জন্য গোছ-গাছ করিতে লাগিলেন। শৈল সে সকল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি হচ্ছে, মা?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "এক জায়গায় মাটি কাম্‌ড়ে পড়ে' থাক্‌তে আর ভালো লাগ্‌ছে না, দিন-কতক বেড়িয়ে আসি।"

"কোথায় যাবে?"

"বাপের বাড়ীতেই যাই। ক্ষান্ত দিদি যাচ্ছেন, সেই নৌকোতেই যাবো।"

শৈলবালা আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। সে স্বামীর নিকট যাইয়া সকল কথা বলিল।

সুখেন্দু মাতার ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মা! তোমার টাকা-পয়সার কি খুবই অভাব হয়েছে যে, ক্ষান্ত মাসীর নৌকোয় যাবে? এমন ত কোন দিন যাও না!"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তা'তে আর হ'ল কি? একজায়গায় মেয়ে, পড়েছিও পাশাপাশি ঘরে, তা'তে দোষ নেই।"

সুখেন্দু কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমি বুঝে"

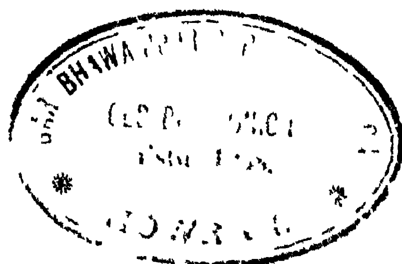
নবীন ত আর শমন হাতে কবে' আস্‌বে না, যে তোমার কানাইকে দিতেই হবে। সে ত তুমি দিলেও পাবো—না দিলেও পারো।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "না—তা'তে আব কাজ নেই! ঘরটা-সুদ্ধ লোক জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে, কাঁহাতক লোকে সহ্য কর্‌বে?"

সুখেন্দু কহিলেন, "বলাইএব যদি একটা ভাই থাকৃত—আর দুষ্ট হ'ত তাব জন্যে ত কোন নবীনকেও খুঁজে' খুঁজে' পাওয়া যেত না। রাগেব মাথায় দু' এক কথা বলি বলে' কি তোমাব অভিমান কবা উচিত?"

মহেশ্বরী কিছু বলিলেন না।

পবদিন যখন সংবাদ আসিল, নবীন তাহার বাড়ীতে বা কর্ম্মস্থলে নাই, মনিবেব কার্য্যে স্থানান্তরে গিয়াছে, তখন মহেশ্ববী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাঁহাব পিত্রালয়ে যাওয়াও স্থগিত হইল। এক-জায়গার মাটিব প্রতি তাঁহাব বিতৃষ্ণা অকস্মাৎ দুব হইয়া গেল।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিত্যসঙ্গীর প্রতি ভালবাসা শিশুদের মনে বয়স্কদের তুলনায় গভীর। তাই কখনও বয়োধর্ম্মের গুণে হঠাৎ একে অন্যকে আঘাত করিয়া বসিলে সেই আঘাতটাই আবার নিষ্ঠুরের মত তাহারই শক্তি পরীক্ষা করিতে উদ্যত হয়। বলাইকে ফেলিয়া দেওয়ার পর হইতে কানাইএর অন্তরে এমন একটা আঘাত বাজিয়া উঠিয়াছিল যে, প্রাণের কোন্ নিবিড় অনু-রাগের স্পর্শে সে তাহার সঙ্গীটিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে ভাবিয়া-ভাবিয়া কোন কূল-কিনারাই পাইতেছিল না। কাল হইতে বলাই তাহাদের ঘরে শয্যায় শুইয়া আছে। কানাইলালের সে-গৃহে যাইতে বরাবরই নিষেধ ছিল ; সেখানে জল থাকিত, সুখেন্দুর খাদ্যাদিও থাকিত। বন্ধুকে চোখের দেখা দেখিবার উপায়ও তাহার নাই।

কানাই এ দুইদিন ছটফট্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কি ছলে সে বলাইকে দেখিতে পাইবে এই ছিল তাহার একমাত্র চিন্তা। শান্তির কাছে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছে যে, ব্যথাটা খুবই বাড়িয়াছে। রান্না-ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সে আজ দুইদিন শৈলবালাকে চুণ-হলুদ গরম করিয়া লইয়া বলাইএর গৃহে ঢুকিতে দেখিতেছে। এই সামান্য ঔষধে বন্ধুর সেবায় তাহার মন উঠিতেছিল না। "চুণ-হলুদে নাকি আবার ব্যথা ভালো হয়?" তাহার মনে একটা বুদ্ধি যোগাইল। তাহাদের বাড়ীর কিছু দূরে পরেশ নন্দী থাকিত, সে অনেক মন্ত্র-তন্ত্র জানিত। সে প্রায়ই দেখিত, ঐরকমের মচ্কা ঘা, ফুলা, ব্যথা ইত্যাদি লই... তাহার দ্বারে ঝাড়া-ফুঁকা করিতে আসিত এবং অনেকে

পাইত। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপি-চুপি পরেশের কাছে গেল। পরেশ তখন ঘুন্‌সী বুনিতেছিল। উঁচু হইয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া সে অনেকক্ষণ গালে-মুখে হাত দিয়া তাহার বুনন-কার্য্য দেখিতে লাগিল। পরেশ এই প্রতিবাসীটিকে চিনিত। এবং সে যে তাহার মনিবমাতা মহেশ্বরীদেবীর অতি প্রিয়পাত্র তাহাও সে জানিত। কানাইলালকে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে নিজেই উদ্যোগী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কানাই-বাবু! চুপ করে' বসে' যে! কি মনে করে'?"

ইতস্ততঃ করিয়া কানাই বলিল, "তুমি ঘুন্‌সী বুনছ যে—"

"তা'তে কি হয়েছে, বলোই না—বুনতে-বুনতে শুনব।"

কি করিয়া কথাটা ফেলিবে কানাই ভাবিতে লাগিল।

পরেশ কহিল, "লজ্জা কি? বলে' ফেল না শুনি। আমি কি পর?"

ঢোঁক গিলিয়া কানাই বলিল, "তুমি অনেক মন্তরতন্তর জানো—।"

"তা ত জানি।"

কানাই ঘুরিয়া পরেশের পেছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জিতভাবে বলিল, "মচ্‌কা ঘার মন্তরটা যদি আমায় শিখিয়ে দাও।"

পরেশ হাসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন—সে-মন্তর নিয়ে কি হবে? কা'কে চিকিৎসা করবে?"

গম্ভীরভাবে কানাই কহিল, "শেখা থাকবে।" খেন্দু

পরেশ বলিল, "দেশসুদ্ধ মন্তর পড়ে' রয়েছে, মচ্‌কা-ঘার মন্তর, তোমায় পেয়ে বস্‌ল কেন?"

কানাই কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, "তুমি দেবে কিনা বলো?"

পরেশ কহিল, "দেবো না কেন? বিনা পয়সায় কি হয়? টাকা

কানাই ভাবিয়া কহিল, "ক' টাকা ?"

পরেশ বলিল, "চার টাকার কম হয় না, তুমি দু'টাকা দিলেই হবে।"

কানাই আর কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল। সে জানিত মহেশ্বরীর বিছানার নীচে খরচপত্রের জন্ম প্রায়ই দু'-দশ টাকা থাকিত। সে চুপি-চুপি গৃহে প্রবেশ করিয়া বিছানা তুলিয়া দেখিল, পাঁচটি টাকা রহিয়াছে। সে তাহা হইতে দুইটি টাকা লইয়া পরেশের নিকট আসিল। কতদিন কত টাকা-পয়সা তাহার চোখের উপর ছড়ানো থাকিত, সে একটি পয়সায়ও কোনদিন হাত দিত না। আজ সে তাহার এক-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আর-একটি পাপ করিয়া বসিল।

পরেশের নিকট টাকা দুইটি রাখিয়া সে কহিল, "এই নাও—কিন্তু এই বেলার মধ্যেই মুখস্থ করিয়ে দিতে হবে।"

টাকা দুইটি এবং বালকের তাড়াহুড়া দেখিয়া পরেশ কিছু আশ্চর্য্য হইল। যা হোক্ সে কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া টাকা দুইটি তুলিয়া লইল এবং কানাইলালকে মন্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিল।

কানাই বেশ মেধাবী ছিল। দু'-দশবার আবৃত্তি করিতে তাহার অনেকটা আয়ত্ত হইয়া উঠিল। সে একবার ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মিথ্যে মিথ্যে শেখাচ্ছ না তো ?"

পরেশ কহিল, "টাকা পেলাম, মিথ্যা কেন শেখাব ?"

তবু কানাই নিশ্চিন্ত হইল না। সকল সন্দেহ আগেই মিটাইয়া রাখিবার জন্ম সে বলিল, "আমায় ছুঁয়ে বল্ছ ? খাট্‌বে ত ? আমি কিন্তু আজই খাটিয়ে দেখবো।"

পরেশ কহিল, "তা দেখ, বালকের সঙ্গে কেউ মিথ্যে ব্যবহার করে ?"

সত্য-সত্যই পরেশ কোন মিথ্যা আচরণ করিল না। সে সবই ঠিক-ঠিক শিখাইয়া দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কানাই তখন হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিল। এ ...াল। মহেশ্বরীর বলাইএর ঘরে প্রবেশ করিতে পারা যায় তাহারই অনু ...ড় শৈলবালাকে লাগিল। থাকিলই বা জল—থাকিলই বা বড়-বাবুর থা... কানাইলালের তাহাকে আজ সে-ঘরে প্রবেশ করিতেই হইবে। না হ... ...ন্ধীর্ণ হইয়া হওয়ার জন্য সে আজ একটা শাস্তিই পাইবে। শাস্তিকে সে আ... করে না। সারাদিন সে বলাইএর গৃহপথের দিকে দৃষ্টি পাতিয়া রহিল। তার পর সে এক সময় দেখিল, ঘরে কেহই নাই—শাস্তিও না। বাহিরে আর-এক মুহূর্ত্তও কানাই দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। চঞ্চল-চরণে এই অবকাশে সে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। বলাইএর তখন একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। কানাই আস্তে আস্তে তাহার শিওরের কাছে বসিয়া স্ফীত-স্থানটা টিপিয়া-টিপিয়া দেখিতে লাগিল। বলাই চমকিত হইয়া উঠিল। কানাইকে দেখিয়া সে চোখ রাঙাইয়া কহিল, "মাকে ডাক্‌ব?—আমার হাতে ব্যথা দিচ্ছ!"

সন্তর্পণে হাত সরাইয়া কথায় স্নেহের সুর ঢালিয়া কানাই কহিল, "ব্যথা দিইনি ত দেখ্‌ছিলাম। কমেছে?"

কানাইএর উপর আক্রোশটা বলাইএর মনে তখনও উদ্দাম হইয়াছিল। সে উদ্ধতভাবে বলিল, "তা শুনে' তোমার কাজ কি? তুমি সরে' যাও।"

কানাই যে বলাইএর ঘরে প্রবেশ করিল, অন্য ঘর হইতে সুখেন্দু তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি মহেশ্বরীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "দেখ গিয়ে মা! ছোঁড়াটা ঘরে ঢুকে' পড়েছে। সবই দেখ্‌ছি ফেলে দিতে হবে।"

...নিয়া-শুনিয়াও কানাই লুকাইয়া এঘরে ঢুকিল দেখিয়া ...াটিয়ে...া মনে সন্দেহ জাগিল,—তিনি বুঝিলেন এ স্নেহের টান।

্র অন্ত-ঘরে ঢুকিয়া তাহাদের কথা-বার্ত্তা শুনিতে

গনাই কহিল, "রাগ করেছিস, ভাই ?"

বলিল, "কর্‌ব না রাগ ? তুমি ফেলে' দিলে কেন ?"

তুই শিলটা ধর্‌লি কেন ?"

"তুমি ধর্‌তে গেলে কেন ?"

"আমি বুঝি খেতাম ?"

"কি কর্‌তে ?"

"তোকে দিতাম।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলাই কহিল, "তাই বুঝি হাতটা ভেঙে দিলে ?"

কানাই বলিল, "ভাঙ্‌বে—জানি ?"

"ভাঙ্‌ল ত !"

"মিথ্যে-মিথ্যে ফেল্‌তে গেলাম যে !'

একটু পরে বলাই জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা মার-ধোর করেছে ?"

"না।"

"কোথায় যেতে বল্‌ছিল যে ?"

"কাল বলেছিল, আর বলেনি।"

"বলুকগে—তুমি যেও না।"

কথা ঘুরাইয়া কানাই কহিল, "চুণ-হলুদ দিয়ে কি হবে ? হাতটা বিছানার উপর পেতে দে, মন্তর পড়ে' দিই, সেরে যাবে।"

পার্শ্বের ঘরে সুখেন্দু ও মহেশ্বরী নীরবে হাসিতে লাগিলেন।

বলাই বিছানার উপর হাত ছড়াইয়া দিল।

কানাই কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার বেদনার স্থানে হাত।

লাগিল ও সাগ্রহে সমস্ত মন ঢালিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল। মহেশ্বরীর মন আনন্দ-গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি শৈলবালাকে সে-ঘরে ডাকিয়া আনিয়া সে দৃশ্য দেখাইতে লাগিলেন। কানাইলালের স্নেহের এ-নিদর্শনে যেন তাঁহারই স্নেহ একটা মহা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দাঁড়াইল।

কানাই অনেকক্ষণ মন্তর পড়িয়া তিনবার ফুঁ পাড়িল। বলিল, "বল্—নেই।"

বলাই বলিল, "নেই।"

শৈলবালা হাসিতে হাসিতে মাটিতে লুটাইতে লাগিলেন।

কানাই এইরূপে পর-পর তিনবার মন্ত্র পড়িল ও ফুঁ পাড়িল।

তার পর কহিল, "আজ রাত্রের মধ্যে সব-ব্যথা কমে' যাবে, কাল বেশ বেড়াতে পার্‌বি।"

ঝাড়ান শেষ হইলে কানাই তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহাকে এখনি চলিয়া যাইতে হইবে। নহিলে না জানি কে দেখিয়া ফেলিবে যে, সে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছে। এ-আশঙ্কাটা তাহার মনের মধ্যে জাগিয়াই ছিল। যাইবার সময় বলাইকে সাবধান করিয়া দিয়া সে কহিল, "এঘরে এসেছিলাম, কা'কেও বলিসনে যেন।"

বলাই কহিল, "না। আর তুমি যেন—বাবা কা'কে আন্‌তে পাঠিয়েছে, তা'র সঙ্গে যেও না।"

কানাই কহিল, "না।"

এই বলিয়া সে আর কোথাও না দাঁড়াইয়া আপনার ঘরে ছুটিয়া গেল এবং তার পর রোজকার মতন তেল মাখিয়া স্নান করিতে চলিল।

সুখেন্দু তখন মহেশ্বরীকে কহিলেন, "যাদের বিবাদ তা'রাই দেখি মিটিয়ে নিলে। এবা। তোমার মনে ত আর কোন গ্লানি নেই?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "গ্লানি কি রাখা যায়? দেখ্‌লি ত এদের ব্যাভার? তুই যে আমার কাছে এদেরই মতন।"

এইসময় পরেশ আসিয়া ডাক দিল "বড়-মা!"

পরেশের ভয় হইয়াছিল যে, টাকার কথা এখনই বাড়ীতে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এবং সে যে বালকের নিকট হইতে প্রতারণা করিয়া লইয়াছে ইহাই প্রমাণিত হইবে।

মহেশ্বরী বাহিরে আসিলে পরেশ টাকা-দুইটি তাঁহার হস্তে দিয়া কহিল, "এই নিন, কানাই-বাবু মচ্‌কা-ঘার মন্তর শেখ্‌বার জন্যে এই টাকা-দুটি দিয়ে এসেছিলেন। আমি শেখাতে চাইনে, তাঁর জিদ দেখে' তামাসা করে' বল্‌লাম, টাকা লাগ্‌বে।—বাবু দৌড়ে এসে টাকা নিয়ে গেলেন। বল্‌লেন, এই বেলার মধ্যেই তাঁকে শিখিয়ে দিতে হবে।"

মহেশ্বরী দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। শৈলর সমস্ত রাগ পড়িয়া গিয়াছিল। সে কহিল, "মা! শুন্‌লে—এমন ভাইকে ভাইএর কোল থেকে টেনে ফেলে' দিতে হয়! বাইরে কোথাও কিছু রেখেছিলে নাকি? এ টাকা পেলে কোথায়?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "বিছানার নীচে ত বরাবর থাকে, হাতও দেয় না। আজ যে টান পড়েছে হয়ত নিতেও পারে। পাঁচটা টাকা ছিল বিছানার নীচে—দেখি!"

মহেশ্বরী যাইয়া দেখিলেন, তিনটি টাকা মাত্র আছে। তিনি বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "আর পাবে কোথায়? বিছানার নীচে থেকেই নিয়েছে।"

পরেশ চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে কানাই স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিছানার নীচে টাকা ছিল, নিয়েছিস্?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কানাইলালের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। তাহার হৃৎপ্রাণটা বাড়ীতে টিপ করিতে লাগিল। সে সাহসপূর্ব্বক কহিল, "না।" ¿, এমন একটা

মহেশ্বরী তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "না কি রে? চুরি কর্‌লে পাপ হয় তা জানিস্?"

বেচারা আর মিথ্যা বলিতে পারিল না। সে যে জেরায় পড়িবে এমন আশঙ্কা পূর্ব্বে তাহার হয় নাই তাই শুষ্কমুখে কহিল, "দুটো টাকা নিলে বুঝি চুরি হয়?"

মহেশ্বরী হাসি দমন করিয়া কহিলেন, "একটা আধ্‌লা পয়সা নিলেও চুরি করা হয়, এ জানিস্‌নে? কেন নিলি?"

কানাই অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বলিবার উপায় নাই!

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্তর শিখ্‌তে গিয়েছিলি কেন?"

কানাই তথাপি নিরুত্তর।

তিনি ধমক দিয়া কহিলেন, "বল্ না, কেন গিয়েছিলি?"

কানাই একান্ত সঙ্কোচভবে নিম্নস্বরে কহিল, "বলা'র হাত ভেঙেছে যে!"

শৈল কহিল, "দেখ্‌লে মা। সব মিলে' গেল ত। ওকে আর ভিজে-কাপড়ে কষ্ট দাও কেন? যা, কাপড় ছাড়্‌গে—যা। সন্ধ্যার সময় তোর ভাইকে আর-একবার ঝাড়িয়ে দিবি।"

মহেশ্বরী একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়িলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কানাই আজ তাঁহার স্নেহের মান রাখিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে শান্তিব বিবাহকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। বড়লোকেব মেয়ে—পাত্র জুটিতে বিলম্ব হইল না। দিনও স্থির হইয়া গেল। পাত্রটি বিলাসপুরের জমিদার-পুত্র।

বিবাহেব দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, কানাইকে লইয়া মহেশ্বরীর ভাবনা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবে গৃহখানি পুর্ণ হইলে গৃহে নিত্যই যজ্ঞব্যাপার চলিবে। তিনি কি করিয়া এই অন্ত্যজ ছেলেটিকে লইয়া সবদিক্ সাম্‌লাইয়া গৃহেব মাঝখানে চলিবেন? কানাইলাল এখন সেয়ানা হইয়াছে, তাহাকে অন্যত্র সরাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু দিদির বিবাহ আসিতেছে, কত বাজি-বাজ্‌না, রং-বোশ্‌নাই হইবে—মিঠাই-মণ্ডা আসিবে, জাঁক-জমকে ও আড়ম্বরে চোখে চম্‌ক লাগিয়া যাইবে—সে প্রতিদিন মহেশ্বরীর নিকট তত্ত্ব লইয়া লইয়া সেই আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহাকে কি কবিয়া অন্যত্র বিদায় করা যায়? আর যে পারে পারুক্—মহেশ্বরী ত পারেন না। তিনি একদিন ভয়ে ভয়ে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুখেন! কানাইকে নিয়ে কি হবে?"

সুখেন্দু কহিলেন, "কি আর হবে। বাড়ীতে এই উৎসব, তুমি আমি বরং অন্যত্র গিয়ে থাকৃতে পারি, ওরা গলায় গলায় সাথী, তুমি ওকে অন্যত্র পাঠাতে চাও নাকি?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "পুরুষের কথা ধরিনি, সবাই বাইরে'র থাক্‌বেন। কিন্তু এই যে সব মেয়েরা আস্‌বেন, ছেলেটা কখন কি করে' বসে, আমার ত ভয়ে প্রাণ কেঁপে যাচ্ছে!"

সুখেন্দু কহিলেন, "তাঁরা মেয়েমানুষ হ'য়ে কি মায়ের প্রাণটা বাড়ীতে রেখে আস্‌বেন? দুনিয়ার উপর যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, এমন একটা নিঃসহায় বালকের এক আধটু অপরাধ যদি তাঁরা ক্ষমা কর্‌তে না পারেন, তবে তুমিও নাচার—আমিও নাচার!"

মহেশ্বরী পুত্রের সদয় মন্তব্য শুনিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইতেছিলেন। তিনি কহিলেন, "আমি ভাব্‌ছিলাম কি—ওকে সঙ্গে করে' নিয়ে দিন-কতক অন্য কোথাও গিয়ে থাকি।"

সুখেন্দু হাসিয়া কহিলেন, "অর্থাৎ এই বিয়েব দিন ক'টা। কি যে বলো তুমি? তুমি না থাক্‌লে শান্তিব বিয়ে দেবে কে? তার চেয়ে মেয়েটাকে বেখে চলো সবাই আমবা সরে' পড়ি—তা'বা এসে নিয়ে যাক্‌ সব হাঙ্গামা চুকে' যাবে।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুমি কেন এত ভাবছ? ও কিছু গোলমাল কর্‌বে না; ওকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে' দিও—আর একটু চোখে-চোখে রাখলেই হবে।"

সুখেন্দুব কথায় মহেশ্বরী তৃপ্তি অনুভব করিলেন। তাঁহার মনে এতক্ষণে একটু সাহস আসিল। আত্মীয়-স্বজন যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদের অপেক্ষা পুত্রের জন্যই তাঁর অধিক ভাবনা হইতেছিল। পাছে পুত্র মনে করেন, তাঁহার জননী গৃহে এই যে একটি উপদ্রব সৃষ্টি কবিয়া রাখিয়াছেন ইহার জন্য আত্মীয়-স্বজনও হয়ত দুই-এক দিনের জন্য আসিয়া শান্তি পাইবেন না, এই চিন্তাই তাঁহাকে ক্রমাগত পীড়া দিতেছিল, অথচ প্রকাশ করিয়া তাহা বলিতেও পারিতেছিলেন না। পুত্রের কথায় তাঁহার সে আশঙ্কা দূব হইল। অপরে তাঁহাকে যাহাই ভাবুক না, পুত্র যদি সানন্দে [illegible]র পক্ষে থাকেন, তবে সকলের চেয়ে বড় দুঃখটা এ-ব্যাপারে তাঁহাকে [illegible]ত হইবে না।

দি[illegible] বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল। গৃহখানিও ক্রমে-ক্রমে আত্মীয়-স্বজনে

পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইঁহাদের মধ্যে এক পরম নিষ্ঠাবতী রমণী আসিলেন। ইনি সুখেন্দুর দূরসম্পর্কীয়া পিসী, ইঁহাকে একটু ছোঁয়া পড়িলেই সর্ব্বনাশ। জল ঘাঁটিয়া পিসীমার দুইহাতে ও পায়ে হাজা ধরিয়া গিয়াছে; তবু পুকুরের ঘাটেই ইঁহার অধিকাংশ সময় কাটিত এবং একছড়া তুলসীর মালার দানাগুলি বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা আহত হইয়া—হাতের মধ্যে অনুক্ষণ চক্রবৎ ঘুরিত। দিনের মধ্যে কতক্ষণ ইনি শুক্‌নো কাপড় পরিতেন, বলা শক্ত। পাড়াপ্রতিবেশীর কল্যাণে ক্রমে-ক্রমে যখন ইনি কানাইলালের পরিচয় পাইলেন, তখন হইতে সে ইঁহার বিষ-নয়নে পড়িল। তিনি ঘাটে বসিয়া যখন আহ্নিক করিতেন, কানাই যদি তখন স্নান করিতে সে ঘাটে যাইত, অম্‌নি বলিয়া উঠিতেন, "জাত জন্ম সবই মারলে রে—যা রে ছোঁড়া ও ঘাটে যা।" বাড়ীতে যতক্ষণ থাকিতেন, তাঁহার ত্রিসীমানার মধ্যে কানাইলালের যাওয়ার উপায় ছিল না। তিনি যেন সর্ব্বদা নিজের চারিধারে একটা অদৃশ্য বেড়া টানিয়া ঘুরিতেন। দেখা হইলেই বলিতেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! মাপ কর্‌বেন, এখানে উঠ্‌বেন না—এখানে আস্‌বেন না।" ইত্যাদি। কানাই তাঁহাকে দেখিলেই সরিয়া যাইত। সে দূরে-দূরে থাকিয়া দেখিতে পাইত, এই উৎসবে তাহার সুখ ও আনন্দটুকু হরণ করিয়া লইবার জন্যই এই রমণীর হিংস্র চক্ষু-দুটি যেন অনুক্ষণ তাহারই সন্ধানে ঘুরিতেছে। শুচিবায়ুগ্রস্তার সমস্ত অশুচিতার কেন্দ্র যেন এই বালকই হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে কোনোপ্রকারে ছাঁটিয়া ফেলিতে না পারিলে পুরাপুরি শুচিতার কলঙ্ক থাকিয়া যাইতেছিল। একদিন মোক্ষদা মহেশ্বরীকে কহিলেন, "বৌ! সুখেন তো তেমন ছেলে নয়, তুমি এ-কি খ্রীষ্টানি মত ধরেছ? কোথা থেকে এসব শিখ্‌লে?"

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খ্রীষ্টানি মত?"

মোক্ষদা কহিলেন, "বামুন-পণ্ডিতের ঘর, ওমা! একেবারে অবাক্ করেছ যে! এক বাগ্দী ছোঁড়াকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরোচ্ছ, এতে কি বিচার থাকে, না আচার থাকে? এ যদি তোমার হিঁদুয়ানি হয় তবে খ্রীষ্টানি আর কা'কে বলে জানিনে ভাই।"

মহেশ্বরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "দিদি! ভিতরেও যে একটা আচার আছে, সেখানে বিশ্ব চরাচর বাঁধা।"

মোক্ষদা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "তা হোক্ বৌ। তোমার এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু ভালো নয়। এ যেমন পোড়া দেশ—সহরে জিনিয়ে যাচ্ছ, আমাদের দেশ হ'লে—।"

মহেশ্বরী তাঁহাকে আর কিছু বলিতে না দিয়াই কহিলেন, "বাড়াবাড়ি আর কি করছি বলো। আমরা কেবল আড়ম্বরই নিয়ে ব্যস্ত, অথচ পূজার খবর রাখিনে।"

মহেশ্বরীর এ শ্লেষ-বাক্য যেন তাঁহারই উপর নিক্ষিপ্ত হইল, মোক্ষদা এইরূপ মনে করিলেন। তাঁহার দুর্ব্বল চক্ষু দুটি জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কর্কশকণ্ঠে কহিলেন, "এখন শেষকালটায় একটু ভগবানের নাম নিই, তাও বুঝি কারও চোখে সইছে না। তোমার মতন জা'ত খোয়াতে পারলে বুঝি ভালো হ'ত!"

মহেশ্বরীর ইচ্ছা নয় যে, বাড়ীতে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাদের সহিত একটা মন কষাকষি করেন। কিন্তু কথাটা এইখানে চাপা পড়িয়া গেলেও মোক্ষদার মনের আগুন জ্বলিয়াই থাকিবে বিবেচনা করিয়া তিনি বলিলেন, "জা'ত খুইয়েছি তোমায় কে বল্লে? আচার-ব্যবহার নিয়েই জাতিভেদ হয়েছে। সে হিসাবে বাগ্দী একটা নীচ জাতি স্বীকার করি; তবু বলে' একটা মানুষের বাগ্দীর ঘরে জন্ম হয়েছে ব'লেই তার উপর বিষদৃষ্টি রাখতে হবে, আর একটা ব্রাহ্মণের ছেলের আচার-

ব্যবহার যদি অত্যন্ত হীনও হয় তবে তার উপর সু-দৃষ্টি দিতে হবে—এরই বা কি মানে আছে?"

মোক্ষদা ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "তা হ'লে মুচি, মেথর সবই তোমার জা'তে তুলে' নেও! সবাই বামুন হ'য়ে যাবে, আর কোনো বালাই থাক্‌বে না।"

মহেশ্বরী ব্যথিতা হইয়া কহিলেন, "আমার কথা ত বুঝে' দেখ্‌বে না, সে কথা আমি বলিনি। ছোঁড়াটার ত্রিসংসারে কেউ নেই, সে বাগ্দীর ছেলে, মনে-মনে এই ধারণাটা সকলের বড় করে' রেখে কি আমরা তা'কে একটু আশ্রয়ও দেবো না? সেও ভগবানের জীব, আমরা না রাখ্‌লে দাঁড়াবে কোথায়?"

মোক্ষদা বলিলেন "তা দাও। একঠাঁই পড়ে' থাক্‌তে দিলেই গড়ে' উঠ্‌বে। কিন্তু কোলে পিঠে করে' নিয়ে বেড়ানোর ত কোনো দর্‌কার দেখিনে।

"খুবই দর্‌কার। তা'র যে বয়েস, তা'তে তা'র যা দর্‌কার, সব পূরণ কর্‌তে না পার্‌লে, তা'কে আশ্রয় দেওয়া বলে না।"

মোক্ষদা তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, "আড়াই বৎসর বয়েস থেকে যখন পালন করেছ, তখন ত তা'র মাতৃস্তন্যেরও দর্‌কার ছিল!"

মহেশ্বরী সহজভাবেই কহিলেন, "হাঁ, তা সে পেয়েছেও। আমরা যে মায়ের জাতি, এখানে সন্তান নিয়ে জাতি বিচার হয় না।"

মোক্ষদার মনে হইতেছিল, আগে জানিতে পারিলে তিনি এমন ম্লেচ্ছের বাড়ীতে আসিতেন না। তিনি সে-কথা মুখে প্রকাশ করিয়াই বলিলেন, আগে ত ভাই সব-কথা জান্‌তে পাইনি—।"

মহেশ্বরী বলিলেন, "জান্‌লে বুঝি এ-বাড়ীতে পা দিতে না? আচ্ছা দিদি! তুমি ত এই কয়েকদিন এসেছ, আমি তা'কে নিয়েই ঘর করছি, তাও দেখ্‌ছ, কিন্তু আমার জাতির গায়ে কোন আঁচড় পড়তে দেখ্‌

গায়ে লাগলেও নেয়ে-ধুয়ে শুদ্ধ হওয়া যায়; আর জগতের যাতে কল্যাণ, এমন একটা আত্মার সংস্রবে গেলে কি শুদ্ধ হবার কোন পথই নেই?"

মহেশ্বরীর অনাচার-কদাচার মোক্ষদা কোনদিনই দেখিতে পান নাই। কানাইলালের যে সব ঘরে যাইতে বাধিত, সে সব ঘরে তাহার যাইতে নিষেধ ছিল। মোক্ষদা দেখিতেন এই সহৃদয়া রমণী আপনার নিষ্ঠাটুকু সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া ছেলেটিকে কেমন বুকের মধ্যে করিয়া রাখিয়াছেন। দিনের মধ্যে দুশো-বার স্নান করিতেছেন—বস্ত্র ত্যাগ করিতেছেন, একটুও ক্লান্তি বা বিরক্তি নাই। মোক্ষদা বলিলেন, "তেমন কিছু দেখিনি। কিন্তু ধন্য সাধ্য তোমার! আড়াই বছব থেকে দশ বছরে এনে ফেলেঁছ, আমরা হ'লে পেরে উঠতাম না। সেজন্যে ত বলিনে; আদৎ কথা হচ্ছে এতে তোমারও কষ্ট হয়—লোকেও ভালো দেখে না।"

মোক্ষদা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন দেখিয়া মহেশ্বরী আনন্দিতা হইলেন। বলিলেন, "আমার কষ্ট কিছুই নেই। কিন্তু ঐ ত আমাদের দোষ! লোকে মন্দ বল্‌লে আর রক্ষে আছে? লোকে মন্দ দেখবে ভেবে যারা সৎকাজ কর্‌তে নিরস্ত হয়, তা'রা দেখতে পায় না যে, তাদের শুধু নিরস্ত হওয়া হয়নি, দলে মিশে' পড়ে' তা'রাও মন্দটা গ্রহণ করে' বসেছে—আর সৎ যেটা—সেটা হারিয়ে ফেলেছে।"

এই সময় কানাই আসিয়া কহিল, "বড়-মা! বলাই রসগোল্লা খাচ্ছে।"

মহেশ্বরী বলিলেন, "খাবে না? সাত লঙ্কায় টো-টো করে' বেড়াবি সেইখানে দিয়ে আস্‌তে পার্‌লে হয়—নয়? ঘরে ঢাকা রয়েছে ছাখ্‌গে যা—ছোট মা রেখে এসেছে।"

কানাই প্রফুল্লমুখে এক-পায়ে লাফাইতে-লাফাইতে চলিয়া গেল। দুর্ব্বলতার মধ্যেও মাতৃ-স্নেহের স্বাভাবিক উৎসটি একটু উন্মুখ হইয়া উঠিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহেশ্বরীর সহিত আলোচনায় মোক্ষদার নারী-হৃদয়ের সার-বস্তুটি এমন সাক্ষাৎগোচর হইয়া পড়িল যে, পর দিন দেখা গেল, মোক্ষদাকে যে জলখাবার প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইতে তিনি নাম মাত্র খাইয়া সমস্তই কানাইলালকে অর্পণ করিতেছেন! মহেশ্বরী চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বস্তি হইল না। মোক্ষদা ত একটি নয়! এই কর্ম্ম-কোলাহল-মুখরিত বাড়ীতে কত মোক্ষদারই আবির্ভাব হইয়াছে! তিনি সকল দিকে চক্ষু রাখিয়া এই অবুঝ শিশুটিকে কিরূপে রক্ষা-কবচের মতো সকলের আঘাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন?

আজ শান্তির বিবাহ। মহেশ্বরী প্রথম প্রথম বহুক্ষণ কানাইলালকে চোখে চোখে রাখিয়াছেন। কিন্তু বাড়ীর গৃহিণী তিনি কতক্ষণ আর কেবল কানাইকে লইয়া থাকিবেন, কাজ-কর্ম্মের গুরুভারে ক্রমে ক্রমে তিনি চারিদিকে জড়াইয়া পড়িলেন। শেষকালটায় কোথায় যে কানাই গিয়া পড়িল আর কোথায় যে তিনি রহিলেন ঠিক করা শক্ত হইয়া উঠিল। এতদিন যে সব ঘর অব্যবহার্য্যরূপে পড়িয়াছিল, যাহা কানাই বলাই প্রভৃতি শিশুগণ খেলিবার স্থানরূপে ব্যবহার করিত, সে-সব ঘরে আজ কাজের ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে। খেলা-ঘরের পথ শিশুর ভুলিয়া থাকা শক্ত; তাই বলাই দিনে দশবার সেই সব ঘরেই ঘুরিতেছিল, কিন্তু কানাইলালের অভ্যস্ত চরণ-দুখানি সেই সকল স্থানে যাইতে আজ প্রতিপদেই বাধা খাইতেছিল। লোকজনে কোথাও লুচি দার্, কোথাও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছে, কোথাও বা তরকারি কুটিল,

হইতেছে। যাহারা লুচি ভাজিতেছিল, তাহারা কানাইলালকে দেখিলেই হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া বলিতেছে, "উঠিস্ নে—উঠিস্ নে—এখানে উঠিস্ নে।" যাহারা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছিল, তাহারা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিতেছে, "ঐখানে দাঁড়া, একখানা জিলিপী দিচ্ছি, নিয়ে চলে' যা।" যাহারা তর্‌কারী রাঁধিতেছিল, তাহারাও বলিতেছে, "সরে' যা—সরে' যা—যজ্ঞি নষ্ট করবি নাকি ?" অকস্মাৎ আজ শুভ উৎসবের আনন্দের মধ্যে সে যেন মূর্ত্তিমান দুর্গ্রহ হইয়া উঠিয়াছে। সারাদিন এইরূপে প্রতিস্থানেই বাধা পাইয়া সে এক একবার সেই স্থানে যাইয়া শুষ্কমুখে দাঁড়াইতেছিল, যেখানে তাহার প্রাণটি বিশ্বসংসারের মধ্যে একটি মাত্র জুড়াইবার স্থান পাইয়াছিল, মহেশ্বরীর সান্ত্বনা-বাক্যে প্রাণের সমস্ত ব্যথা ধুইয়া মুছিয়া বাল্যস্বভাব লইয়া—সে আবার এখানে সেখানে যাইয়া দাঁড়াইতেছিল।

সন্ধ্যার সময় একটি গৃহে কতকগুলি যুবতী মিলিয়া মহা কোলাহলের সঙ্গে শান্তিকে বধূ-বেশে সাজাইতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। কেহ ললাটে চন্দনের ফোঁটা কাটিতেছিলেন, কেহ ওষ্ঠ দু'খানি লাল রঙে রঞ্জিত করিয়া দিতেছিলেন, কেহ কেহ বা চুড়ী আগে থাকিবে, কি ব্রেস্‌লেট আগে থাকিবে তাহারই বিচার করিতে করিতে হয়রাণ হইয়া পড়িতেছিলেন। চারিদিকে ব্যস্ততা ও আনন্দেব একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

কানাই ব্যতীত আরও অনেকগুলি সঙ্গী বলাইএর জুটিয়াছিল। ...র লইয়া যুবতীদের ঘিরিয়া তাহার দিদির এই নববেশ ... দিদিকে লইয়া এমন হুলস্থুল করিতে জীবনে সে আর ... নাই। কানাই কিন্তু দ্বারের কাছে চুপ্‌টি করিয়া ঘরে ঢুকিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। অথচ সাধও তাহার বলাইএর অপেক্ষা কিছু কম ছিল না।

হঠাৎ একটি যুবতীর নজর তাহার উপর পড়িল। তিনি খন্‌খনে গলায় বলিয়া উঠিলেন, "মনো দি, ঐ দেখ, বেল্লিকটা ঠিক সময় এসে হাজির হয়েছে। বাগ্‌দীর পো! দয়া ক'রে একটু এদিকে-ওদিকে যাও, এখন ক'নে যাত্রা করে' বেরুবে।" আর একটি যুবতী বলিলেন, "কতদিকে কত আমোদ পড়ে' রয়েছে, সেখানে যেতে মন ওঠে না; এখানে এসে নাগাল নিয়েছ কেন?" মোক্ষদা তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, "কেন তোরা ছেলেটির পিছু অমন লেগেছিস্? আহা! এক সঙ্গে চলে ফেরে—ওঠে বসে—দেখবে না?" অল্পবয়সের কঠোর সমালোচনার কাল তিনি অনেক দিন কাটাইয়া উঠিয়াছেন; তাই এই বালকের প্রতি একবার স্নেহদৃষ্টি পড়িয়া যাওয়াতে তাঁহার আচারনিষ্ঠাও তাঁহাকে আগের মতন কঠিন বিচারক করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না।

প্রথম যুবতী তেম্‌নি জোর-গলাতেই কহিলেন, "কি যে বলো পিসি! জীবনের আজ একটা প্রধান যাত্রা! ম্লেচ্ছের মুখ দেখে ঘর থেকে বেরুবে?"

ইতিমধ্যে আর একটি যুবতী উঠিয়া বালকের নিকটে গিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন আরম্ভ করিয়াছিলেন, "যা ছোঁড়া—যা এখান থেকে বল্‌ছি। ফের্ যদি এখানে আস্‌বি কান টেনে লাল করে' দেবো।"

আড়াই বছরের কানাইলাল যেদিন বাড়ীতে আসে, সেই দিন হইতে শান্তি তাহাকে ভালোবাসে। আজ ইহাদের নিষ্ঠুরতা শান্তির প্রাণে বড় লাগিয়াছিল।

এই সব যুবতীদের সহিত তাহার ঝগড়া করিতে ইচ্ছা, সে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, দাঁড়িয়ে—হয়েছে কি?"

প্রথম যুবতী বিস্ফারিত-নেত্রে শান্তির দিকে চাহিয়া ধম্

"নে, তুই চুপ কর! বিয়ের ক'নে, তোর কথায় কাজ কি?" শান্তি তবু চুপ করিতে পারিল না।

কানাইলালের বিষণ্ণ মুখখানি দেখিয়া তাহার চক্ষে জলধারা গড়াইতে লাগিল। সে কহিল, "সকলে এমন করে' লেগেছে! বলা! বড়-মা মরেছে নাকি?"

মোক্ষদাকে সম্বোধন করিয়া যুবতীরা কহিলেন, "দেখ পিসি! চোখের জল ফেলে' কি অকল্যাণ করছে।"

মোক্ষদা বলিলেন, "আহা! জুড়ি যে! অমন করে' বলছিস্—কাঁদবে না? কানাই! বাবা! তুমি যাও লক্ষ্মী আমার, বাজি-পোড়ানো দেখগে। না গেলে ত ছাড়বে না!"

দিদির বিবাহ-সভার যাত্রা তাহার দেখা হইল না।

কানাইলালের চক্ষুদুটি দিয়া অবিশ্রান্ত জল গড়াইতে লাগিল। সে আস্তে-আস্তে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। তাহার এই কালো মুখখানি কোথায় যাইয়া লুকাইবে, সে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। বিশ্বে এত লোক থাকিতে সে-ই কি করিয়া তাহার দিদির অকল্যাণের কারণ হইল? সে ধীরে-ধীরে সভাশোভনের স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত কত-রকমের আধারে কত-কত উজ্জ্বল আলোক সকল জ্বলিতেছিল; তাহার চক্ষে সে-জ্যোতিঃ অত্যন্ত ম্লান বোধ হইতে লাগিল। ঢোল, কাঁশী ও সানাইএর মঙ্গলবাদ্য তাহার প্রাণে বেদনার সুরে ঝঙ্কার তুলিতেছিল। সে সেখানে দাঁড়াইতে না পারিয়া পুকুরের ঘাটে সোপানের উপর আসিয়া বসিল। সে-গৃহের সকলেই যখন উৎসবের আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে, তখন একটি দশম বর্ষীয় বালক শুধু হৃদয়-ভরা নিগ্রহ লইয়া কি জানি কাহাকে তাহার প্রাণের বেদনা নিবেদন করিতে নির্জ্জন বাপীতীরে আসিয়া বসিল!

বালিকের মন—চিন্তার কোন শৃঙ্খলা নাই—কোন কিছু সাজাইয়া গোছাইয়া ভাবিবারও ক্ষমতা নাই—কেবল কতকগুলি গোলমেলে চিন্তা মনে উঠিয়া তাহাকে একেবারে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল; সে কেবলই ভাবিতেছিল,—আরও কত ছেলে-মেয়ে খেলিতেছে—বেড়াইতেছে—সর্ব্বত্র যাইতেছে আসিতেছে, কাহাকেও কেহ কিছু বলে না, তাহাকে কেন সকলে এমন 'দূর' 'ছাই' করিতেছে? ইহাদের চেয়ে সে কি তাহার আরো নিজের, আরো আপন নয়? ইহারা আজ একদিন আসিয়া এত আনন্দ লুটিয়া লইতেছে; আর তাহার চিরদিনের গৃহে তাহার কেন এ লাঞ্ছনা?

এ-বাড়ীতে কতকগুলি স্থানে তাহার যাতায়াত নিষিদ্ধ, সে এ-যাবৎ এইমাত্র বুঝিয়া আসিতেছিল; কিন্তু কোন দিন সে ইহার কিছু কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখে নাই। মহেশ্বরী যেরূপ বুঝাইতেন, যেরূপ বলিতেন, সে সেইরূপ বুঝিত ও করিত; এবং তাহাই তাহার অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়াই সে মনে করিত। কিন্তু এই যে কতকগুলি উড়ো লোক আসিয়া 'বাগ্দীর পো' 'ছুঁস্‌নে' 'যাস্‌নে' করিতেছে ইহারই বা অর্থ কি? আচ্ছা! "বাগ্দীর পো"-টা কি? বোধ হয় মস্ত গালি হবে। এইরূপ চিন্তা করিতে-করিতে সে যখন দেখিল হাউই, চর্‌কী তুব্‌ড়ী প্রভৃতি নানা বর্ণের বাজি পুড়িয়া বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণটি আলোকিত করিয়াছে, তখন সে আবার ধীরে-ধীরে তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ সে-সকল দেখিয়া বাজিকরেরা যে-ঘরে বসিয়া বাজি পুরিতেছিল সে সেইখানে যাইয়া বসিল। তার পর খোলাটি পুরিয়া পাতা পড়িল, হুড়-হুড় হুড়-হুড় করিয়া অসংখ্য লোক আসিয়া আহারে বসিয়া গেল, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ইত্যাদি নানাবিধ সুরসাল খাদ্যের দ্বারা সকলে উদর পূর্ণ করিল এবং লম্বা-লম্বা ঢেকুর তুলিয়া চলিয়া গেল। কানাইলাল সেই বারুদঘরের এক অন্ধকার কোণে বসিয়া সমস্ত দেখিল।

রাত্রি তখন তিনটা। বালকের তখনও পর্য্যন্ত আহার হয় নাই। এত লোক জন আসিল—খাইল—চলিয়া গেল—সে বসিয়া-বসিয়া দেখিল!

তাহাব আহারের ইচ্ছাও হইল না—সে-চেষ্টাও সে কবিল না! আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে সারাদিন ধরিয়া এই অযথা অপমানে তাহার কচি মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল।

মহেশ্বরী প্রথমতঃ বিবাহের কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। তাব পর মেয়েদের আহাবেব তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন,—কানাইলাল কোথাও-না-কোথাও বসিয়া দু'টা খাইয়া লইয়াছে।

যখন কাজকর্ম্ম সকল মিটিয়া গেল, তখন ঘরে আসিয়া দেখিলেন, কানাই আসে নাই। বলাই তাহার ঘবে ঘুমাইতেছে, অন্যান্য বালকেরাও নিদ্রা যাইতেছে। মহেশ্বরীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সারাদিনের ব্যস্ততায় চাপাপড়া নানা আশঙ্কা মাথা জাগাইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি তখন তাহাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য বাহির বাড়ীতে লোক পাঠাইলেন; এবং একটি আলো লইয়া নিজে অন্দরের সকল স্থান অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু সকল অনুসন্ধানই ব্যর্থ হইল। কানাইকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সুখেন্দু সে সংবাদ পাইয়া নিজে বাহির হইয়া অনেক অনুসন্ধান করিলেন—কোথাও পাইলেন না।

কর্ম্মের বাড়ীতে সারাদিন খাটুনিব পর তখন অনেকেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। মহেশ্বরী পাগলিনীর ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। বালকেব প্রতি সকলেবই ঈর্ষ্যা—কি জানি কাহারও বাক্যে কোন বিপদ ঘটিল না ত? সকাল হইতে তাহাকে চোখে-চোখে রাখিয়া কেন মিথ্যা-কাজের অসময়ে তাহাকে চোখের আড়াল করিলেন? আর কি তাহাকে পাইবেন? তিনি বলিলেন "সুখেন! তুই বাহিবের পুকুরটা একবার দেখে' আয়, আমি ভিতরেরটা দেখি।" কথাটা বলিতে বুক কাঁপিয়া

যাইতেছিল ; কিন্তু সত্য যদি হয়, কেবল কি মুখে উচ্চারণ না করিয়াই অমঙ্গল ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন ?

সুখেন্দুকে পাঠাইয়া দিয়া মহেশ্বরী অন্দরের পুষ্করিণীটির চারিধার একবার ঘুরিয়া আসিলেন। তাহার পর সিঁড়ি বাহিয়া পুকুরে নামিলেন। প্রথমতঃ হাঁটু জল—তার পর কোমর জল—পরে গলা জল—তার পর ডুবের পর ডুব দিতে লাগিলেন। তাঁহার জানা ছিল যে, কানাইলাল সাঁতার জানিত, হঠাৎ জলে ডুবিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অভিমানভরে বয়স্ক লোকে যা করে—বালকে কি তা করিতে পারে না ? প্রিয় বস্তুর অভাব হইলে অসম্ভবও অতিসম্ভব-রূপে মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বাসে।

ইতিমধ্যে একজন আসিয়া সংবাদ দিল, কানাইলালকে পাওয়া গিয়াছে। মহেশ্বরী তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়া আসিলেন। তাঁহার দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। কিন্তু পরক্ষণেই আর একটা ভয়ানক আশঙ্কা মনে জাগিয়া উঠিল। সুখেন্দু কহিলেন, "মা দেখে' যাও, তোমার ছেলের কীর্ত্তি।" বরযাত্রী এবং অন্যান্য লোকজনেরা তখন সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। মহেশ্বরী শঙ্কিতমনে সুখেন্দুর সহিত বাহির-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন বারুদঘরের একপার্শ্বে জ্বালানী কাঠের উপর বালক অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে!

তখন প্রভাত হইয়াছিল। মহেশ্বরী তাহাকে ডাকিয়া তুলিলেন। দেখিলেন, চক্ষু-দুটি বসিয়া গিয়াছে—উদরটিতে বুভুক্ষার সকল লক্ষণই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেকে কোলে জড়াইয়া শত চুম্বনে ছাইয়া দিয়া মা বলিলেন, "এখানে শুতে কে বলেছে তোকে ?"

কানাইলাল মাথা নীচু করিয়া রহিল।

মহেশ্বরী চোখের জল লুকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে খাস্‌নি কিছু ?"

সে কথা বলিল, "না।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সে বুঝ্‌তে পেরেছি—আয় খাবি আয়! আহা! পেট্‌টা দেখি চিল্‌তে-পানা হ'য়ে গেছে! বাছা রে!"

গতরাত্রের লুচি, তরকারী ও মিষ্টান্ন মহেশ্বরী বসিয়া-বসিয়া, কানাই-লালকে খাওয়াইতে লাগিলেন। তার পর ধমক্ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখানে কাঠের বোঝার উপর শুতে গেলি কেন?"

কানাই চুপ্ করিয়া থাকিয়া একবার ঝাঁকুনি দিয়া বলিয়া উঠিল, "ইচ্ছে।"

"এ যে বড় বেজায় ইচ্ছে! অমন আরামের শয্যার উপর ইচ্ছে না হ'লে আর কোথায় হবে!"

কানাই কিছুকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "বিয়ে ত হ'য়ে গেল, এরা সব যাবে কবে?"

"কা'রা?"

কানাই মুখ শিঁট্‌কাইয়া কহিল, "থালা-থালা খেতে দিতে পারেন,—জানেন না কা'রা!"

মহেশ্বরী হাসি চাপিয়া কহিলেন, "বরযাত্রীরা?"

কানাই আবার মুখ শিঁট্‌কাইয়া কহিল, "বরযাত্রীরা?—মুক্ষীরা।"

বস্তুতঃ মোক্ষদার ব্যবহার-গুণে কানাইলাল পশ্চাতে তাঁহার উপর সদয় হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে আর কাহারও নাম জানিত না। তাই মোক্ষদাকেই মুখপাত্র-রূপে ধরিল।

মহেশ্বরী হাসিয়া কহিলেন, "এখুনি যাবে? কুটুমবাড়ী এসেছে, দু'পাঁচ মাস থাক্‌বে যে!"

কানাই শিহরিয়া উঠিল। বলিল, "দু—পাঁ—চ—মা—স?"

মহেশ্বরী তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, "মায়ের ছেলে মায়ের কাছে থাক্‌বি—তোর ভাব্‌না কি? পাঁচ মাস ছেড়ে দশ মাস থাক্ না তা'রা, আমার কোল থেকে তোকে দূরে ঠেলে কার সাধ্যি?"

নবম পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর আত্মীয় কুটুম্বেরা সে-কয়দিন যে-বাড়ীতে ছিলেন, সে কয়দিন কানাইকে গৃহে বড় পাওয়া যাইত না। সে অবসর-মতন দু'টা খাইয়া সমস্ত দিনটা পথে পথে কাটাইয়া আসিত।

বিবাহে যাঁহাবা আসিয়াছিলেন, যখন একে একে তাঁহারা সকলেই চলিয়া গেলেন, তখন সে আবার ঘরের তলে মাথা দিল। এইসকল অভ্যাগত আমন্ত্রিতেরা তাহার হৃদয়ে যে একটা শূন্যতা রচনা করিয়া গেলেন, তাহাতে মহেশ্বরীকে লইয়া সে যে আশার নেশায় ঘুরিতেছিল তাহাতেও কেমন একটা খট্‌কা লাগিল। মহেশ্বরীর আচরণে তেমন একটা যুক্তির প্রেরণা না থাকিলেও এই যে ছোঁয়া-খাওয়া লইয়া একটা গভীর নিশ্বাস মহেশ্বরীর বুক ভাঙিয়া বাহির হইত; এই নিশ্বাসই তাহার কোমল প্রাণটি দু'খানা করিয়া ফাটাইয়া দিত। তাহার বিশৃঙ্খল অনুভূতির সীমার মধ্যে বিচারহীন বেদনা যে কোথা হইতে জাগিয়া উঠিত, তাহা সে স্থির করিতে পারিত না।

এই বেদনার সংগ্রামে তাহার অন্তরের দুঃখটাই নিভৃত প্রদেশে নিরালা বসিয়া তাহাকেই কুরিয়া কুরিয়া খাইতে লাগিল। মহেশ্বরী দেখিলেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সে যেন দিন-দিন মুষ্‌ড়িয়া যাইতেছে। তাহাব চোখের সে দীপ্তি, মুখের সে স্বচ্ছতা যেন একখানি পাত্‌লা কুয়াশা কোন্ দিক্ হইতে আসিয়া অল্পে অল্পে গ্রাস করিতেছে।

একদিন শয়ন করিবার পর সে মহেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বড়-মা? আমাকে রান্নাঘরে—পূজার ঘরে যেতে দাও না—আমি পূজার ফুল তুল্‌তে পারিনে—জল ছুঁলে' ফেলা যায়—কেন?"

সুখেন্দুর কথা মহেশ্বরীর স্মরণ হইল। সুখেন্দু বলিয়াছিলেন,—"তুমি ওকে যেভাবে গড়ে' তুলছ তা'তে যখন ও নিজেকে জান্‌তে পারবে তখন মস্ত একটা ধাঁধাঁর মধ্যে পড়ে' যাবে।"—সত্যই ত! এখন হইতে উহাকে কিছু কিছু জানিতে দেওয়া উচিত। যত বড় হইতেছে এইসকল বাধা বিঘ্ন উহাকে ততই একটা সমস্যার মধ্যে ফেলিয়া দিতেছে। মহেশ্বরী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিলেন, "তোমার বাড়ী এই গ্রামেই—উত্তর পাড়ায়। তোমার মা-বাপ মারা গেলে এখানে এসেছ, তুমি তখন খুব ছোট।"

কানাইলাল নিরুদ্যম হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উত্তর পাড়া—সে আবার কোথায়? কেন—তুমি আমার মা নও?" কানাই দুই হাতে মহেশ্বরীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল।

মহেশ্বরী তাহার কপালে চুম্বন দিয়া কহিলেন, "মা বৈ কি! তাঁরা তোমায় ছেড়ে গেছেন—আমি যেতে পারিনি। আমি চিরদিনই তোমার মা থাক্‌ব।"

বালক হাত আল্‌গা করিয়া লইয়া ফোঁস্ করিয়া নিশ্বাস ছাড়িল, "উত্তর পাড়া কোথায় বড়-মা? সেখানে আমার বাড়ী আছে?"

মহেশ্বরী ব্যথিতকণ্ঠে কহিলেন, "তোমাকে একদিন দেখিয়ে আন্‌ব। সেখানে এখন অন্য লোকে বাস করে। তোমাকে আমরা বাড়ী ঘর করে' দেবো।"

বালক হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া কহিল, "তুমি সে বাড়ীতে থাক্‌বে ত? সে বেশ হবে। বড়বাবু বোধ হয় যাবে না?"

সুখেন্দুকে সে বড়বাবু বলিয়া ডাকিত। সে দেখিল সুখেন্দুর সংস্রব ত্যাগ করিয়া এই স্নেহের নির্ঝরিণীকে লইয়া অন্য স্থানে গেলে সে বড় সুখের হয়।

মহেশ্বরী কহিলেন, “আমি যতদিন আছি, কোথাও যেতে হবে না। এইখানেই থাক্‌বে।”

বালক আবার নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। সে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা! আমাকে পূজার ঘরে—রান্নাঘরে, যেতে দাও না কেন?”

মহেশ্বরী অতি কষ্টে অথচ স্পষ্টভাবেই উচ্চারিত করিলেন, “তুমি বাগ্‌দীর ছেলে—আমরা বামুন কিনা, তাই আমাদের বাধে।”

বালক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বাগ্দী কি?”

মহেশ্বরী কহিলেন, “আমরা যেমন বাঁড়ুয্যে—নেদোরা যেমন চাটুয্যে—ভুতোরা যেমন ঘোষ—তেম্‌নি বাগ্দী একটা জা’ত।”

“তা’তে কি হয়েছে? আমাকে রান্না ঘরে যেতে দাও না কেন তাই বলো না?”

“বল্‌লাম যে—আমাদের বাধে। তোমরা জল ছুঁলে সে জল মারা যায়।”

দশম বৎসরের বালক হইলেও কানাইলালের চক্ষে যেন সমস্তই অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের বাড়ীর কাছেই কাওরারা বাস করিত। তাহারা যে অত্যন্ত হীন জাতি তাহা তাহাদের আচার ব্যবহারে সে বেশ বুঝিতে পারিত। বিশেষতঃ ইঁহারা কেহই তাহাদের ঘরে উঠিতে দেন না, জল ছোঁয়া পড়িলে ফেলিয়া দেন, এ সকলই সে দেখিত, জানিত। সে অত্যন্ত বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ হইয়া ম্লান মুখে জিজ্ঞাসা করিল, “বাগ্দী কি কাওরার মতন?”

মহেশ্বরী তাহার হৃদয়ের তাপ বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, “কাওরার মতন হবে কেন? তা’রা যে অত্যন্ত ছোট জা’ত।”

“তবে বাগ্দীর জল ছোঁও না কেন?”

“তা’রা লেখাপড়া শেখে না—হীন হ’য়ে থাকে সেইজন্যে।”

মহেশ্বরী ক্রমে ক্রমে বালককে সান্ত্বনা দিবার পথে চলিতে লাগিলেন। কানাই একটা পথ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লেখাপড়া শিখলে ছোঁও?"

"তা ছোঁয়া যায়।"

সে উৎসাহিত হইয়া কহিল, "আমাকে ত লেখাপড়া শেখাচ্ছ?"

মহেশ্বরী হাসিয়া কহিলেন, "প্রথম ভাগ ছেড়ে দ্বিতীয় ভাগ পড়ছ, ওকে কি লেখাপড়া বলে? বেশী-বেশী বই পড়তে হবে। আমার কাছে বসে-বসে গল্প শুন্‌বে—যে-সব শ্লোক বল্‌ব মুখস্থ কর্‌বে—মানে শিখবে—তবে না লেখাপড়া শেখা হবে।"

কানাইলাল ক্রমেই উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছিল! সে কহিল, "তাই যদি শিখি, তা হ'লে রান্নাঘরে ঢুক্‌তে দেবে?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "আগে সেই পর্য্যন্ত শেখো—তখন দেবো।"

বালক নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

তার পরদিন সে রকের উপর বসিয়া আপন মনে বকিতে লাগিল,—"রান্নাঘরে ঢুক্‌ব না আবার! এই ত দ্বিতীয় ভাগ শেষ হ'য়ে গেল, তার পর বড়-মা বলেছে—শিশুশিক্ষা; তার পর বোধোদয়। শ্লোক—সে ত শুয়ে পড়ে' মুখস্থ কর্‌ব। বড়-মা শেখালে আবার ক'দিন লাগে শিখতে? তখন দেখব ছোট-মাকে জব্দ কর্‌তে পারি কি না! ছুঁস্‌নে—যাস্‌নে—নেমে দাঁড়া—জল নেবো—ওসব নষ্টামি-বুদ্ধি তখন খাট্‌বে না। বড়বাবু—ওঃ! বড়বাবুকে ভারি ভয় কর্‌তে হবে কিনা! লেখাপড়া শিখলে কা'কেও ভয় কর্‌তে হবে না। আচ্ছা! দাঁড়াও আমি এক-এক করে' সব জব্দ কর্‌ছি।"

শৈলবালা মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিতে-হাসিতে দম্ আট্‌কাইবার মতন হইল। মহেশ্বরীও ঘরে থাকিয়া শুনিতেছিলেন। তাঁহার অন্তরে প্রত্যেকটি কথা তীক্ষ্ণ শেলের মতন বিদ্ধ হইতেছিল। হায় শিশুর মন!

সংসারের দুর্ব্বোধ্য জটিলতা তাহাকে তিনি কি করিয়া বুঝাইবেন? শৈলবালা হাঁপ ছাড়িয়া কহিল, "মা, তোমার ছেলেকে ঠেকাও। এই গরমের দিনে যে পাগল হ'য়ে উঠ্‌ল।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তোর ছেলে—তুই ঠেকা।"

শৈল কহিল, "তুমি যে বীজমন্তর ওর কানে ঢুকিয়ে দিয়েছ, সে ঠেকানো কি আমার কাজ?"

মহেশ্বরী ঘর হইতে কহিলেন, "কি বক্‌ছিস্ রে? পড়াশুনোর নামে ঢোঁ ঢোঁ—তা'র আবার বাক্যির জোর দেখ! আগে লেখাপড়াই শেখ—তার পর আস্ফালন করিস্।"

সে লজ্জা পাইয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

কানাইলাল বাহির-বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, বলাই সুখেন্দুর নিকটে বসিয়া একখানি বই লইয়া পাতা উল্‌টাইয়া-উল্‌টাইয়া ছবি দেখিতেছে। সে দ্বারের নিকটে আসিয়া সুখেন্দু দেখিতে না পান এরূপভাবে একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া ধীরে ডাকিল, "বলা!"

বলাই মুখ ফিরাইয়া চাহিল।

কানাই কহিল, "শোন্।"

বলাই তন্ময় হইয়া ছবি দেখিতেছিল। সে কিছু বিরক্ত হইয়া কহিল, "কি-ই-ই।"

"শোন্ না?"

বলাই অগত্যা পুস্তক ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। কানাই কহিল, "আয়!"

"কোথায়?"

"আয় না—"

তাহার পর উভয়ে কিছু দূরে পথের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। কানাই একটা বাকস্‌গাছের ডাল আপনার দিকে টানিয়া লইয়া তাহার একটি পাতার উপর নখদ্বারা আঁচড় কাটিতে-কাটিতে মুখখানা কিছু গম্ভীর করিয়া কহিল, "জানিস্ বড়-মা আমাকে রান্নাঘরে ঢুক্‌তে দেবে?"

বলাই ও শান্তি প্রভৃতি শিশুরাও বাড়ীর লোকদিগের আচার-ব্যবহারের ধরণ হইতে ধারণা করিতে পারিয়াছিল যে, কানাইলালের ভিতরে এমন কিছু-একটা জিনিস যেন রহিয়া গিয়াছে, যাহা তাহাদের গৃহের সকল

লোকগুলির সামঞ্জস্যের মধ্যে তাহাকেই কেবল স্থানে-স্থানে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। বলাই তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, "ইস্!"

কানাই খুব জোর দিয়া মুঠো পাকাইয়া কহিল "হ্যাঁ—বলেছে।"

"কে?"

"বড়-মা।"

"কি বলেছে?"

"বলেছে যে ভালো করে' লেখা-পড়া শিখলে তখন দেবে।"

উৎসুক হইয়া বলাই জিজ্ঞাসা করিল, "বড়-মাব ফুল তুল্‌তে পার্‌বে? পূজোর ঘরে যেতে পাবে?"

কানাই দুই হাতে তালি দিয়া গৌরবে মুখ-চোখ টানিয়া কহিল, "হ্যাঁ—তাও বলেছে। রান্নাঘরে ঢুক্‌তে না দিক্, পূজোর ফুল তুল্‌তে পার্‌লেই ত হয়। মিত্তিরদের বাগানে জবা, আর চৌধুরীদের পুকুরের পদ্ম, আমি রোজ-রোজ তুলে'-তুলে' ফেলে' দিই!"

কানাইলালের এই বাক্যচ্ছটার মধ্যে বলাই যখন ভবিষ্যৎ সত্যের জাগ্রৎ মূর্ত্তিটি সীমার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়া আনিতেছিল তখন তাহার মন সহানুভূতিতে তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু সে অর্দ্ধেক দেখিতে-দেখিতে যে ছবির বইখানা ফেলিয়া আসিয়াছিল তাহারই কথা বার-বার মনে পড়ার ব্যস্ততায় সে পিছন ফিরিয়া দুই পা অগ্রসর হইল। কানাই কহিল, "আর একটা কথা শোন্!"

বলাই ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "কি?"

"আচ্ছা, তখন বড়বাবু বোধ হয় আট্‌কাতে পার্‌বে না?"

কানাই তাহার উদ্বিগ্ন নেত্র-দু'টি বলাইএর মুখের উপর ন্যস্ত করিল।

বলাই কহিল, "বড়-মা বল্‌লে কি কেউ বাধা দিতে পারে?"

কানাইলালের চক্ষু-দু'টি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খাওয়াদাওয়ার

পর দুপুরবেলা কিছু সময় গড়াগড়ি দিয়া কানাইলাল উঠিয়া পড়িতে বসিল। মহেশ্বরী বিছানায় শুইয়াছিলেন। কানাই উৎসাহিত হইয়া কহিল, "বড়-মা, আজকে কিন্তু শিশুশিক্ষার পাঁচ পাতা পড়া ধর্‌তে হবে। আর কাল থেকে দশ পাতা। আচ্ছা, বড়-মা, বোধোদয়খানা একমাসে শেষ কর্‌তে পার্‌ব না?"

মহেশ্বরী হাসিলেন। বালক কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া সহসা যে পড়াশুনায় এতটা মনোযোগী হইয়া উঠিল তাহা মহেশ্বরীর বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি কহিলেন, "অতটা জুলুম করিস্‌নে। রয়ে'-বয়ে' শিখলে বেশী শেখা যায়।"

কানাই আর কথা বলিতে সাহস করিল না। আপন মনে পড়িতে লাগিল। বিকালে বলাই আসিয়া তাহাকে খেলিবার জন্য ডাকিল। কানাই কহিল, "আমি এখন যাবো না।"

বলাই বলিল, "সারাদিনই কি পড়বি?"

কানাই কিছু বিরক্ত হইয়া কহিল, "তুই যা—আমার এখনও দু'পাতা পড়্‌তে বাকী।"

মহেশ্বরী ঘরে ঢুকিলেন। বলিলেন, "হ্যাঁরে, আজ কি তোকে পড়ায় পেয়ে বস্‌ল নাকি? বলাই এসে কখন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে—যা না, খেল্‌গে যা।"

কানাই মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিল, "ওর ত আর আমার মত বেশী বেশী পড়্‌তে হবে না! ওর কি ভাবনা? তাই খেল্‌তে ডাক্‌ছে।"

মহেশ্বরী বালকের অভিপ্রায় বুঝিলেন। তাঁহার প্রতিকথাটি সত্য করিয়া দেখিতে ও ধরিতে বালকের উদ্যোগ ও আয়োজনের অন্ত নাই ভাবিয়া তাঁহার চক্ষু-দু'টি আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "যা যা, খেল্‌গে যা। সারাদিন ব'সে ব'সে পড়্‌লে শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হ'য়ে

যায়। একটা অসুখ ক'রে বস্‌লে তখন পড়্‌বে কে? শরীর যাতে ভালো থাকে লোকে তাই আগে দেখে।"

কানাই অধোবদনে বলাইএর পিছু-পিছু বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে কিছু সময় পড়াশুনা করিবার পর কানাই মিত্রদেব বাগান হইতে কিছু রক্তজবা এবং চৌধুরীদিগের পুষ্করিণী হইতে কিছু পদ্মফুল তুলিয়া আনিয়া রকের উপর সেগুলি একস্থানে সাজাইয়া রাখিল এবং গালে হাত দিয়া তাহার সংগৃহীত বস্তুর উপব একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মহেশ্বরী আঁকৃশি দিয়া তাঁহাদেব অঙ্গনেব পার্শ্বের টগর শিউলী প্রভৃতি দুই-চারিটি বৃক্ষ হইতে যে একঘেয়ে ফুল লইয়া নিত্য পূজায় বসিতেন, কানাইলালের তাহা ভালো লাগিত না। যখন যেখানে যে ভালো ফুলটি দেখিত তখনই সেটি মহেশ্বরীকে আনিয়া দিতে তাহার লোভ জন্মিত। পরিশেষে ফুল তুলিতে যাইয়া হয় তাহার হাত দু'খানা আড়ষ্ট হইয়া পড়িত, কখনও বা তোলা ফুল লইয়া পথে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে-করিতে সে বাড়ী আসিত।

সেদিন কি জানি কি খেয়ালের বশে সে ফুলগুলি সযত্নে তুলিয়া আনিয়া রকের উপর বসিয়াছিল এবং কাহার যেন আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। মহেশ্বরী স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে প্রতিদিনের মতন সাজি ভরিয়া ফুল তুলিয়া লইয়া যখন পূজার ঘরের দিকে আসিতেছিলেন, তখন কানাইলাল ঈষৎ বক্র দৃষ্টিতে এক-একবার তাঁহাকে দেখিতেছিল এবং পরক্ষণে আবার তাহার যত্নলব্ধ সামগ্রীর উপর দৃষ্টি নত করিতেছিল। মহেশ্বরী দূর হইতে তাহা দেখিতে-দেখিতে আসিতেছিলেন। সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পগুলি দেখিয়া আনন্দের বেগে দেবতার চরণে সেইগুলি নিবেদন করিবার জন্য যেন তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। তিনি নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঃ! বেশ ফুলগুলি ত! কোথায় পেলি?"

কানাই উৎসাহিত হইয়া কহিল, "মিত্তিরদের বাগানে আর চৌধুরীদের পুকুরে।"

মহেশ্বরী বিস্ময়ে চক্ষু-দুটি স্থির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুকুরে? কি করে' তুল্‌লি?"

"সাঁতার কেটে।"

"অত বড় পুকুরে সাঁতার কাট্‌তে গেলি? ডুবে' গেলে কে দেখত?"

কানাই একটু হাসিয়া কহিল, "ডুবব কেন? আমি সাঁতার জানিনে?"

"কেন তুল্‌লি?"

সে দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলি গালের মধ্যে পুরিয়া দিয়া হাতখানা জানুর উপরে রাখিয়া ফুলগুলির দিকে দৃষ্টি নত করিল। ততক্ষণে তাহার চক্ষুদু-টি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। মহেশ্বরী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় মিত্তিরদের বাগান—আব কোথায় চৌধুরীদের পুকুর, হঠাৎ এতটা করতে কি গরজ পড়ে' গেল তোর?"

কানাই সেইরূপই বসিয়া রহিল।

মহেশ্বরী ফুলের সাজি লইয়া পূজার ঘরে ঢুকিলেন। এবং বস্ত্র ত্যাগ করিয়া পূজায় বসিলেন। কিন্তু পূজায় মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। রহিয়া-রহিয়া তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, বালক কেন এমন ভুল জায়গায় নৈবেদ্য সাজাইবার বাসনা করিতেছে? তিনি মন্ত্র ভুলিয়া গেলেন। দেবতাকে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বলো দেব! তুমি কাহার দেবতা? আমার—না জগৎসুদ্ধ সবারই? যদি তুমি ভাগাভাগির দেবতা না হও—যদি আমার—তাহার সবারই দেবতা হও, তবে ঐ দরিদ্র বালকের প্রীতি-পুষ্প গ্রহণ করিতে তোমাকে বাধিবে কেন? আমরা সীমানার চৌহদ্দি লইয়া মারামারি কাটাকাটি করি; কিন্তু যিনি অসীম, অনন্ত, যিনি বিশ্বেশ্বর, তাঁকে আমরা ঈশ্বরজ্ঞানে আকারের বেড়াজালে

বন্দী করিতে আমাদের যে সাহস দেখাই—সে সাহস কি তুমিই দিয়েছ নাথ ?” সেদিন মন্দিরের মধ্যে এই সকল দ্বন্দ্বগুলির মীমাংসা লইয়া মহেশ্বরীর অনেকটা সময় কাটিল। তাঁর অশ্রুসিক্তচক্ষে যখন তিনি বাহিরে আসিলেন তখন দেখিলেন বালকটি ফুলগুলি লইয়া তখনও পর্য্যন্ত সেইখানে সেইভাবেই বসিয়া রহিয়াছে।

তাহার মনে চিন্তা বা ইচ্ছা কোনো-কিছুরই একটা স্থিরভাব ছিল না। অথচ কি যেন একটা অনির্দ্দিষ্ট ব্যাকুলতার উপর কম্পনের বেগে সে ভাসিয়া-ভাসিয়া চলিতেছিল। মহেশ্বরী কহিলেন, “চুপ করে’ বসে রয়েছিস্ যে ? নাইতে-খেতে হবে না ?”

মহেশ্বরী চলিয়া গেলে বালক তাহার কষ্ট-চয়িত পুষ্পগুলি ছিঁড়িয়া কুটি-কুটি করিয়া সেইখানে রাখিয়া চলিয়া গেল। তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিতেছিল। অভিমানে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সে বলাইএর সঙ্গে আবার হাসিতে-হাসিতে নাচিতে-নাচিতে স্নান করিতে গেল। সে বালক বই ত নয়। ভিতরের অভিমান, অন্তরের দ্বন্দ্ব যতই তাহাকে আকুল করুক, তাহার শিশুসুলভ হাসি ও আনন্দও ত সমান সত্য ! তাহাকে সে ছাড়ে কি করিয়া ?

আহারাদির পর কানাইলালকে লইয়া শয়ন করিলে মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, “জলে সাঁতার কেটে—আর কষ্ট করে’ ফুল তুলে’ এনেছিলি কেন ?”

কানাই বালিশের দিকে মুখ গুঁজিল, উত্তর দিল না।

মহেশ্বরী কহিলেন, “কথা বল্‌বিনে নাকি আমার সঙ্গে ?”

সে বালিশে মুখ গুঁজিয়াই খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

মহেশ্বরী কহিলেন, “হাস্‌ছিস যে ! বেশ ত ! কথা না বলিস্ আমিও বল্‌ব না।”

কানাই বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া মহেশ্বরীর গাত্রের মাটি তুলিতে তুলিতে কহিল "খেতে দেবার সময় ?"

"শৈলকে দিতে বলে' দেবো।"

"শুয়ে পড়ে' ?"

"শুয়ে পড়ে' আর কি—তুই মুখ ফিরিয়ে শুবি—আমিও শোবো!"

কানাই কহিল, "সে বেশ মজা হবে কিন্তু। আমি কিন্তু তোমাকে যখন চিম্‌টি কাট্‌ব ?"

মহেশ্বরী হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ওমা! সে আবার কি গো! চিম্‌টি কাট্‌বি কেন ?"

কানাই বলিল, "কাট্‌ব না ? তুমি কথা বল্‌বে না—আর আমি চিম্‌টি কাট্‌ব না ?"

মহেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ অস্ত্র আবিষ্কার করেছিস্। এখন যা জিজ্ঞাসা কর্‌লাম তা'র কি ?"

"কি ?"

"ফুল আন্‌লি কেন ?"

"তোমাকে দেখাতে।"

"দেখালি কৈ ? কিছুই ত বল্‌লিনে ?"

"তুমি যে নিজে-নিজে দেখে ফেল্‌লে।"

"তা বেশ করেছিস্। আমি খুব খুসী হয়েছি দেখে'। কিন্তু আর অমন আন্‌বিনে। পুকুরে সাঁতার কেটে—বাবা! শুন্‌লে যে আমার প্রাণ কেঁপে যায়!"

কানাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভাত কি ছোটমাকে দিতে বলে' দেবে ?"

"কেন—দোষ কি ?"

"ছোট মা মেখে দেবে ?"

"মেখে দেবে কেন ? বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত মেখে খাওয়ালে লোকে বলে কি !"

কানাই নীরব হইয়া রহিল।

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথা বল্‌ছিস্‌নে যে ?"

কানাই মৃদুস্বরে কহিল, "আমি ত কথা বন্ধ করিনি—ছোট-মা মেখে দেবে ?"

মহেশ্বরী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "ভাবনা কি—আমিই দেবো।"

সে সজোরে একটা নিশ্বাস ছাড়িল।

ধরিয়া বলাইকে দেখাইতে লাগিল। বলাই কহিল, "হাঁ বড়-মা, অনেক চুলই যে কাঁচা রয়েছে।"

মহেশ্বরী বলিলেন, "পাক ধর্‌লে কি আর বেশী দিন কাঁচা থাকে? ও ত পেকে গেল!"

বস্তুতঃ মহেশ্বরী যেরূপ বলিতেছেন, তাঁহার বয়স তেমন বেশী হয় নাই। যাহা হউক তাঁহার বাক্যে কানাইলাল অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িল। সমস্ত দিনটা সে অস্বস্তিতে কাটাইল। পড়াশুনায়ও তেমন মন দিতে পারিল না। রাত্রিকালে মহেশ্বরী বই লইয়া যতগুলি প্রশ্ন করিলেন, অধিকাংশেরই সে ভুল উত্তর করিল। মহেশ্বরী সে-সকল বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে যাইয়া শয়ন করিতে বলিলেন। সে শুইলে কিছুক্ষণ পরে আলো নিবাইয়া তিনিও আসিয়া শয়ন করিলেন। কতকক্ষণ গেল—কানাইলাল ঘুমাইল না। মনের দুশ্চিন্তা কিছুতেই সে দূর করিতে পারিতেছিল না। কেবলই এ-পাশ-ও-পাশ উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল। মহেশ্বরী কহিলেন, "হয়েছে কি আজ? ঘুমোবি নে?"

সে চুপ করিয়া শুইল। কিছুক্ষণ বাদে সে মহেশ্বরীর বুকের উপর হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "বড়-মা!"

"কেন?"

"চুল পাক্‌লে সত্যিই কি মানুষ মরে?"

"মরে বৈকি!"

"ও-বাড়ীর ভোলা ত কত ছোট, সে মরে গেল কেন?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সে অল্প-স্বল্প হঠাৎ যায়। চুল পাক্‌লে—দাঁত পড়্‌লে—যাবার সময় হয়, তখন আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না।"

কম্পিত-কণ্ঠে কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "একজনা ম'লে আর একজনা যদি না থাক্‌তে পারে?"

কানাইকে কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া আদরে ভরাইয়া দিয়া মহেশ্বরী বলিলেন, "না থাক্‌তে পার্‌লে চল্‌বে কেন? যাওয়া আর থাকা নিয়েই ত সংসার চল্‌ছে। কাকেও আস্‌তে হবে—থাক্‌তে হবে, কা'কেও যেতে হবে।"

মিষ্টস্বরে কানাই বলিল, "আচ্ছা, দু'জনা একসঙ্গে গেলে হয় না?"

মহেশ্ববী তাহাকে চুম্বনে ছাইয়া দিলেন। বলিলেন, "ছিঃ! অমন মনে কর্‌তে নেই। আমি আজই কি চলে' যাচ্ছি? তোমবা বড়-সড় হবে—ঘব-সংসাব কর্‌বে—তবে না যাবো।"

তার পব কানাইলাল নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু সে রাত্রে সে দুইতিনবাব দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ঘুমেব ঘোরে মহেশ্ববীকে জড়াইয়া-জড়াইয়া ধবিল।

কানাইলালেব পুঞ্জীভূত বেদনার মাঝখানে যেন অমৃতেব সন্ধান দিতে অকলঙ্ক মাতৃস্নেহ লইয়া একমাত্র মহেশ্ববীই তাহাব সম্মুখে আসিযা দাঁড়াইয়াছিলেন। মহেশ্ববী যে বেষ্টনে নিবাশ্রয় বালককে বক্ষোলগ্ন করিতে চাহিতেছিলেন, সংসাবেব পাবিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্য দিয়া সে গণ্ডী গড়িয়া তোলা মন্থবগতিতে হইলেও নিশ্চিত ছিল। কানাইলালেব দুর্ব্যবহারেব বেলা মহেশ্ববীর শাসন-নীতিব মধ্যেও নূপুরধ্বনিব মিষ্টতার মত এমন একটি সূক্ষ্ম আকর্ষণেব ছন্দ বাজিয়া উঠিত, যাহা বালক হইলেও বাছিয়া লইতে এবং উপলব্ধি কবিতে কানাইলালেব পক্ষে অসাধ্য হইত না। তাহাব বিপ্লবময় শিশুজীবনে যখন এক একটা দুর্ঘটনা জোঁকেব মত তাহাকে জড়াইয়া ধবিত তখন সে বুঝিত যে, তাহার মহেশ্বরী-মা ভিন্ন আর কেহ তাহাকে ছাড়াইয়া দিতে পাবিবেন না। মহেশ্বরীর কাছছাড়া হইয়া খেলাধূলা কবিবাব সময়ও সে যেন সেই বিচিত্র মায়ার রাজ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত। তাহার সেই মহেশ্বরী-মা সত্যসত্যই যখন এক-একদিন

পীড়িতা হইয়া শয্যাশায়ী হইতেন, তখন তাহার আহার-নিদ্রা, পড়া-শুনা, খেলা-ধূলা সকলই বন্ধ হইয়া যাইত। মহেশ্বরী তাঁহার শিয়রের কাছে অনুক্ষণ তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিতেন, "একটু চলাফেরা কর্। হাত-পা আড়ষ্ট হ'য়ে গেল যে!"

সে কথা বলিত না, সেইরূপই বসিয়া থাকিত।

তিনি গায়ের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকিলে সে কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিত, "বড়-মা, বাতাস কর্‌ব?"

মহেশ্বরী বলিতেন, "কর্।"

পাখা টানিতে-টানিতে তাহার হাতে ব্যথা হইয়া যাইত, তবুও সে হাতের পাখা নামাইত না। মহেশ্বরীর অনুযোগও সে শুনিত না। তাহার মন-প্রাণ কেবলই সন্ধান করিয়া ফিবিত,—কোন্ ডাক্তার আসিলে—কি ঔষধ খাইলে তাহার বড়-মা শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে পারিবেন। শৈল আসিয়া বলিতেন, "কানাই, বাবা, মা ত এখন ঘুমুচ্ছেন, এখন একটু বেড়িয়ে এস।" কানাইলালের মনের মধ্যে মহেশ্বরীর সেই পাকাচুলের কাহিনী ঠেলিয়া-ঠেলিয়া উঠিত—সে যাইতে পারিত না। কেবলি ভয় হইত বুঝি বা মা তাহার অসাক্ষাতে ফাঁকি দিয়া পলাইবেন। মহেশ্বরী সুস্থ হইয়া উঠিলে তাহার অন্তরের বিপ্লব থামিত। সে পড়া-শুনা, খেলা-ধূলায় মন দিতে পারিত। এইরূপে যেন মাতৃ-হৃদয়ের বাদ্যধ্বনি—সন্তান-হৃদয়ের সুমধুর সঙ্গীতের সহিত একস্থানে আসিয়া সম্মিলিত হইতেছিল।

এক দিন সুখেন্দু হাসিতে-হাসিতে আসিয়া জননীকে কহিলেন, "মা, কানাই বালক হ'লেও ওর উপর আমার আড়ি-ভাব আসে।"

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"ও যেন মাতৃ-স্নেহ পেতে আমার দিক্‌কার সমস্ত অন্ধিসন্ধিগুলিই বন্ধ করে' দিচ্ছে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "কেন ?"

"তোমার অসুখের বেলা ও যেন আমাকে অত্যন্ত খাটো ক'রে দেয়।"

"কিসে খাটো করে ?"

সুখেন্দু বলিলেন, "তোমার প্রতি যেরূপ একান্ত সেবা নিয়ে ও গভীর দৃষ্টি দিয়ে বসে' থাকে, তা'তে আমার সেবা-বৃত্তিগুলো সব নেমে প'ড়ে ঠেলে উঠ্‌তে জোর পায় না।"

মহেশ্বরী হাসিয়া কহিলেন, "ছেলেকে ফেলে পালিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা করিস্—তাই ত খাটো করে।"

সুখেন্দু ভালো বুঝিতে না পারিয়া জননীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মহেশ্বরী কহিলেন, "ওকে যেদিন শৈলকে দিয়েছিলাম, সেই দিন তোমাদের বোঝা উচিত ছিল,—বলাই ও কানাইএর মধ্যে কোন ইতর-বিশেষ নেই। সে কথা তোমরা ভাবতে পারো না, তাই ত ও আমাকে অমন জোঁকের মতন কাম্‌ড়ে ধরে। কাউকে ত আশ্রয় করে' বাঁচতে হবে।"

সুখেন্দু লজ্জিত হইলেন। বলিলেন, "যতটা পারি তা কি আর করিনে !"

মহেশ্বরী কহিলেন, "করো। কিন্তু ওর ত একটি দায় না। পেটের দায়—স্নেহের দায়—সংসারে দাঁড়ানোর দায়। এতগুলি দায় ওর—তা বোঝো না।"

সুখেন্দু কহিলেন, "তা কি আর বুঝিনে, মা ?"

মহেশ্বরী বলিলেন, "বোঝো—কাঙাল ব'লেই বোঝো। কিন্তু এতগুলি তোড়জোড় দর্‌কার যার, তা'কে কি দিতে হয় বোঝো না।"

রিয়া বেড়াইত ৷ার তা কি ও পাবে না ?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তোমরা দরকারগুলো একটু আল্‌গা-রকমে বোঝ। নিরাশ্রয় দেখ্‌লে টাকার দরকার বোঝ—তা'কে টাকা-পয়সা দাও—তা'তে তার ব্যথা যায় না।"

"কেন ?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সংসারে যার মা নেই, তার মায়ের দর্‌কার, যার বাপ নেই তার বাপের—যার ভাই নেই তার ভায়ের দরকার। তোমরা ভুল বোঝো—আর ভুল দাও, তা'তে ব্যথা জুড়োয় না।"

মহেশ্বরীর চরণ দু'খানির প্রতি সুখেন্দুর অশ্রু-আর্দ্র চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া স্থির হইল। তিনি কহিলেন, "তোমাকে মা পেয়েছি, কিন্তু আমার এম্‌নিই কপাল যে, আজিও ঐ আধার থেকে কোন উপকরণই সংগ্রহ ও সঞ্চয় কর্‌তে পারিনি।"

মহেশ্বরী হাসিলেন। কহিলেন, "নিজের পুঁজিপাটা নিজের কাছেই রয়েছে। নিজের ভিতরে ভিতরে শিশুর ছদ্মবেশে যে-সত্য গুপ্তভাবে থাকে, তা'কে যতটা প্রকাশ কর্‌তে পার্‌বে, ততটা বড় হবে।"

মাতার সরস বাক্যগুলি সুখেন্দু ক্ষণিকের জন্য আপনার অনুভূতির কাছে জাজ্বল্যমান করিয়া তুলিতে পারিলেন।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর শান্তি দুই-তিন-বার শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিয়াছিল। এমন সময় তাহার মধ্যে যেন একটা ভাঙা-গড়া পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। সে হঠাৎ বড় হইয়া উঠিল। শিশু-জীবন হইতে নারী-জীবনে আসিয়া দাঁড়াইল। সে এখন আর—কানাই ও বলাইএর সঙ্গে বসিয়া খেলা-ঘরে খেলা করিত না। সময়-সময় তাহাদের লইয়া হাসি-বিদ্রূপ, গল্প-গুজব করিত। বাকি সময়টা শরীর লইয়া থাকিত; ঝামা দিয়া পায়ের গোড়ালি ঘষিত; সাবান দিয়া গা ধুইত—মুখ মাজিত; ঘটি-ঘটি জল দিয়া চুল ভিজাইত—গামছায় মোড়ন দিয়া সিঁথি কাটিত—পাতা কাটিত, ভাঙিত—কাটিত—আবার ভাঙিত, আবার কাটিত; পায়ে আল্‌তা পরিত—গণ্ডে ছোপ ধরাইত—ওষ্ঠযুগল রঞ্জিত করিত। বিনাইয়া বিনাইয়া বেণী রচনা করিত—আয়না ধরিত—দেখিত—মিটিমিটি হাসিত। চরণের গতিতে একটা ভঙ্গিমা দিত; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্য বেশ-ভূষার উপর লক্ষ্য রাখিত—সাবধান হইত। এই-সকল বিলাস-প্রসাধনে তাহার বাকী সময়টা ব্যয়িত হইত। এইরূপে শৈশবের গতিবিধি ভাঙিয়া-চুরিয়া তাহাকে জীবনের আর এক বিচিত্র পথে লইয়া চলিয়াছিল। কানাই ও বলাই হাঁ করিয়া বসিয়া-বসিয়া এইসকল দেখিত। শান্তি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিলেও তাহার স্বভাব অত্যন্ত মিষ্ট ছিল। তাহার অনাবিল স্নেহ বালকদিগকে সর্ব্বদা ছুঁইয়া যাইত।

তখন মাঘ মাস। শীতটা এদিকে হাল্‌কা চাল চালিয়া মাঘের শেষ ভাগেই বেশী জাঁকিয়া বসিয়াছিল। এই সময় শান্তিকে আবার শ্বশুরালয়

হইতে লইতে আসিল। যেদিন সে যাত্রা করিবে সেদিন কানাইলালের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, শান্তি একদিন তাহার নিকট কুল খাইতে চাহিয়াছিল—আনিয়া দেওয়া হয় নাই। সে আজ চলিয়া যাইবে; কানাইলাল অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। প্রথমতঃ সে মিত্র-পাড়ায় যাইয়া দেখিল যে, গাছের কুলে তখন রং ধরে নাই। তখন সে ঘুরিতে-ঘুরিতে অনেক দূরে মুসলমান-পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় খোঁজ করিতে-করিতে একটি গাছে সে বেশ বড়-বড় কুল দেখিতে পাইল। সে সেই গাছ হইতে অনেকগুলি সুপক্ক কুল সংগ্রহ করিয়া লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এদিকে প্রথম জোয়ারেই শান্তিদের নৌকা ছাড়িবে। নদীতে জোয়ার আরম্ভ হইলে মাঝিরা আসিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। কানাইলালের জন্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন তাহার দেখা পাওয়া গেল না, তখন অগত্যা শান্তিকে যাত্রা করাইয়া নৌকায় উঠাইয়া দেওয়া হইল। তাহার কান্নাকাটি দেখিয়া সুখেন্দু বলাইকেও তাহার সঙ্গে দিলেন। নৌকা ঘাট ত্যাগ করিয়া প্রায় এক মাইল পথ আসিয়াছে, এমন সময় বলাই দেখিতে পাইল, কানাইলাল নদীর তীর বাহিয়া আসিতেছে। সে চীৎকার করিয়া ডাকিল,—"কানাই-দা!"

কানাই সচকিত হইয়া দেখিল, নৌকায় চাপিয়া সুসজ্জিতা শান্তি শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিয়াছে। বলাইও তাহার সঙ্গে চলিয়াছে। নিমেষের মধ্যে তাহার চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিল। সে নৌকার কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"বলা, নৌকোখানা ধর্‌তে বল্।"

নৌকার দ্বারপথে শান্তি হাসিমুখখানা বাড়াইল। কানাইলালের ব্যগ্রতা দেখিয়া সে বলাইকে কহিল, "বলা, বল্ না, নৌকাখানা তীরে লাগাক্।"

যে ভদ্রলোকটি শান্তিকে আনিতে গিয়াছিলেন, বলাই তাঁহাকে তাঁহাদের নূতন বধূটির অভিপ্রায় জানাইল। তিনি আদেশ করিলে, মাঝিরা এক স্থানে নৌকাখানি চাপাইয়া নোঙর করিল। তখনও জোয়ারের জল কূল পরিপূর্ণ করে নাই। কানাই চরের কাদায় হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবাইয়া উঠাইয়া হাঁফাইতে-হাঁফাইতে নৌকায় আসিয়া উঠিল। তার পর নৌকার গলইয়ের উপর বসিয়া পা ধুইয়া, শান্তি ও বলাই যে-পর্দ্দার মধ্যে অবস্থান করিতেছিল, তথায় প্রবেশ করিল। এবং তাড়াতাড়ি বন্ধন মুক্ত করিয়া সুপক্ক কুলগুলি শান্তির নিকটে রাখিয়া দিল। কানাইলালের এই মিষ্ট আদরে শান্তির চক্ষু-দু'টি ছল-ছল করিয়া উঠিল! ছোট ভাইটি এত ভালোবাসে! সে কহিল, "একি! কানাই, এসব আন্‌তে গেলে কেন?"

কানাই তাহার দীন নেত্র-দু'টি শান্তির মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কহিল, "তুমি যে সেদিন খেতে চেয়েছিলে।"

শান্তি কহিল, "ও মা! তাই বুঝি মনে করে' রেখেছ, এইজন্যে সকাল থেকে তোমাকে পাওয়া যায়নি। আমরা কতক্ষণ তোমার অপেক্ষা করে' বসেছিলাম। মাঝিরা শুন্‌লে না—তাই এলাম। বলাই যাচ্ছে, তুমিও চলো আমার সঙ্গে—নইলে বড় কষ্ট হবে।"

কানাই শান্তির মানসিক অবস্থা বুঝিতে অনেকটা চেষ্টা করিলেও, সে নিজে যে উত্তর প্রদান করিল, তাহাতে তাহার নিজের অন্তরের এই বিচ্ছেদ-ব্যথার উন্মত্ত বেগও ততটা প্রকাশ করিতে পারিল না—যতটা তাহার অন্তরে-অন্তরে বাজিতেছিল। সে কহিল, "বড়-মাকে না বলে'-ক'য়ে' কি যাওয়া যায়?"

শান্তি কহিল, "এই ত পথ দিয়ে কত লোক যাচ্ছে—এদের দিয়ে একটা খবর পাঠালেই হবে। তিনি কিছু বল্‌বেন না।"

বলাই কহিল, "দাঁড়াও—আমি ব'লে পাঠাচ্ছি। বড়-মা যদি শুনতে পায়, তুমি দিদির সঙ্গে গেছ, তা হ'লে কি আর কিছু বলবে?"

বলাই বাহিরে আলিয়া-নদীর কিনারা-পথ ধরিয়া যাহারা চলিতেছিল, তাহাদেরই ভিতর একজন পরিচিত লোককে ডাকিয়া বলিল, "তুমি জমিদার-বাড়ী গিয়ে আমার বড়-মাকে একটা খবর দিও যে,—কানাই-দা দিদির সঙ্গে চলে' গেছে। এখুনি যাবে ত? নইলে তিনি ব্যস্ত হবেন।"

লোকটি তাহাদের প্রজা। সে কহিল, "আচ্ছা।"

কানাই কিছু গম্ভীর হইয়া বসিল। তাহার অন্তরের যে গূঢ় কথাটি সে গোপন করিতে যাইতেছিল, শান্তি তাহা আল্‌গা করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড়-মাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে ত, কানাই?"

কানাই লজ্জিত হইয়া কহিল, "তা পার্‌ব। কাপড়-চোপড় আন্‌লাম না কিছু—তাই—।"

বলাই কহিল, "সেজন্যে ভাব্‌না কোরো না। আমি ত দু'জোড়া জুতো—চার-পাঁচটা জামা মোজা কাপড় সবই এনেছি।"

কানাই কহিল, "বড়-মা কিছু মনে ভাব্‌বে না?"

শান্তি কহিল, "কি ভাব্‌বেন?"

"এই না-বলে' যাচ্ছি?"

"তার আর কি ভাব্‌বেন তিনি। বাড়ী এসে বোলো, দিদি ছাড়লে না—তাই গেলাম।"

বলাই কহিল, "আমরা ত পাঁচসাত দিনের বেশী থাক্‌ব না। দিদি থাক্‌বে, আমরা চলে' আস্‌ব, বাবা ত তাই বলে' দিয়েছেন।"

কানাই একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া চুপ করিয়া বসিল। বলাই তখন মাঝিকে নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলিল। নৌকা আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে বাড়ীতে মহেশ্বরী তখন পূজায় বসিয়াছিলেন। কিন্তু মন বসিতেছিল না। কানাইকে যে অনেকক্ষণ দেখেন নাই। কোথায় গেল ছেলেটা! তিনি এক-একবার আসন ছাড়িয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "শৈল, কানাই এল ?" শৈল বলিতেছিল, "না, এখনও আসেনি।" তিনি আবার যাইয়া পূজায় বসিতেছিলেন। মহেশ্বরী তাঁহার প্রাণের অব্যক্ত রোদন দেবতার পদে নিবেদন করিয়া, পূজা শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন। শৈলকে ডাকিয়া কহিলেন, "সেই সকালে বেরিয়েছে, এখনও এল না, আর ত নিশ্চিন্ত থাকা যায় না।"

শৈল কহিল, "তাই ত, খাবার বেলা হ'ল, এমন ত কোনো দিন থাকে না। তুমি একবার লোক পাঠাতে বলে' দাও—খোঁজ করে' আসুক।"

মহেশ্বরী সুখেন্দুকে ডাকিয়া সকল কথা বলিলেন। সুখেন্দু তৎক্ষণাৎ চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। তাহারা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত মহেশ্বরী গৃহের দ্বারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

যাহারা অনুসন্ধানের জন্য গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটি লোক, বলাই যাহার দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়াছিল, তাহাকে সঙ্গে লইয়া মহেশ্বরীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটি বলিল, "বাবুরা খবর দিতে বলেছিলেন, আমি খেয়ে দেয়ে আস্‌ব বলে দেরি কর্‌ছিলাম।"

বিরক্তি চাপিয়া মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তা'কে দেখেছ নৌকোয় উঠ্‌তে ?"

"হাঁ মা, আমি কি মিথ্যা কথা বল্‌ছি। আমি সেই ঘাটের কাছেই কাঠ কাট্‌ছিলাম। কানাই বাবু নৌকায় উঠ্‌লে—নৌকা ভাসালে আমি চলে' এসেছি।"

মহেশ্বরীর কতকটা ভাবনা দূর হইল বটে, কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত হইতে

পারিলেন না। বালকের সম্বন্ধে এই যে ভেদ-জ্ঞান সংসারশুদ্ধ লোকের নিকট অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহার ফলে না জানি নূতন স্থানে যাইয়া নূতন নূতন চক্ষুর সম্বন্ধবিহীন দৃষ্টিতে সে কতখানি টানাটানির মধ্যে পড়িয়া যায়! সেখানে এই ব্রহ্ম বস্তুর উপর পদাঘাত করিতে কি সকলের বাধিবে? সঙ্কীর্ণতার অপরিহার্য্য গণ্ডীতে পড়িয়া সে সেখানে কাহাকে আঁকড়িয়া ধরিবে! সে যে নিজের বিরুদ্ধে পর্য্যাপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র লইয়াই পৃথিবীর একপার্শ্বে স্থানগ্রহণ করিয়াছে! সেখানে কে তাহাকে এত আঘাত হইতে বাঁচাইয়া আড়াল করিয়া রাখিবে? মহেশ্বরী ভাবিতে ভাবিতে সেইখানে অসাড় হইয়া গেলেন।

শৈল আসিয়া কহিল, "শান্তির সঙ্গে গেছে তার আর ভাবনা কি? বলাইও ত গেছে? বরং পাঁচসাত দিন পরে লোক ও নৌকা পাঠিয়ে দিলে হবে—দু' ভা'য়ে একসঙ্গে চলে' আস্‌বে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সে কথা ভাব্‌ছিনে। ভাবছি—এরকম চুক্তি-পত্তর বিধাতা তার হাতে তুলে' দিয়েছেন—না মানুষে দিয়েছে? শান্তির বিয়ের কথা যে এখনও গাঁথা রয়েছে!"

শৈল কহিল, "তা সেখানে কি আর সে অযত্নে থাক্‌বে? সে কি ভাবে থাকে—শান্তি, বলা এরা সব জানে না?"

"তাদের জানা-জানিতে কিছু আস্‌বে-যাবে না—আমিই ঠাঁই পাই না—তাবা ত শিশু! এ দেশটা শুধু ছোঁয়া-খাওয়ার দ্বন্দ্ব নিয়েই চলেছে! তারা বুঝে' দেখে না যে—কে কা'র সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে। আত্মারূপে অন্তর্যামী রূপে আমার জীবনে যাঁব বিকাশ—অন্যের জীবনেও তাঁ'রই বিকাশ—এতে কি দ্বন্দ্ব করা চলে?"

শৈল কহিল, "পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত সংস্কার নিয়েই লোকে করে।"

"কিন্তু এমন রেখা টেনে সীমা চিহ্নিত করে কেন? তাঁ'রা যে রেখা

টানে, সেই রেখার মধ্যে এক এক স্থানে যে-কদর্য্যতা জোট পাকিয়ে রয়েছে, তা' দেখতে তা'রা অন্ধ হয়। অথচ রেখার বাহিরে যে মহৎ তাকে তা'রা ঘৃণা করে। এরূপ ভুল সংস্কারের অধীন হ'য়ে দেশটা কি চিরদিনই চল্‌বে? আর আপনার জাতিটার গা প্রাণপণে চাটবে?"

শৈল কহিল, "যাক্ গে, সে সব ভেবে আর কি করবে?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "ভাবছি—সেখানে তার খেতে শুতে পদে-পদেই বাধবে। এমন দরদের জন সে পাবে না সেখানে, যে তা'র দিকে ফিরে' চাইবে।. বালকের অন্তরেও এমন একটা কিছু আছে, যা বাইরে অত্যন্ত অস্পষ্ট, কিন্তু ভিতরে খুবই সত্য। তার সেই মৌন নীরবতাই তার প্রাণের মাঝে বর্ষণ নামিয়ে দেবে।"

শৈল কহিল, "তোমার এই একটা দোষ যে, এক একটা অসম্ভব ভাবনা টেনে এনে নিজেকে অস্থির করে' তোলো।"

মহেশ্বরী একটু হাসিলেন। কহিলেন, "অসম্ভব কিছু ভাবিনে। যা ভাবি—না ভেবেও পারিনে। একটা হৈ চৈ নিয়েই যেন তার জীবনটা গড়ে' উঠেছে। আরও দুঃখ এই যে, সে মার খায়—অথচ জানে না কেন মার খায়!"

মহেশ্বরীর অন্তর এইরূপে অশান্ত হইয়া উঠিল। রাত্রিকালে শূন্য বিছানায় শয়ন করিয়া কানাইলালের অভাবে মন স্থির করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। কানাইলালকে তিনি যে শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছিলেন, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তিনি যেন সেই শৃঙ্খল টানিয়া-টানিয়া যব বোঝাই করিতে লাগিলেন। কিন্তু শৃঙ্খলেরও শেষ হইল না, তাঁহাব প্রার্থিত বস্তুটিরও নাগাল পাইলেন না। ভোর রাত্রে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আবার তখনি-তখনি জাগিয়া উঠিলেন।

স্বপ্নে-জাগরণে কানাইলালের চিন্তা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া ছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নৌকা ঘাটে ভিড়িলে, যে ভদ্রলোকটি সঙ্গে ছিলেন, তিনি সংবাদ দিবার জন্য ডাঙায় গেলেন। কিছুক্ষণ পরে লোক-লস্করের সঙ্গে সমারোহ করিয়া পাল্কী-বেহারা আসিল। ইতিমধ্যে শান্তি, বলাই-এর একপ্রস্ত পরিচ্ছেদ লইয়া কানাইলালকে সাজাইয়াছিল। তাহাকে ত আর যেমন-তেমন বেশে কুটুম্বদের সাম্‌নে বাহির করা চলে না! শান্তি যাইয়া পাল্কীতে উঠিল। বালকেরা পাল্কীর সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল। তাহাতেই তাহাদের মহা আনন্দ।

কানাই ও বলাই পাল্কীর সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে অন্দরে আসিয়া হাজির হইল। জনৈক স্ত্রীলোক আসিয়া আদর করিয়া শান্তিকে তুলিয়া লইলেন। বলাই ও কানাই তাহাব পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিতেছিল। শান্তিব স্বামী নৃপতি রকের উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাহারা যখন সে-স্থান অতিক্রম করিয়া যায়, তখন হঠাৎ যেন বাধা দিয়া নৃপতি কহিলেন,—

“এই যে কানাই এসেছ, বেশ, তা তুমি বা’র-বাড়ীতে গিয়ে বোসো, বলাই একটু বাদেই যাচ্ছে।”

কানাই তাহার প্রবেশ-পথেই এই অতর্কিত আঘাতে কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে মাথা হেঁট কবিয়া একটু বিষণ্ণ-মুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ক্রমে ধীরে-ধীবে কয়েকটি দ্বার অতিক্রম করিয়া একটি সুবিস্তৃত ঘবে আসিয়া হাজির হইল। সেখানে ফরাসের উপর বসিতেও তাহার একটু দ্বিধা জন্মিল। অলঙ্ঘ্য গিরির মতন যে-ব্যবধানটা তাহার ও ভদ্র সমাজের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে, কেমন করিয়া সে বাধাকে অমান্য

কবিয়া সে অনধিকার প্রবেশ[illegible] করিতে পারে? কঙ্কালের পাশ হইতে সরিয়া আসিয়া সে তাহাবই নিকটবর্ত্তী একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন কবিল।

নৃপতিদেব গৃহের মেয়েরা কৌতূহলী হইয়া শান্তির সঙ্গের বালকটির পবিচয় জিজ্ঞাসা কবিলেন। নৃপতি সংক্ষেপে তাহাব পরিচয় দিলে, বালককে দেখিবাব অভিপ্রায়ে মেয়েবা তাহাকে একবার আনিবাব জন্য নৃপতিকে পাঠাইলেন। নৃপতি তাহাকে সঙ্গে কবিয়া লইয়া বাবান্দাব নীচে উঠানে গিয়া দাঁড়াইলেন। কানাইলাল বব-পাত্রেব মতন কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হইল। সে দেখিল, কতকগুলি ব্যগ্র চক্ষু তাহার মোজা-দুইটি লইয়া যেন হাসাহাসি কবিতেছে। তা ছাড়া ফুস্‌ফাস্—গা-টেপাটিপি, চক্ষুব ভঙ্গিমা, কত কি চলিতেছে। কনাইলালেব শুভ্র কপোলদেশ লজ্জায বক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল,—বোধ হয় বলাই-এর কাপড-চোপড় তাহাব গায়ে তেমন মানায় নাই, কোনোটা ছোটো কোনোটা বড হইয়াছে, নতুবা ইহাবা হাসাহাসি কবিবে কেন? কিন্তু মোজা-জোড়া ত পায়ে ঠিকই হইয়াছে। এটাব প্রতি ইহাবা এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতেছে কেন?

এই অনিন্দ্যসুন্দব শুভ্র হৃদয়টি উপলক্ষ কবিয়া রমণীবা মুখে যে সকৌতুক দুষ্ট হাসিব স্ফূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন, তাহাতে কানাইলালেব চক্ষে তাহাকে যেন জগৎসংসাব হইতে দূবে সবাইয়া দিতেছিল। নৃপতি কহিলেন,—

"কানাই, তুমি যাও—এখন সেইখানে গিয়ে বোসো।"

কানাই সেখানে সেই বেঞ্চেব উপব আসিয়া বসিয়া তাহাব পায়েব মোজা দুইটি আগে তাড়াতাড়ি খুলিয়া পকেটে পুরিল। তার পব উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার অঙ্গের জামা-কাপড়ের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিল;

কোনোটিই ত ছোটো বড় অশোভন হয় নাই। সে আবার উপবেশন করিল। সে বুঝিতে পারিল না যে, কোন্ কাঁটাটি তাহার অঙ্গের কোন্ স্থানে ফুটিয়া ভদ্র সমাজে প্রচলিত এসব বেশ-ভূষাও তাহার পক্ষে কাঁটার বস্ত্র করিয়া তুলিয়াছে!

কিছুক্ষণ পরে একটি ভৃত্য আসিয়া তাহাকে স্নানের জন্য হাতের তেলোয় খানিকটা তৈল ঢালিয়া দিয়া গেল। একটু বাদে বলাইও সুগন্ধি তৈলে অঙ্গ আমোদিত করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কানাইলাল সরিষার তৈলটুকু মাথায় দিয়া বলাইএর সঙ্গে-সঙ্গে স্নান করিতে গেল। উভয় ভ্রাতা স্নান করিয়া আসিলে, বলাই অনায়াসে সহজভাবেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। কানাই বাহিরের ঘরে ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিল। যখন বস্ত্র পাঠাইবার আর কোনো সম্ভাবনাই দেখা গেল না, তখন সে অঙ্গনে নামিয়া পরিহিত বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ মাটির উপর বিছাইয়া দিয়া রৌদ্রে শুকাইতে লাগিল। বলাই সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শুভ্র নূতন বস্ত্র পরিয়া আসিয়া কানাইকে তদবস্থ দেখিয়া যেন কিছু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কহিল,—

"ওকি কানাই-দা, কাপড় পাওনি? দাঁড়াও, দিদির বাক্স থেকে আমার কাপড় একখানা এনে দিচ্ছি।" সে ছুটিয়া দিদির ঘরে চলিয়া গেল।

বলাই ব্যস্ত হইয়া কাপড় আনিয়া দিলে, কানাই তাহা পরিয়া আর্দ্র-বস্ত্রখানি শুকাইতে দিল। ভিতর-বাড়ী হইতে ঝি বলাইকে জলযোগের জন্য ডাকিতে আসিল। কানাই একলাটি সেইখানেই বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে জনৈক ভৃত্য ছোটো একখানি কলার পাতায় করিয়া তাহাকেও জলযোগের জন্য কিছু খাদ্য তথায় আনিয়া দিল।

বলাই-এর জলযোগ শেষ হইলে, তাহাকে সেইখানেই ভাত দেওয়া

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। শান্তি আসিয়া কহিল, "দিদি, আমি এঁটোটা পরিষ্কার করে' গা ধুয়ে আসি, ও থাক, ওকে ডেকো না।"

তাহার ননদ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ—তুমি এখন পাঁচজনকে দেবে-থোবে, তুমি যাবে এখন এই সব ছুঁতে? বলিহারি তোমার বুদ্ধিকে!"

শান্তি কহিল, "তাড়াতাড়ি করে' ডুব দিয়ে এলেই ত হবে।"

"না গো, এখন এসকল ছোঁয়া-ছুঁয়ি লেপালেপি করতে পারবে না।"

শান্তি ভাবিল,—'একটার জায়গায় না হয় পাঁচটা ডুবই দিতাম, তবুও কি শুদ্ধ হ'তে পারতাম না?' কিন্তু সে আর কিছু বলিতে সাহস না করিয়া চলিয়া গেল।

তাহার ননদীর অনুমতিক্রমে চাকরটি গিয়া কানাইলালকে ডাকিয়া আনিল। ননদ ঠাকুরাণী আঙ্গুল নাচাইয়া, মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন, "দেখ দেখি কি করে' গেছ। বামুন-পণ্ডিতের ঘর, এঁটো-কাঁটা কে ছোঁবে বলো ত? পাতাটা ওদিকে ফেলে' দিয়ে এস; এই জল নাও, গোবর নাও, এঁটোটা পেড়ে ফেলো।"

কানাই তাঁহার উপদেশ মত সমস্ত করিল, কিন্তু সহসা নিষ্কৃতি পাইল না। ননদিনী দেখান,—এই যে এখানে এঁটো রয়েছে। সেখানটা পাড়া হইলে, আর এইখানে; এইরূপে কানাইলালেব হস্তে সমস্ত ঢেঁকি-ঘরটা মাজা-ঘষা হইয়া নূতন কলেবর ধারণ করিল। তার পর সে অব্যাহতি পাইল।

বলাই শান্তিকে একাকী পাইয়া কহিল, "দিদি, দেখলে কানাইদাকে নিয়ে এরা কি রকম করছে?"

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া শান্তি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল, "কি করব ভাই? ওকে দেখছি না আনলেই ভালো ছিল।"

বলাই অভিমানের সুরে কহিল, "কেন, বড়-মা পারেন আর এরা পাবে না? তুমিও যেমন—কিছু বল্‌তে পারো না?"

শান্তি কহিল, "আমার কথা কে বা শুন্‌বে! বড়-মা এ সকল শুন্‌লে না জানি কি মনে কর্‌বেন। সঙ্গে একটা লোক নিয়ে নৌকা করে' তোরা বাড়ী চলে' যা।"

কানাই বাহিরের ঘরে আসিয়া সেই বেঞ্চের উপরেই শুইয়া পড়িল। সে ভাবিতে লাগিল,—তাহার উচ্ছিষ্ট তাহার মহেশ্বরী-মা ভিন্ন বোধ হয় আর কেহ ছুঁইতে পারেন না। সে এম্‌নি অস্পৃশ্য হতভাগ্য। কিন্তু তবকারীগুলো একসঙ্গে একাকার করে' না দিলেও ত পারিত! তাহাতে কাহারো মর্য্যাদার ত হানি হইত না। এইরূপে নানা স্থানে নানা সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া একটা এলোমেলো অবোধ্য অভিজ্ঞতা কানাইলালের মনের মাঝে বোঝার মতন জমা হইয়া উঠিতে লাগিল। কেন যে এমন হইতেছে তাহা সে ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না। কিন্তু আঘাত ও অপমান যে নানাদিক্ দিয়া তাহার গায়ে আসিয়া লাগিতেছে, তাহা অনুভব করিতে তাহার দেরী হইল না। রাত্রিকালে শয্যার জন্য কানাইলালকে একটি মাদুর ও একটি বালিশ দেওয়া হইল। সে ভূমিতলে মাদুরটি বিছাইয়া গায়ের র‍্যাপারখানি মুড়িসুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু যতই রাত্রির পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই শীতে তাহাকে কাঁপাইয়া-কাঁপাইয়া আড়ষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল। শেষ রাত্রে সে এমন অবসন্ন হইয়া পড়িল যে, বাহিরে চাকরদের ধূমপানের জন্য যে আগুনের মাল্‌সা রক্ষিত ছিল, সে তথায় আসিয়া তাহাই ক্রোড়ে লইয়া বসিল, এবং র‍্যাপারখানির দুই-তিন জায়গায় দগ্ধ করিয়া তাহাতে শান্তির শ্বশুরালয়ের স্মৃতিচিহ্ন চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়া দিল।

এই বন্ধুহীন নির্ম্মম গৃহ হইতে উড়িয়া পলাইয়া মহেশ্বরীর অঙ্কে স্থান

লইবার জন্য তাহার প্রাণ অনুক্ষণ আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। পাছে শান্তি কিছু মনে করে, এ-জন্য সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। নীরবে সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করিতে লাগিল, সমস্ত অপমান গায়ে মাখিয়া লইল। যেন এমনি আচরণ চিরকাল সকলেই তাহার সহিত করিয়া আসিয়াছে।

ইতিমধ্যে মহেশ্বরী তাহাদের আনিবার জন্য লোক ও নৌকা পাঠাইলেন।

কানাই নৌকায় আসিয়া মুক্তি পাইল, বলাই লজ্জার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। কেবল শান্তির মনটা, কানাইলাল যে-বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া গেল, তাহা ভাবিয়া অশান্ত হইয়া উঠিল।

বালকেরা বাড়ী পৌঁছিলে, মহেশ্বরী কানাইকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদির বাড়ী আদর-যত্ন কেমন ?"

দুঃখের কথা চাপা দিয়া কানাই কহিল, "বেশ, ভালো।"

মহেশ্বরী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাত মেখে খাওয়াত কে ? তুই ত নিজে মেখে খেতেও জানিস্‌নে। এম্‌নি পণ্ডিত।"

কানাই কহিল, "আমি বুঝি আর মেখে জুকে খেতে পারিনে ? বড়-মা, ভালো কথা, প্রথম দিন যা মজা হয়েছিল।"

"কি মজা হ'ল আবার ?"

"খেতে বসে' আমার মনে ছিল না যে, তুমি নেই। খেয়ে'-দেয়ে পাতা রেখে' চলে' গেলাম। তার পর আবার আমার ডাক পড়্‌ল। কাকগুলো এমন দুষ্টু, আমার সেই এঁটো-কাঁটা সকল ঘর ছড়াছড়ি করে' ফেল্‌লে। দিদির ননদ এসে,—এখানে এঁটো—সেখানে এঁটো—এই রকম করে' সমস্ত ঘরটাই আমাকে দিয়ে নিকিয়ে নিলে। আচ্ছা, বড় মা, তুমি ছাড়া আর কেউ আমার এঁটো ছুঁতে পারে না ?"

মহেশ্বরী বুঝিলেন, বালক তাহার দিদির বাড়ীতে গিয়া, তাহার জীবন-চরিতের আরো কয়েকটি পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে। তবু চোখের জল না ফেলিয়া যেন কৌতুকের ছলেই তিনি বলিলেন, "পার্‌বে না কেন? কাজ এড়াতে পার্‌লে কি কেউ কর্‌তে চায়?"

কানাই কিছু বলিল না। মহেশ্বরীও আর-কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

রাত্রিকালে শয়ন করিয়া মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখানে শুতিস কোথায়?"

"মাটিতে—মাদুর পেতে। সে আর-এক মজা—সে আমি বল্‌ব না।"

"কেন?"

"হ্যাঁ—তুমি আবার যদি দিদির কাছে বলে' দাও।"

"বারণ করিস ত বল্‌ব কেন?"

কানাই মাতার গলা জড়াইয়া বলিল, "বল্‌বে না ত—ঠিক বল্‌ছ?"

"না।"

কানাই কহিল, "শুধু র‍্যাপার গায়ে দিয়ে কি শীত যায়? কন্‌কনে শীতে কুণ্ডলী পাকিয়ে যখন আমার হাতে-পায়ে এক হ'য়ে যেত, তখন সেই যে জোয়ানের গল্প বল্‌তে—শক্তি দেখানোর জন্য জোয়ানটা খালি-গায়ে বাহিরে শীতে শুয়ে সেই যে—

'প্রথম রাত্রিতে প্রভু ঢেঁকি-অবতার,
দ্বিতীয় রাত্রিতে প্রভু ধনুকে টঙ্কার,
তৃতীয় রাত্রিতে প্রভু কুক্কুর-কুণ্ডলী,
চতুর্থ রাত্রিতে প্রভু বেনের পুঁটুলী।'

সেই গল্পটা আমার মনে পড়ে' যেত—আর হাসি পেত।"

এমন নিষ্ঠুর হাসির গল্প শুনিয়া মহেশ্বরীর প্রাণ বেদনায় আন্‌চান্‌ করিয়া উঠিল। ইহার পর কোন কথা তাঁহার মুখে আসিতেছিল

না। তিনি বলিলেন, "এখন ঘুমো—আমার শরীরটে আজ ভালো নেই।"

মহেশ্বরী কানাইলালের নিকট শান্তির বাড়ী-সম্বন্ধে আর কোনো দিন কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। তাঁহার সাহসে কুলায় নাই। না জানি, আরো কত বেদনার, কত দুঃখ-অপমানের ইতিহাস ইহার আড়ালে লুকাইয়া আছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহেশ্বরীর ক্রোড়ে কানাইলাল দিন-দিন বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস ইত্যাদির বহু সারবান্ গ্রন্থ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি অনেক-গুলি পুস্তকই সে পড়িয়া ফেলিল। মহেশ্বরীর সৎশিক্ষার প্রভাবে তাহার চরিত্র দিন-দিন নানা গুণে পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলবান্ হইয়া উঠিতে লাগিল। কানাইলালকে সকল দিক্ দিয়া মানুষের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টার তাঁর অন্ত ছিল না। পূজার ঘরে যাওয়া, রান্না-ঘরে যাওয়া ইত্যাদি যে-সকল প্রশ্ন লইয়া কানাই মহেশ্বরীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত, সংসারের অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাতে ও বহু গভীর বেদনার চাপে সে-সকল ক্রমে-ক্রমে তাহার হৃদয়ের তলদেশে যাইয়া ঢাকা পড়িতেছিল। তাহার উপর সে দেখিত, তাহার একখানি বই শেষ হইলেই মহেশ্বরী আর-একখানি আনিয়া জোগাইতেছেন। সুতরাং তাহার পড়াশুনা শেষ না হইলে যে সে-সব অধিকার সে পাইবে না, এইরূপই সে বুঝিত। মহেশ্বরী অনেককাল আগে এমন কথাই তাহাকে বলিয়াছিলেন।

মহেশ্বরী অনেক দিন হইতে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর যাইবার ইচ্ছা করিতে-ছিলেন। শেষ বয়সে এই তীর্থদর্শনের একটা প্রবল বাসনা তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু সুখেন্দুর সময় হইয়া উঠে না বলিয়া যাওয়া হয় না। এবার তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার ত জমিদারির কাজকর্ম্ম কোনো

দিনই মিটুবে না। তোমার আশায় বুড়ো বয়সে আর কতকাল ব'সে থাকৃব? বরং তারিণী-মামাকে খবর দিই, তিনি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন।"

সুখেন্দু কহিলেন, "দেখ—তিনি নিয়ে যেতে পারেন ত আমার কোনো আপত্তি নেই।"

এই তারিণী চক্রবর্ত্তী দূর সম্পর্কে মহেশ্বরীর মাতুল। তিনি সংবাদ পাইবামাত্র তাড়াতাড়ি আসিয়া হাজির হইলেন। তারিণীর আকার বেঁটে, বর্ণ কাল, চক্ষু ছুটি কোটর-প্রবিষ্ট, বক্ষঃস্থল সঙ্কীর্ণ, কিন্তু ভুঁড়িটা অপরিমিত। বয়সে ইনি মহেশ্বরীর অপেক্ষা বোধ হয় দুই-এক বৎসরের বড় হইবেন।

তারিণী উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, গরীবকে অসময়ে স্মরণ করেছ কেন? জয় রাধে, গোবিন্দ।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "মামা, অনেক দিনের ইচ্ছা সেতুবন্ধ-রামেশ্বর দর্শন করা। তেমন কোনো লোকও পাইনে—সুযোগও হয়ে উঠে না। এবার মনে হ'ল, মামা থাকৃতে এত ভেবে মর্‌ছি কেন? তাই তোমাকে সংবাদ দেওয়া।"

তারিণী দন্ত-বিকাশ করিয়া কহিলেন,"বেশ ত! বেশ ত! আমরাও আশা করি যে, মায়ের দ্বারা আমাদের পুণ্য সঞ্চয় হবে। কবে যাচ্ছ? জয় রা—।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "বয়স হয়েছে, হাতে ত অনেক সময় নেই, আর দেরী ক'রে কাজ কি? একটা দিন দে'খে চলো বেরিয়ে পড়া যাক্।"

মহেশ্বরী ঠিক করিয়াছিলেন কানাইলালকে ফেলিয়া যাইবেন না। সেই দেখাদেখি বলাইও নাছোড়বান্দা হইল। সেও যাইবার জন্য ধরিয়া বসিল। বালক-ছুটি তখন সবে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল। তারিণী ইহাদের যাওয়ার কথা শুনিয়া মনে-মনে বিরক্ত হইলেন। এইসব বাবু-ভায়াদের ফাইফরমাইস জোগাইতেই যে আর পাঁচজনা লোকের দর্‌কার।

কে এত করিবে ? তারিণী একসময় দূরে কানাইলালকে দেখাইয়া একজন কর্ম্মচারীর নিকট তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

কর্ম্মচারীটি কহিল, "ও ছেলেটি বড়-মার পালিত পুত্র।"

তারিণী দাঁত সিঁটকাইয়া কহিলেন, "পালিত পুত্র! খুব পরিচয় দিলে যা হোক্। বলি, রত্নটি কোথায় ছিল—কেন এল—কোন্ বংশধর—সে-সব খবর কিছু রাখো ?"

"হাঁ, তা কিছু-কিছু রাখি বই কি! ও একটি বাগ্দীর ছেলে। মা, বাপ, আত্মীয়স্বজন—কেউ নেই, তাই বড়-মা এনে পালন কর্‌ছেন।"

তারিণী জানুতে এক চাপড় মারিয়া কহিলেন, "এই দেখ ত বাপধন! কেমন সোজা হ'য়ে এল। তা' যাচ্ছেন তীর্থ কর্‌তে—ঐ অজাতটাকে সঙ্গে নিয়ে ? ছুঁয়ে লেপে একাকার ক'রে দেবে যে! জয় রা—রাধে গোবিন্।"

কর্ম্মচারী জিভ কাটিয়া কহিল, "আপনি অমন বল্‌বেন না। বড়-মা ওকে ছেলের চেয়েও বেশী দেখেন—শুন্‌লে চ'টে যাবেন। রক্ষা রাখ্‌বেন না।"

তারিণী ঝাঁকুনি দিয়া কহিলেন, "তবেই গেছি আর-কি ? আমাকে যে আড়ষ্ট ক'রে তুল্‌লে দেখ্‌তে পাচ্ছি। চ'টে যান্, ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবেন। আমি কি কারও প্রত্যাশী নাকি ? ছোঁড়া বলে কি! জয় রাধে—গো—।"

কর্ম্মচারী ভীতভাবে কহিল, "আপনি যেরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন, তা'তে আপনার যে ওঁদের সঙ্গে যাওয়া হবে—বোধ হয় না।"

তারিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"চোপ্ রহ অপবুদ্ধি কোথাকার! তারিণী চক্কোত্তির টাকা নেই—কেমন ? তাই কাঙাল সেজে তীর্থ ভিক্ষে কর্‌তে তোমার মা-ঠাক্‌রুণের দোরে এসে পড়েছে—নয় ?"

কর্ম্মচারীটি এই বদ্‌রাগী লোকটিকে দেখিয়া বেশ একটু আমোদ পাইল। বলিল, "তবে আর ভাবনা কি? সেতুবন্ধ যে এ যাত্রা দেখা হবে, সে আর মিথ্যে বলা যাচ্ছে না।"

তারিণী হাত নাচাইয়া কহিল, "আহা! কি আপ্যায়িতই কর্‌লেন! গঙ্গার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রটা মিশ্‌ছে ব'লে তা'র খ্যাতিটাও চ'লে গেছে—কেমন? তারিণী চক্কোত্তি তীর্থধর্ম্ম করে না, গরু বাছুর ঠেঙিয়ে বেড়ায়, মহাপ্রভুর বুঝি তাই ধারণা? জয় রা—! তুমি এখানে কোন্ পদে কাজ কর্‌ছ হে?"

"আমি এ সর্‌কারের মুন্‌সী।"

"তাই বলো—নইলে এমন মুন্‌সীয়ানা বুদ্ধি পাবে কোথায়? জয় রাধে—গোবি—।"

এই সময় মহেশ্বরী তারিণীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তারিণী উপস্থিত হইলে মহেশ্বরী বলিলেন, "মামা, পাঁজি দেখ্‌লাম—কাল দিনটা ভাল আছে। তোমাকে কি আবার বাড়ী-ঘর হ'য়ে আস্‌তে হবে?"

"না মা, বাড়ী-ঘরে আর যা'ব কি কর্‌তে। কাপড়-চোপড় দু'একখানা সঙ্গে নেওয়া, সে তোমার এখান থেকেও হ'তে পারে। এইটুকুর জন্তে অতখানি আবার কেন যাওয়া?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সে হবে, সেজন্তে ভাবনা নেই। তা হ'লে কাল যাওয়াই স্থির?"

"স্থির বই কি; শুভ কার্য্যে বিলম্ব কর্‌তে আছে? জয় রা—শুন্‌লাম, একটা বাগ্দীর ছেলেকে নাকি সঙ্গে নিচ্ছ?"

মহেশ্বরীর মাতৃ-হৃদয় এই আকস্মিক নিষ্ঠুর আঘাতে পীড়িত হইয়া উঠিল। এই যে জাতির গন্ধটা কানাইলালকে জড়াইয়া দুঃসাধ্য কৌশলে নিরর্থক একটা দুঃখের আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, ইহাকে কি কোনো

মতেই সম্বৃত করিতে পারা যায় না? এক মুহূর্ত্তও কি মানুষ ইহা ভুলিয়া যাইবে না? মহেশ্বরী কহিলেন, "হাঁ মামা, সেও যাবে।"

তারিণী কহিল, "কেন, ও ছোঁড়াকে রেখে যাওয়া চলে না?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "যে পাপগুলো দেহের মধ্যে ক'বে নিয়ে যাচ্ছি, তা'র চেয়ে ও আর এমন-কি জঞ্জাল?"

তারিণী বলিল, "পাপগুলো ত সেতুবন্ধে রেখে আস্‌বার জন্যই যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু ছোঁড়া কি শুদ্ধভাবে আমাদেব কাজকর্ম্ম কর্‌তে দেবে? জয় রাধে গোবি—।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "অশুদ্ধও কর্‌তে পার্‌বে না মামা, গঙ্গায় ডুব দেওয়ার পূর্ব্বে রামসীতা দর্শন কর্‌বার আগে অন্তবটা দয়া-ধর্ম্মে মেজে-ঘ'ষে নিতে হয়, নইলে শুধু ডুব দিলে বা দর্শন কর্‌লে মিথ্যা আচারের নামে মুক্তি হয় না। তাই যদি পারো, ওর ছোঁয়া-নেপাতে কিছু এসে যাবে না।"

তারিণী ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "বলো কি? জাতিতে বাগ্দী যে!"

মহেশ্বরী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "মামা বোধ হয় জানো না যে, শঙ্করাচার্য্যও একজন চণ্ডালের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।" তার পর কিছুকাল তাবিণীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা, শ্রীক্ষেত্রে কখনো গিয়েছ?"

তারিণী মুখে একটা বিকট ভঙ্গী আনিয়া কহিল, "তা যাবো কেন? তারিণী খেতে পায় না, ঘরের বা'র হবে কি ক'রে?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "চটো কেন মামা! আমি কি তাই বল্‌ছি? গিয়েছ কি না, তাই জিজ্ঞেস কচ্ছি।"

তারিণী দাঁত মেলিয়া কহিল, "ক ত বা র। মা থাক্‌তে প্রথমে পেটে পূ'রে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই আরম্ভ আর ভূঁয়ে প'ড়ে পা দু'খানা ত তীর্থ ছাড়া থাক্‌তে চায় না।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সেখানে হাড়ি-মুচি শতেক জাত্ একত্র হ'য়ে বাবার প্রসাদ নেয়, বোধ হয় দেখেছ ?"

"কি জানি মা, ও বিট্কেলী ভাবটা আমি বুঝ্তে পারিনে। যেমন বিট্কেল ঠাকুর, তেম্নি বিট্কেল চেহারা, রীতিনীতিও সেইরূপ বিট্কেলী।"

মহেশ্বরী ব্যথিতা হইয়া কহিলেন, "মামা, বুড়ো হয়েছ, ওসকল কথা মুখে এন না। সেখানে যখন ভায়ে-ভায়ে গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে প্রসাদ গ্রহণ করে, তখন ভেদ-জ্ঞান থাকে না। আমরা একই পিতার ভিন্নভিন্ন সন্তান, এ কথা উপলব্ধি কর্বাব অমন বিরাট্ ক্ষেত্র আর কোথাও নেই।"

তারিণী কহিল, "ঠিক বলেছ মা, সে সময় মনের গতিটাই কেমন উল্টে-পাল্টে যায়।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "ওটিই একমাত্র দেবভাব। ঐ ভাব স্থায়ী ক'রে রাখ্তে পারে না ব'লেই ত মনের মধ্যে আবার ছোটোবড় উচ্চ-নীচ, কত কি ভ্রান্ত জ্ঞান আসে যায়। তুমি আমি যাকে ঠে'লে ফে'লে রেখে যেতে চাচ্ছি, মামা, যেখানে যাবো সেখানে সেই তিনি কি তা'কে ঠে'লে রাখ্তে পারেন ?"

মহেশ্বরীর কথা বুঝিয়া দেখিবার জন্য তারিণী ততটা মনোযোগী হইল না। সে কহিল, "তা নেও—তা নেও—তোমার যেমন ইচ্ছা। একটা চাকর-বাকরেরও ত দর্কার। ছোঁড়া থাক্লে পথে-ঘাটে কাজে লাগ্বে। হ'লই বা অজাত।"

তারিণী চলিয়া গেল। মহেশ্বরীর অন্তরে কেমন মেঘের সঞ্চার হইয়া রহিল। যাত্রার সূচনাতেই তাঁহার বুকের ধনকে নিষ্ঠুর সমাজ এমন আঘাত করিতেছে, পথে ও পথশেষে না জানি তাহার অদৃষ্টে আরো কত দুঃখ-ভোগ আছে !

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুখেন্দুর নিবাস খুলনা জেলার কোন এক পল্লীগ্রামে। মহেশ্বরীদের ষ্টীমারে চাপিয়া খুলনায় যাইয়া রেল ধরিতে হইবে। শৈল সকাল-সকাল স্নান করিয়া রান্না করিতে গেল, সকলকে খাইতে দিতে হইবে, ছেলেদের সঙ্গে কিছু জলখাবার দিতে হইবে। মহেশ্বরী ছেলেদের পোষাক-পরিচ্ছদ বাছিয়া লইয়া বাক্স সাজাইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে তারিণী কানাইলালকে একা সম্মুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এস বাবাজী, তুমি ত আমাব সঙ্গী হ'তে চলেছ, আগে থাক্‌তে পরিচয়টা ক'রে নেওয়া যাক্। জয় রা—তোমার নাম কি ?"

"কানাইলাল মজুমদার।"

তারিণী কপাল কুঁচ্‌কাইয়া কহিল, "মজুমদার নাকি ? ঠিক ত ?—. ভট্‌চায্যি নয় ত ?"

কানাই মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল।

তারিণী কহিল, "তুমি ঘরেব ছেলে ঘরে থাক্‌লেই পার্‌তে। নদীতে হাঙর-কুমীর—রেল-ষ্টীমারে চোর-ডাকাত, পথে-ঘাটে বিপদের ছড়াছড়ি, শেষটা মাকে কাঁদিয়ে না বসো।"

কানাই আর সেখানে দাঁড়াইল না। বাড়ীর মধ্যে মহেশ্বরীর নিকটে চলিয়া গেল। মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলাই গেল কোথায় ? ছাখ, তোদের আর কি নিতে হবে না হবে।"

কানাই বলিল, "অত কি নিচ্ছ ?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "পথে-ঘাটে বেশী-বেশী নিতে হয়। সব জায়গায় কাচিয়ে নেওয়ার সুবিধা কপালে জোটে না।"

কানাইলাল বসিয়া-বসিয়া দেখিতে লাগিল। একসময় সে জিজ্ঞাসা করিল, "বড়-মা, তীর্থ কর্‌তে কি মেলাই লোক জমা হয়?"

মহেশ্বরী বলিলেন, "হয় বই কি!"

তারিণী ইতিপূর্ব্বে তাহার প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল, হয়ত তাহারই ফলে তাহার মুখ দিয়া প্রশ্ন বাহির হইল যে—"যদি আমি অত লোকের মধ্যে হারিয়ে যাই?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "বালাই! হারাবি কেন? তুই এক-একটা আজগুবী কথা পাস্ কোথায়?"

সে আর কিছু বলিল না। মনের কথা মনে চাপিয়া রাখিল।

অনন্তর যথা-সময়ে তাঁহারা যাত্রা করিয়া বাহির হইলেন। কোলের ছেলে যতই বড় হউক কোলের ছেলে; তাহাকে ছাড়িতে কষ্ট কাহার না হয়? শৈল অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিল। সে কহিল, "মা, ফাঁকা ক'রে দিয়ে যাচ্ছ, দেখো যেন দেরি কোরো না।"

মহেশ্বরী তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "ভয় কি মা, আমরা সত্বরই চ'লে আস্‌ব।"

সুখেন্দু নিজে থাকিয়া মহেশ্বরীদের ষ্টীমারে তুলিয়া দিলেন। মহেশ্বরী ক্যাবিনে রহিলেন। তারিণীচরণ পাটাতনের উপর শয্যা বিছাইয়া লইয়া তাঁহার বিপুলকায় ভুঁড়িটা তাহার উপর গড়াইয়া দিলেন। এতটুকু পথশ্রমেই তিনি কাতর হইয়াছিলেন। বলাই ও কানাই আসিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল। বালকদের দেহে-মনে সহজে শ্রান্তি আসে না। তাহারা দেখিতে লাগিল, সম্মুখভাগের বহুবিস্তৃত নদীটি তপোবনবাসিনী ঋষিকন্যার মতো নীরবে আপনার মনে স্বভাবের একাগ্র-প্রেরণায় কোন্ সুদূর

লক্ষ্য-পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। কত-কত জলযান তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া, মথিত করিয়া চলিতেছে; সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। তীরে কৃষিক্ষেত্র। ধান্যের শীষগুলির মাথায় দোলা দিয়া খোলা হাওয়া যেন মাঠের বুকে আর-একটি নীল সমুদ্রের ঢেউ তুলিয়াছে। তা'র পশ্চাতে আম জাম কাঁঠাল নারিকেল প্রভৃতি নানা-জাতীয় বৃক্ষ। স্থানে-স্থানে কৃষকগণের আনন্দ-গীতি, বালক-বালিকাগণেব সকৌতুক দৃষ্টি —পক্ষীদিগের পক্ষ চালনা। উল্লসিত হইয়া এই সকল দেখিতে-দেখিতে যখন তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল, চোখ যেন ঘুমে জুড়িয়া আসিতে লাগিল, তখন তাহারা শয্যাব উপব আসিয়া উপবেশন কবিল।

যথাকালে ষ্টীমার-খানি খুলনার ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। কানাই ও বলাই তারিণীচবণকে ডাকিয়া কহিল, "আজ্ঞা মশাই, উঠুন, খুলনায় এসেছি।"

তারিণী অঙ্গমোড়া দিয়া উঠিয়া বসিল। চক্ষু রগ্ড়াইতে রগ্ড়াইতে বলিল, "খুলনায় এল? তা তোরা হাঁ ক'বে দাঁড়িয়ে আছিস্ যে? যত ছেলে-ছোক্বা নিয়ে কাজ কার্বার। একটা কুলী ডাক্ না? না—তাও এই ভুঁড়িটা নিয়ে সংগ্রহ কর্তে হবে?"

কুলী ডাকিতে হইল না। "কুলী চাই—কুলী চাই," মুখে এই কোলাহল লইয়া জলস্রোতের ন্যায় একটা দল আসিয়া তারিণীচরণকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তারিণী বিকটস্বরে কহিল, "চাই বই কি? মোটগুলো কি তারিণীচরণ ঘাড়ে ক'রে নেবেন? তোরা হাঁ ক'রে যে বড় দাঁড়িয়ে আছিস্? মহেশ্বরীকে নিয়ে আয়!"

কানাই ও বলাই যাইয়া মহেশ্বরীকে লইয়া আসিল।

তারিণী বলিল, "কত নিবি বল্—গাড়ীতে তু'লে দিবি।"

কুলীরা মোটগুলো পরীক্ষা করিয়া কহিল, "একটা টাকা বকশিষ দিতে হবে বাবু !"

তারিণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "একটা—টা—কা ? চৌষট্টি পয়সা ? তারিণীচরণকে গণ্ডমুখ্খু পেলি নাকি ? এ বাবা তর্কসিদ্ধান্তের ছেলে, ছোঁ দিয়ে চুনো পুঁটিটে নেবে, তারিণী তেমন জলের মাছ নয় ।"

কানাই কহিল, "আজ্ঞা মশাই, আপনার রাধা-গোবিন্দ নাম ভু'লে গেলেন যে ?"

তারিণী জলন্ত চক্ষু-দুটি তাহার দিকে ফিরাইয়া কহিল, "আস্পর্দ্ধার আর কম্‌তি নেই। বামুনের স্কন্ধে ভর ক'রে বড় বাড় বেড়ে উঠেছিস যে ?"

মহেশ্বরী কানাইলালকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। তারিণীচরণের এই অভদ্র বাক্য সহিষ্ণুতার সহিত শ্রবণ করিয়া তিনি অতিকষ্টে আপনাকে দমন করিয়া রাখিলেন।

তারিণী কহিল, "দু'গণ্ডা পয়সা—বুঝ্‌লি রে ! আট্টা পয়সা পাবি, নে, 'তুলে নে।"

তারিণীচরণের উদারতার পরিচয় পাইয়া কুলীরা একে একে সকলেই প্রস্থান করিল।

তারিণী গজ্‌গজ্‌ করিতে করিতে কহিল, "ভাগ্যে বিধি মাপাননি, তুমি আমি চেষ্টা করলে কি পেতে পারে মা ! যাক্‌গে বেটারা, নে ত বাবা কানাই ! এই বাক্সটা মাথায় তু'লে ! তুমি ভেবো না মা ! আমি ওকে দিয়ে একে একে সবই রেখে আস্‌ছি ।"

তারিণীর এই স্নেহ-বাক্যের মূলে স্বার্থসাধনের এমন জঘন্য লোলুপতা দেখিয়া মহেশ্বরী বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "এই মোট্‌গাঁট—ও কচি ছেলে নিতে পারে ? ডাক না কুলীদের ? যা চায় নেবে ।"

তারিণী গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কহিল, "একেবারে না পারে পাঁচবারে পারবে না ? বলো কি, মা ! যে রক্তটায় ওর ঘাড় শক্ত ক'রে পাঠিয়েছে, তোমার দুধ ঘিয়ে কি তা' কোমল হ'তে পারে ? কি বলিস্ কানাই—পার্‌বিনে ?"

তারিণীচরণের নিষ্ঠুর আঘাতে মহেশ্বরীর অশ্রু-উৎস চক্ষু পর্য্যন্ত আসিল, কিন্তু কে যেন পাথর চাপা দিয়া রাখিল। তিনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কানাইলাল দুই হস্তে বাক্সটির ওজন পরীক্ষা করিয়া কহিল, "কেন মা ! তুমি অমন কর্‌ছ ? এত বেশী ভারি নয়, বেশ নিয়ে যেতে পারা যাবে। আজ্ঞা মশাই ত ঠিক বলেছেন ; বেটারা যা হেঁকে বস্‌বে তাই দিতে হবে ?"

তারিণী কানাইলালের পৃষ্ঠে সশব্দে এক চপেটাঘাত করিয়া কহিল, "একেই বলে ত বাপের বেটা। নীচকুলে জন্মালে কি হয়—সুজন্মা হ'তে ত বাধা নেই। জয় রা—রাধে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "আমি পয়সা বাঁচানোর জন্যে কচিছেলে নিয়ে তীর্থ কর্‌তে আসিনি। আর ওরাও ত মজুরি খেটে খায়—দু'পয়সা পাবে ব'লেই আশা করে।"

তারিণী কহিল, "দু'পয়সা কি মা ! ষোলো আনা—একটা গোটা চাকি চায় যে !"

মহেশ্বরী আঁচলের খুঁট হইতে একটা টাকা বলাইয়ের হাতে দিয়া কহিলেন, "ডেকে আন্ ত, দাদা ! সব লোকজন চ'লে গেল, শেষে কুলী মিল্‌বে না।"

তারিণী বলাইয়ের হাত হইতে ছোঁ মারিয়া টাকাটা তুলিয়া লইল। এবং কুলীদের নিকট যাইয়া আট আনা সাব্যস্ত করিয়া বক্রী আট আনা নিজের পকেটজাত করিল।

তাঁহারা সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় উঠিলেন। গাড়ী ফুলতলা ষ্টেশন অতিক্রম করিলে তারিণী কহিল, "মা! খাবারের হাঁড়িটা কি সরা-চাপা দেওয়াই থাকবে?"

মহেশ্বরী বলিলেন, "বকাবকিতে সে-কথা ভু'লেই গেছি। দাও না মামা! ছেলেদের কিছু দাও, নিজেও কিছু খাও!"

তারিণী রসগোল্লার হাঁড়িটি কাছে টানিয়া আনিয়া তিনখানি থালা বাহির করিল। একটি রসগোল্লা তুলিয়া ধরিতে আয়তনের প্রাচুর্য্য দেখিয়া তাহার চক্ষু-দুটি উল্লাসে জ্বল্‌জ্বল্‌ করিয়া উঠিল। রসনায় যে-লালারস প্রচুর-পরিমাণে আসিয়া জমিতে লাগিল, আপনার লোভহীনতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সে তাহার কতক-কতক কণ্ঠনালীপথে বিদায় করিতে লাগিল।

তারিণী বলাইয়ের থালায় আটটি, কানাইয়ের থালায় চারিটি এবং নিজে গণ্ডা সাতেক লইল। মহেশ্বরী অদূরে বসিয়া এই সূক্ষ্ম বণ্টন ক্রিয়া দেখিতেছিলেন। তারিণীর যে উদর তাহাতে সে গণ্ডা-সাতেক ত লইবেই। কিন্তু কানাই ও বলাইএর মধ্যে ইতরবিশেষ হইল দেখিয়া তাঁহার নেত্র-দুটি আর্দ্র হইয়া উঠিল। তারিণী কার্য্যতঃ যাহা করিল, তাহা মুখে প্রকাশ করিয়া বলিতেও মহেশ্বরীর লজ্জা হইতে লাগিল। তাঁহার থিত চক্ষু-দুটি ওই পাষাণভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া কেবল ইহাই ভিক্ষা রিতে লাগিল যে, "তুমি আমার কানাই ও বলাইয়ের মধ্যে অমন ইতর-শেষ জানিতে দিও না।"

বলাইও কেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে কহিল, "হাঁড়িতে এত রসগোল্লা রয়েছে,—আজা মশাই, কানাই-দাকে আর কিছু দাও না?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সারারাত থাকবে ত? ওরা যে যা খেতে পারে দাও, মামা! ঝিঁকড়গাছায় না হয় বনগাঁয়ে আবার কিন্‌লেই হবে।"

তারিণী কহিল, "ওর ধাতে সইবে কি না, তাই দিইনি। চিঁড়ে চাপাটি হ'লে বেশী-বেশী খেতে পারত—দিতুমও।"

অম্লান কুসুমের উপর তারিণীর এই নিয়ত নিষ্ঠুর পদক্ষেপে মহেশ্বরী শঙ্কিতা হইয়া উঠিতেছিলেন। কানাইলালের দৈন্য ফুটাইয়া দেখাইবার জন্য এমন সংশ্রব লইয়া তাঁহাকে তার্থভ্রমণে বাহির হইতে হইবে জানিতে পারিলে তিনি আসিতেন না। হায়! হায়! যিনি মায়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি নিষ্ঠুরতাকে দুষ্প্রাপ্য করেন নাই কেন? দীনের নয়নাশ্রু মুছাইতে মানুষের প্রাণের শুভজাগরণ কেন এমন নিদ্রিত হইয়া থাকে?

কানাইলালের ভাগ্যে সেই চারিটা রসগোল্লার বরাদ্দ স্থির রাখিয়া তারিণীচরণ যখন আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার জন্য মনোনিবেশ করিল, তখন মহেশ্বরী স্বয়ং উঠিয়া যাইয়া হাঁড়ি হইতে রসগোল্লা বাহির করিয়া কানাই ও বলাইকে আরও কিছু-কিছু দিলেন।

তারিণী কটমট দৃষ্টিতে কানাইলালকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা! আর চাই?"

তারিণী কহিল, "তা দাও। বনগাঁয়ে যখন কেনা হবে, তখন ভাবনা কি? হাঁড়িতে গোটা-চারেক রাখ্‌লেই হবে। পথে-ঘাটে ছেলে-পিলে নিয়ে চলা—ভাঁড়ারটা সঞ্চিত রাখাই যুক্তি।"

মহেশ্বরী আরও গণ্ডা-সাতেক তারিণীচরণের থালায় দিলেন। খাওয়া শেষ হইলে তারিণীচরণ নিদ্রার আয়োজন করিল। মহেশ্বরী ছেলেদেরও শুইতে বলিলেন। তাহারা বসিয়া-বসিয়া গল্প করিতে লাগিল এবং গাড়ীর দ্বারপথে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

বনগ্রাম পার না হওয়া পর্য্যন্ত তারিণীর নিদ্রা হইল না। এক-একটা ষ্টেসনে গাড়ী ধরে, আর সে চম্‌কিয়া-চম্‌কিয়া উঠে। বলে, "বনগাঁয় এল নাকি?" বলাই একবার বিরক্ত হইয়া উঠিল, "আজ্ঞা মশাই, আপনি

স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যান্। বন্‌গাঁ পেরিয়ে গেলেও ক্ষতি হবে না। খাবারের জায়গাতেই ত যাচ্ছেন। ভীমনাগের সন্দেশ—নবীন ময়রার রসগোল্লা—এসব শোনেননি? বনগাঁর চেয়ে কল্‌কাতায় ভালো ভালো খাবার পাবেন।"

তারিণী কহিল, "আর লোভ দেখাস্‌নে। মা কি ততটা সময় কল্‌কাতায় দাঁড়াবেন? আমাব জন্তে কি ভাবি? তোদেব যে ক্ষিধে পেলেই দিতে হবে। তা পাওয়া যাক্—আব নাই যাক্।"

বলাই কানাইলালের গা টিপিয়া হাসিল।

যাহা হউক বনগ্রামেব কিছু কাঁচা-গোল্লা ভাণ্ডাব-জাত হইলে তাবিণী-চবণ নিশ্চিন্তমনে নিদ্রাদেবীর সেবায় নিযুক্ত হইল। ছেলেবাও গল্প কবিতে-কবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। কেবল মহেশ্ববীব ঘুম হইল না। তাঁহাব এই প্রবাস-যাত্রাব পথে কানাইলালেব প্রতি তাবিণীচবণেব হিংস্র চক্ষুদুটি যে কি উপায়ে শোধন করিয়া লইবেন, তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহেশ্বরীর জন্য কলিকাতায় একটি বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। তাঁহারা সকলে সেই বাসায় আসিয়া উঠিলেন। ছেলেদের কষ্ট হইবে বলিয়া দুইদিন কলিকাতায় যাপন করিয়া তাঁহারা সেতুবন্ধ যাইবার জন্য তৃতীয় দিবসে হাওড়া ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। টিকিট খরিদ কবা হইলে তাবিণীচরণ মহেশ্বরীকে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। তখনও গাড়ী ছাড়িতে প্রায় কুড়ি মিনিট বিলম্ব ছিল। ছেলেরা বলিল, "আমরা ঠিক সময়ে এসে উঠ্‌ব, একটু এদিক্‌-ওদিক্‌ বেড়িয়ে আসি।"

তাহাবা ইতস্ততঃ বেড়াইতে-বেড়াইতে এক স্থানে দেখিল একটি ভদ্র-লোক একটি পীড়িতা স্ত্রীলোকেব পার্শ্বে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। আর দশ-বাবো বৎসরের একটি বালিকা কখনও অঞ্চল দ্বারা তাহার জননীকে বাতাস করিতেছে, কখনও বা হস্ত ও পদের অঙ্গুলিগুলি টানিয়া-টানিয়া দিতেছে।

কানাইলাল জিজ্ঞাসা করিল, "এঁর কি হয়েছে? আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন?"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আমি বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত। ঘাঁটালে আমি চাকরি করি। এদের নিয়ে ব্রহ্মপুত্র-স্নানে গিয়েছিলাম। গত রাত্রে এই ষ্টেসনেই এর কলেরা হয়েছে। এখনও পর্য্যন্ত একটুও ঔষধ পড়েনি। ষ্টেসনে এত ভদ্রলোক ভিড় ক'রে আছেন, কিন্তু এমন একটি লোকেরও সাহায্য পেলাম না যে, দুটো হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আনাই। এদের ফে'লেও যেতে পারিনে।"

কানাই কহিল, "কি ওষুধ আনতে হবে বলুন, আমি এনে দিচ্ছি।"

কানাইলালের উপর সজল চক্ষুদু'টি স্থাপিত করিয়া ভদ্রলোকটি তাঁহার কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি একখানি কাগজে ঔষধদু'টির নাম লিখিয়া দিলেন।

বলাইকে সঙ্গে লইয়া কয়েক পদ আসিবার পর কানাই তাহাকে কহিল, "ভাই! তুমি যাও, বড়-মা আবাব ব্যস্ত হ'য়ে পড়্বেন। আচ্ছা! চলো, বড়-মাকে একবাব ব'লেই যাই।"

তাহাবা তখন তাড়াতাড়ি করিয়া মহেশ্ববীর নিকটে আসিল। কানাই কহিল, "একটি ভদ্রলোকের স্ত্রীর বড় ব্যাবাম। আমি এই ওষুধ-দুটো তাঁকে দিয়ে আস্ছি। বলাই তুই গাড়ীতে যা, বস্বি। আর বড়-মা! যদি একটু দেরি হ'য়ে পড়ে—আর গাড়ী ছাড়্বার সময় হয়, তবে নেমে পোড়ো—পরের গাড়ীতে যাবো। ফে'লে যেও না যেন।"

মহেশ্ববী কহিলেন, "আচ্ছা! তাড়াতাড়ি ক'রে আসিস্—সময় বড় নেই। বলাই তোর সঙ্গে গেলে পারত!"

কানাই বলিল, "চট পট ছু'টে চলে আস্তে হবে; দু-জনে গেলে আবার নজর রেখে চল্তে হবে—সে আরও দেরি হ'য়ে যাবে।"

এই বলিয়া কানাই ছুটিয়া চলিয়া গেল।

তারিণীচরণ মনে-মনে বলিল, দেরি হ'লেই মঙ্গল, উপসর্গটা এখানে ঝেড়ে ফে'লে যেতে পার্লে পুণ্যসঞ্চয়ে আর বাধা হবে না।"

এদিকে যখন গাড়ীর দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল তখন মহেশ্বরী কহিলেন, "যামা! তা'র ত দেরি হচ্ছে। জিনিসপত্তরগুলো নামিয়ে রাখ্লে হ'ত না? শেষে তাড়াতাড়ি ক'রে নামানো যাবে না।"

তারিণী কহিল, "যদি গাড়ী ছাড়্তে-ছাড়্তে এসে পড়ে, তবে তুলতেও ত পারা যাবে না। তুমি ভেব না মা! দরকাব

হ'লে তারিণীচরণ এক মিনিটেই গাড়ী খালি ক'রে নেবে। জয় রাধে-গোবিন্দ !"

মহেশ্বরী কহিলেন, "না হয় পরের গাড়ীতেই যাবো ?"

তারিণী কহিল, "তুমি ক্ষেপেছ, মা। ছোঁড়াটাকে ফেলে যাবো ? আসে ভালোই—না আসে একটা কিছু কর্‌বই। জয়—রা—রাধে।"

তৃতীয় ঘণ্টা বাজিল। মহেশ্বরী দ্বার খুলিয়া বাহির হইতে যাইবেন এমন সময় তারিণী সজোরে হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, "ওই দেখ না—ওই দেখ না—ওই যে দৌড়ে আস্‌ছে।"

জনস্রোতের মধ্যে মহেশ্বরী তাঁহার কানাইলালকে নির্ণয় করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

মহেশ্বরী বেঞ্চের উপর এলাইয়া পড়িলেন। তারিণী বুঝাইতে লাগিল— "সে নিশ্চয়ই পিছনের কোনো গাড়ীতে উ'ঠে পড়েছে। পরের ষ্টেসনে গাড়ী থাম্‌লে খুঁজে নেবো।"

তারিণীর সান্ত্বনা-বাক্যে মহেশ্বরী আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। মাতৃ-হৃদয়ের ফাঁকা স্থানটি, যে ফাঁক্‌ করিয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহ পূরণ করিতে পারে না। এই স্নেহময়ী শান্ত-স্বভাবা সৎ-জননী বলাইকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, কিন্তু যে-স্থানটা ফাঁকা হইয়াছে, সে-স্থান যে পূরণ হয় না! তিনি কাঁদিতে-কাঁদিতে কহিলেন, "মামা! গাড়ী যদি না থামে ?"

তারিণী ধম্‌কাইয়া কহিল, "থাম্‌বে না—রাতদিনই চল্‌তে থাকবে ?"

"এই ত ষ্টেসনের পর ষ্টেসন ফে'লে চলেছে—থামে কই ?"

"ডাক-গাড়ী যে—সকল ষ্টেসনে ধরে না। জয়—রা—।"

বলাইএর চক্ষে ধারা বহিতেছিল। মহেশ্বরী বলাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাদের ওষুধ আন্‌তে গেছে—তাদের কি অসুখ ?"

বলাই কহিল, "কলেরা।"

মহেশ্বরী সভয়ে উচ্চারণ করিলেন, "কলেরা!" তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। শুধু বুকের স্পন্দনটা দ্রুত করিয়া দিয়া তাঁহার দেহের অন্যান্য ক্রিয়াসকল কে যেন হঠাৎ থামাইয়া দিল। তিনি বেঞ্চের উপর আবার ঢলিয়া পড়িলেন। যে-কালব্যাধি কানাইলালের গৃহখানি শ্মশান করিয়া দিয়া কেবল তাহাকেই অবশিষ্ট রাখিয়াছে, সে আজ তাহাকে সম্মুখে পাইয়া কি আত্মসম্বরণ করিতে পারিবে? মহেশ্বরী যাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া এতদিন কত অপমান, বিদ্রূপ, নির্য্যাতন, সমস্তই অম্লান-বদনে বুক পাতিয়া সহ্য করিয়া আসিতেছেন, প্রাণের সে স্নেহ সম্পদ হারাইয়া আজ কিরূপে তিনি প্রকৃতিস্থা থাকিবেন? যিনি বিপদে-বিষাদে কত শান্ত, তিনি আজ এমন অশান্ত হইয়া উঠিলেন যে, এক-সময় তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"মামা!—তুমিই মাতৃ-হৃদয়ের এ দুর্দ্দশা করেছ! মাতৃস্নেহ যে কি জিনিস তা জানো না।"

তারিণী বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "হাঁ মা! মাতৃস্নেহ যে কুস্থানে গিয়ে তা'র নামের কলঙ্ক করে, সেটা জানতাম না বটে! জয়—রাধে গোবিন্দ।"

মহেশ্বরী বুকের উপর হাত রাখিয়া কহিলেন, "পাগল! এখানে বিভাগ নেই—বিচার নেই——ভাগ-বাঁটরা নেই—সব একাকার।" মহেশ্বরীর স্বর জড়াইয়া আসিল।

তারিণী বার-দুই রাধাগোবিন্দের নাম উচ্চারণ করিয়া বলিল, একাকার না হ'লে আর এমন একাকার করতে পারো?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সম্পর্কে তুমি মামা, কিন্তু আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে, বালকের মতন তোমাকে বোঝাই। বর্ষা যখন নামে তখন শুধু বড় গাছের উপর তা বর্ষিত হয় না—আগাছা-কুগাছা সমানভাবেই তা ভোগ

করতে পায়। নারীর এ বিরাট রূপ তুমি কখনো চোখে দেখনি। কি পিতা, কি স্বামী, কি সন্তান কেহই এ রূপকে বিভেদ ক'রে দেখেন না। সকলে সমানভাবে স্নেহ পেয়ে থাকেন। সে যাক্—যা করেছ তা'র আর হাত নেই। আমি জানতাম, তোমার বয়স হয়েছে, তাই তোমাকে সঙ্গে আন্‌তে ইতস্ততঃ করিনি।"

তারিণী তাহার জ্বলন্ত চক্ষু-দুটি মহেশ্বরীর দিকে ফিরাইয়া কহিল, "তুমি ডেকে এনে অপমান করবে না বিশ্বাস ছিল ব'লেই আমি আস্‌তে দ্বিধা করিনি।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "মামা! তুমি ভুল বুঝেছ। আমরা কারো অপমান করতে পারিনে। কিন্তু সকলকে শাসন করবার অধিকার আমাদের আছে। সে অধিকারটুকু বোঝো না ব'লেই মনে ব্যথা পাও।"

তারিণী আর কিছু বলিল না। মহেশ্বরীও নীরব হইলেন। বড়-মার চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখিয়া বলাই এতক্ষণ কিছু বলিতে সাহস করে নাই। সঙ্গীহীন হইয়া তাহার এমন অসহ্য যাতনা বোধ হইতেছিল যে, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িতে পারিলে সে যেন বাঁচিত। তারিণীচরণের সহিত মহেশ্বরী যখন মিষ্টভাবে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহার কিছু সাহস হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বড়-মা! কানাইদা'কে পাওয়া যাবে ত?"

মহেশ্বরী তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, "পাওয়া যাইবে বই কি! প্রাণে ছাড়তে না চাইলে কি ছাড়াছাড়ি হয়। যে-কালব্যাধির কথা শুনিয়েছিস্, এখন বিধাতা তা'কে প্রাণে রাখ্‌লে হয়।"

মহেশ্বরীর বেদনার উচ্ছ্বাসটা যখন তাঁহার নিজের মর্ম্মস্থলকে আহত করিয়া প্রকাশ পাইল, তখন অল্পবুদ্ধি তারিণী মনে করিল, সে বুঝি

তিরস্কৃত হইল, এবং গ্লানিটা অবাধে পরিপাক করিবার জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া রহিল।

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা কি ঘুমোলে নাকি?"

তারিণীচরণ অন্যদিকে মুখ করিয়া কহিল, "যে-বিষ ঢেলে দিয়েছ, সেটাকে আগে হজম কর্‌ব—তার পরে ত ঘুম?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "বিষ হজম কর্‌তে পার্‌লে অমৃত হ'য়ে যাবে। কিন্তু যদি পরিপাক কর্‌বার ক্ষমতা না থাকে—পেটেই থেকে যায়—তবেই গোল। মামা! কোন্ ষ্টেসনে গাড়ী থাম্‌বে?"

তারিণী উগ্রস্বরেই কহিল, "আমি তা'র কি জানি? রেলের কর্ত্তারাই জানে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "রাগ করো কেন, মামা। সেই ষ্টেসনে যে আমাদের নাম্‌তে হবে।"

তারিণী কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন? সেতুবন্ধ হ'য়ে গেল নাকি?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "কল্‌কাতায় আগে যাই। ছেলেটাকে পাই ত ফি'রে এলে হবে।"

তারিণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর যদি না পাও?"

মহেশ্বরীর প্রাণ আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি কিছুক্ষণ জবাব দিতে পারিলেন না। পরে মৃদুস্বরে কহিলেন, "না পাওয়া গেলে কোন্ দিকে যে যাবো, এখনও স্থির নেই।"

তারিণী বেঞ্চ হইতে লাফাইয়া উঠিল। ভুঁড়িটা নাচাইয়া কহিল, "শোনো মহেশ্বরী! এই নিষ্পাপ দেহখানা তোমার সংস্পর্শে এসে আঠারো আনা পাপ ভর ক'রে দাঁড়িয়েছে। তীর্থের নামে বের হ'লে—পা মচ্‌কালে বাগ্দীর ছেলে। দেশে গেলে লোকে মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবে না?"

মহেশ্বরী অতি দুঃখে হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "কল্‌কাতায় গিয়ে সুখেনকে খবর দেবো। সে এলে তুমি খরচপত্তর নিয়ে রামেশ্বর যেও।"

তারিণী কহিল, "ছোঁড়াটা—এমন অষ্ট-বন্ধনে বেঁধেছে জান্‌তে পার্‌লে, তারিণীচরণের আজ পথ থেকে ফির্‌তে হয়? তারিণী চক্কোবত্তির বুদ্ধির ওপর হাত দেয় এমন লোক আজও জন্মায়নি। নিতান্ত আহম্মক সেজেই ঘর থেকে পা বাড়িয়েছিলুম, নইলে একটা মেয়েলোকের হাতে বুদ্ধিটা জখম হ'য়ে যায়?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সে, মামা, যা হবার হয়েছে। সে-কথা যেতে দাও। এখন যে-ষ্টেসনে গাড়ী ধর্‌বে, সেইখানে নাম্‌তে হবে, মনে থাকে যেন। একটা কুলী ডেকে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্তরগুলো নামিয়ে নিও।"

তারিণীচরণ সমস্ত দেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া শুইয়া পড়িল।

মহেশ্বরী চুপিচুপি বলাইকে কহিলেন, "মামা যদি মন না দেন, তুই একটা কুলী ডেকে জিনিসপত্তরগুলো নামিয়ে নিতে পার্‌বিনে?"

বলাই কহিল, "কেন পার্‌ব না? তুমি ভেব না, বড়মা! আমি সবই ঠিক ক'রে নেবো।"

মহেশ্বরী গাড়ীর গবাক্ষপথে চক্ষু রাখিয়া ষ্টেশনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তারিণীচরণের নিকট মহেশ্বরীর সমস্ত তাড়না এবং উপদেশ ব্যর্থ হইল। প্রবাস-পথে তারিণীকে মহেশ্বরীর খুবই দরকার। তিনি তাঁহাব মনের অসহ্য সন্তাপ তাহাকে একটু-একটু করিয়া বুঝাইতেছিলেন। কিন্তু যে অহঙ্কারে আত্মবিস্মৃত হইয়া শুধু আপনার কৃতিত্বেব উপর বিশ্বাস রাখে, তাহাকে বুঝানো ত যায়ই না, বরং শত্রুতাসাধনে সে তৎপব হয়। মহেশ্বরী যদি তারিণীর বুদ্ধির প্রতি সম্মান দেখাইয়া কথা বলিতেন, তাহা হইলে হয়ত কিছু ফল পাইতেন। তারিণী মনে মনে ভাবিতেছিল, একটি স্ত্রীলোকের দুর্ব্বুদ্ধিব পিছনে যদি গতানুগতিক-ভাবে আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিটা সে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে লোকের নিকট তাহার অসারত্ব প্রতিপন্ন হইতে অধিক সময় লাগিবে না। সুতরাং সে মহেশ্বরীকে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার জন্য মনের মধ্যে এক নূতন সঙ্কল্প গড়িয়া তুলিল।

তাবিণীচরণ সেই যে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া ছিল, সে আর উঠিল না—কথা বলিল না—চক্ষুও ফেলিল না। সে ভরসা করিয়াছিল যে, একটি বালককে মাত্র আশ্রয় করিয়া এই দূরদেশের একটা ষ্টেসনে নামিয়া পড়িতে মহেশ্ববী কখনও সাহসী হইবেন না। কিন্তু এই স্বার্থান্ধ লোকটির সহিত সামান্য সময়েব সংস্রবে মহেশ্বরী যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, উহার দ্বারা তাঁহারা আর বিশেষ-কিছুই সাহায্য পাইবেন না।

ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে মহেশ্বরী 'মামা'! 'মামা'! বলিয়া কয়েকবার

ডাকাডাকি করিলেন। তারিণীর নিদ্রা ভাঙ্গিতে চায় না। বলাই ইতিমধ্যে একটি কুলী সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জিনিসপত্র সমস্ত নামাইয়া লইল। এবং মহেশ্বরীকে নামিতে বলিয়া নিজে নামিয়া পড়িল। মহেশ্বরী দ্বারের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মামা! তোমার ত ঘুম ভাঙ্‌ছে না! যদি সেতুবন্ধ যেতে চাও, তোমার নিকট টিকিট আছে, ঐ টিকিটে যেতে পারো। আর তোমার কি খরচপত্তর লাগ্‌বে একবার বাইরে এসে হিসেব ক'রে নাও।"

এই বলিয়া মহেশ্বরী অবতরণ করিলেন। তারিণী গাত্রবস্ত্র অপসারিত করিয়া দেখিল যে, তাহার ন্যায় কার্য্যক্ষম ও সুচতুর চালকটির পঙ্গুত্ব প্রমাণিত করিয়া দিয়া সকলে নামিয়া পড়িয়াছেন। সে আর কি করিবে, অগত্যা সেও নামিয়া পড়িল।

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা! তুমি কি সেতুবন্ধ যেতে চাও?"

তারিণীর মনে এমন ভরসা ছিল না যে, সে একাকী দূরদেশে অপরিচিত স্থানে যাইয়া আপনার দেহটাকে বাঁচাইয়া আনিতে পারিবে। সে দন্তবিকাশ করিয়া কহিল, "বলো কি মা! তোমাকে এই জন-সমুদ্রের মাঝে এক্‌লাটি ফে'লে দিয়ে যাবো তীর্থ কর্‌তে?" একটু পরে আবার কহিল, "গাড়ীতে উ'ঠে পড়্‌লে হ'ত—বুঝ্‌লে মা! কল্‌কাতা ভারি একটা সহর কিনা! ফি'রে এসে তোমার ছেলেটাকে তারিণীচরণ একদিনেই টেনে বের্ কর্‌বে—দেখো। বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর সবই তোমার এই মামাটির পায়ের তলায়। বিলেত কিনা যাইনি, তা'র আইডিয়াটা মনের মধ্যে যা গড়া-পেটা রয়েছে, সেখানে গেলেও তারিণীচরণ ঘাবড়ে যাবেন না।"

মহেশ্বরী এসকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। গাড়ীর আরোহিগণ, যাহারা কাজে-অকাজে নামিয়া পড়িয়াছিল, গাড়ী ছাড়িবার উপক্রম

হইলে তাহারা যখন আধার হুড়্-পাড়্ করিয়া গাড়ীতে উঠিতে লাগিল তখন তারিণী অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া ষ্টেসনের খানিকটা স্থান লইয়া, ছুটাছুটি করিয়া ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে পাগলের মতন মহেশ্বরীর নিকটে আসিয়া বলিল, "মহেশ্বরী! ওই ইঞ্জিনে ধোঁয়া উড়্ছে—ওই বাঁশী বাজালে—এখনি হুস্ হুস্ শব্দ কর্বে—এস মা! উ'ঠে পড়ি।" এই বলিয়া একটা বাক্সের একদিকে বলাই, একদিকে তারিণী, দুইজনে দুইদিকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। রেলের একজন গার্ড্ সেইখান দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া তারিণী বলিল, "বাবা! দোহাই তোমার, গাড়ীটা আর এক মিনিট ঠেকিয়ে রাখো!" তার পর বাক্স ছাড়িয়া দিয়া সে দ্রুতপদে যাইয়া মহেশ্বরীর হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। বলিল, "মহেশ্বরী! এ কি কর্লি? গাড়ী যে ছেড়ে দিলে—আয়! আয়! এখনও উঠ্তে পারা যাবে।"

গাড়ী তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তারিণী মহেশ্বরীর হাত ছাড়িয়া দিয়া রেলের সঙ্গে-সঙ্গে ছুটিতে লাগিল। আর এক-একবার পিছু ফিরিয়া মহেশ্বরীকে ডাকিতে লাগিল। গাড়ীখানা যখন ষ্টেসন ত্যাগ করিয়া গেল, তখন সে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল এবং এক-একবার বলাই ও মহেশ্বরীর উপর তাহার সর্ব্বগ্রাসী দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ণ করিয়া হানিতে লাগিল যে, তারিণীর চক্ষু বলিয়াই তাঁহারা রক্ষা পাইলেন,—ভস্মীভূত হইলেন না।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর কলিকাতাগামী ট্রেন্খানি আসিয়া প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইল। বলাই টিকিট করিয়া আসিয়া একটি কুলীর সাহায্যে জিনিসপত্রসকল গাড়ীতে তুলিয়া লইল। মহেশ্বরী কহিলেন, "মামা! আর ব'সে থেকে কি হবে? এস! গাড়ী এখনই ছেড়ে দেবে।" এই বলিয়া মহেশ্বরী গাড়ীতে উঠিলেন। তারিণী আর উপায়ান্তর

না দেখিয়া অবরুদ্ধ সর্পের ন্যায় গর্জ্জিতে-গর্জ্জিতে ট্রেণে গিয়া উঠিল।

কলিকাতায় পৌছিলে মহেশ্বরী নিজেই সমস্ত ষ্টেশনটি ঘুরিয়া-ফিরিয়া কানাইলালকে তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। অবশেষে নিরুৎসাহ হইয়া যেখানে সেই ভদ্রলোকেরা আস্তানা ফেলিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান চিন্তা—সেই কাল-ব্যাধি! সেই চিন্তায় তাঁহার দেহ একেবারে অবশ করিয়া ফেলিতে লাগিল। যে খল ব্যাধি তাঁহার পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী গৃহের সকলকেই একে-একে গ্রহণ করিয়াছে, সে কি আজ তাঁহার জীবনসর্ব্বস্বকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে? যে-সকল চিন্তা চিত্তের একান্ত অবসাদজনক, সে-সকল এখন অন্তরের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্তর হইতে জীবন্ত হইয়া মহেশ্বরীর নিকটে আসিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হয়ত বাছা মুখে একটু ওষুধ পায় নাই—জল-জল করিয়া প্রাণটা বাহির হইয়া গিয়াছে! মা-অন্ত প্রাণ যার—মায়ের অভাব তাহার জীবনী-শক্তিকে হয়ত অতি মাত্রায় কমাইয়া দিয়াছে। সে যে তাহাকে ফেলিয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছিল। একটা গাড়ী অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিল। এই উপেক্ষা হয়ত তাহার অভিমানকে জাগাইয়া দিয়া তাহার আত্মনাশের পথ সহজ করিয়া দিয়াছে। তাহার মুক্ত-আত্মা মহেশ্বরীর এ অপরাধ কি ক্ষমা করিতে পারিবে?" মহেশ্বরী আর ভাবিতে পারিলেন না। তিনি যেন সেইখানে মাটির সঙ্গে পাথর হইয়া বসিয়া গেলেন।

তারিণী কহিল, "এখানে ব'সে ব'সে ভাবুলে ষ্টেশনের পেট ফুঁ'ড়ে সে কিছু বের হচ্ছে না, বুঝ্‌লে মহেশ্বরী! এখন যে-পথে হয় এক পথে হাঁট্‌তে হবে ত? পেট্‌টি আর কতক্ষণ শাঁস্ত রাখা যায়?"

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলাই! টেলিগ্রাম কোথায় কর্‌তে হয় জানিস্‌?"

বলাই কহিল, "জানি—ডাকঘরে। এখানে কাছে ডাকঘর আছে কি না জানিনে। তা সে লোকের কাছে জেনে নিতে পার্‌ব। কা'কে টেলিগ্রাম কর্‌তে হবে বড়-মা?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সুখেন্‌কে। মামা কি একটু সঙ্গে যেতে পার্‌বে?"

তারিণী মুখ বিকট করিয়া কহিল, "মামার ঠ্যাং দু'খানা পঙ্গু হয়নি—তা সে পারে। তবে তোমার সঙ্গে তীর্থ কর্‌তে আস্‌তে হবে জান্‌লে বিশ্বকর্ম্মার নিকট থেকে ঠ্যাং দু'খানার শক্তি চিরস্থায়ী ক'রে নিয়ে আস্‌তাম। তা করা হয়নি, এখন খেয়ে-দেয়েই শক্তি জোগান দিতে হবে।"

তারিণীর হাতে একটি টাকা দিয়া মহেশ্বরী কহিলেন, "এই দিয়ে কিছু জল্‌-টল্‌ খেয়ে যাও।"

তারিণী কহিল, "ছোঁড়াটা কি তোমার এই মামাটির মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাক্‌বে—আর পেটের জ্বালা মেটাবে?"

মহেশ্বরী বলাইএর হাতেও একটি টাকা দিলেন। পথে তারিণী তাহার নিকট হইতে সে টাকাটিও চাহিয়া লইল এবং পাঁচসিকার খাবার খরিদ করিয়া বক্রী বারো আনা সে পকেটে পূরিল। খাবারের চোদ্দআনা-রকম সে উদরস্থ করিল; বলাই দু'আনা-রকম খাইতে পাইল। তার পর সে মহেশ্বরীর নিকটে আসিয়া বেশ করিয়া চাপিয়া বসিল। মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা! তোমরা গেলে না?"

তারিণী যখন দেখিল, এই অবোধ নারীর অসঙ্গত অশান্তিটা মুখমণ্ডলের স্নায়ুগুলা পর্য্যন্ত ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তখন সে তীর্থদর্শনের অভিপ্রায়টা জীর্ণ করিয়া লইয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত

হইল। সুখেনকে খবর দিয়া বৃথা কালক্ষেপ করা সে সঙ্গত মনে করিল না। সে কহিল, "সুখেনকে খবর দিয়ে কি হবে? সে কি এই লক্ষ-লক্ষ লোকের মাঝ্খান থেকে ছোঁড়াকে টেনে বের কর্‌তে পার্‌বে?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "মৃতদেহে আত্মাটাকে জোর ক'রে পূ'রে রাখ্‌বার চেষ্টা যে কি পাগ্‌লামি, সে তুমি বুঝ্‌বে না। প্রাণের উৎসব যে, সে চ'লে গেল! প্রাণ কি ক'রে থাক্‌বে?"

তারিণী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "এ সকল অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি—তারিণী যা দেখ্‌তে পারে না—তাই। আপনার রক্ত মাংস, সুখেনের ছেলে, এই বলাই গেল তল্‌—আর সেই বাগ্দী ছোঁড়াটাই হ'ল কিনা প্রাণের উৎসব!"

মহেশ্বরী কহিলেন, "ভেবে দেখ্‌লে আপনার রক্ত সবাই। ধারায়-ধারায় এখন সহস্র ধারায় এসে পড়েছে। আর সংসারে যার দাঁড়াবার স্থল আছে, তা'র স্নেহ পেতে অভাব হয় না। যার সে স্থান নেই, সে যে স্নেহের একান্ত কাঙাল! আমাদের নারী-হৃদয় তাকেই বেশী ক'রে জড়িয়ে ধরে।"

তারিণী কহিল, "সে কি কচি খোকা! চলো ঘরে ফি'রে যাই, দেখ্‌বে আমাদের আগেই দেশের বাড়ীতে সে সশরীরে উদয় হয়েছে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তা সে যায়নি। সে যে কি অভিমানী ছেলে—তুমি জানো না, মামা! একটা গাড়ী অপেক্ষা ক'রে যেতে বলেছিল—সে-কথা সে ভুল্‌বে না। তার পর হাতে পয়সাকড়িও নেই। সে কেবল স্নেহ-রসে বেড়েই উঠেছে—আপনার নিজত্বটুকু বু'ঝে নিতে পারেনি—তা আমার কাছেই ফে'লে গেছে।"

বলাই জিজ্ঞাসা করিল, "বড়-মা! টেলিগ্রাফ কর্‌তে যাই তবে—কি ব'লে কর্‌তে হবে?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "হাঁ দাদা! যাও! লিখো,—বড় বিপদ্—শীঘ্র এস। বাসার ঠিকানা দিও।"

"তুমি একলাটি এখানে থাকতে পারবে?"

"তা পারব। দিনের বেলা ভয় নেই, তোমরা এস গিয়ে।"

বলাই গমনোদ্যত হইলে তারিণীও অগত্যা তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিল।

সংসারে নারীর কর্ত্তব্য ও সম্পর্ক যে কত দিকে, তাহা তারিণীর মতন স্বার্থপর লোকে বুঝিতে পারিবে কেন? যে হৃদয় আড়ম্বরশূন্য—সে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় অতি গোপনে—লোক-চক্ষুর অন্তরালে এই দাবদগ্ধা ধরিত্রীর শুষ্ক বুকখানি মমতার প্রলেপে যে কতখানি শীতল করিয়া রাখে, সে খবর সে দিতেও চায় না—অপরেও পায় না।

তারিণী ও বলাই চলিয়া গেলে মহেশ্বরী ষ্টেশনের দিকে তাঁহার কাতর চক্ষু-দুটি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। গাড়ীগুলি বেদনার সুরে বাঁশী বাজাইয়া অনুক্ষণ অসংখ্য যাত্রী আনিয়া ঢালিতেছে ও তুলিতেছে, তাঁহার নিস্তব্ধ হৃদয়ে চেতনা জাগাইয়া দিতে, কই কানাইলালকে ত আনিয়া দেয় না! মহেশ্বরীর প্রাণের মাঝে এমন করিয়া ধরা দিয়া এই জনস্রোতের মধ্যে কোথায় সে লুকাইয়া পড়িল! যদি সে প্রাণে বাঁচিয়া থাকে, তাঁহার জন্যও তা'র কত না কষ্ট হইতেছে! বিপৎসঙ্কুল সংসারে তিনি যে তাহাকে একলাটি করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন! মহেশ্বরীর চক্ষু দিয়া অজস্রধারে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

নবীন সেই প্রথম যে-দিন এই নিরাশ্রয় আড়াই বৎসরের উলঙ্গ শিশুটিকে হাঁটাইতে-হাঁটাইতে আনিয়া তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া গেল, সেই দিন হইতে আজ এই ষোড়শবর্ষ কত অপমান বিদ্রূপ হেলায় সহ্য করিয়া, তিনি যে আপনার বুকের উপর তাহাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন।

এই সুদীর্ঘ সময়ের কত-কত ঘটনা, আজ উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার চক্ষে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সুখেন্দুর সেই নিষ্ঠুর বেত্রাঘাত, সে যে এখনও তাহার অঙ্গের ভূষণ হইয়া আছে। বলাইকে সুস্থ করিবার জন্য বালকের সেই মন্ত্র শিক্ষা—শিশু-হৃদয়ের এ অপরূপ রূপ বাগ্দীর ছেলের অপবাদের আড়ালে ত লুকাইয়া ফেলা যায় না? শান্তির বিবাহের সেই কতরকমের নির্য্যাতন! একে-একে সমস্তই মনে উঠিয়া মহেশ্বরীর মন ও প্রাণ অত্যন্ত শোচনীয় করিয়া তুলিল।

বলাই ও তারিণী টেলিগ্রাম করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাঁহারা সকলে বাসায় গেলেন। টেলিগ্রাম পাওয়ার একদিন পরে সুখেন্দু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুখেন্দু সমস্ত শুনিলেন। কানাইলালের জন্য তাঁহারও মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। যে বালক এই সুদীর্ঘকাল পুত্রাধিক স্নেহে তাঁহার গৃহে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, তাহার বিচ্ছেদে কাতর হইবেন না, সংসারে এমন নিষ্ঠুর কে আছেন? বিশেষতঃ শেষ দিক্‌টায় কানাইলালের চরিত্র এমন পরিবর্ত্তিত ও শোভনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, সুখেন্দুও তাহার শিষ্ট শান্ত ও সত্য ব্যবহারে একান্ত মুগ্ধ ও পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সুখেন্দুর হৃদয়ও স্নেহ-প্রবণ। বৈষয়িক লোকের হৃদয়ে ঘটনা-পরম্পরায় যে রূঢ়তাটুকু প্রকাশ পায়, তাঁহার চরিত্রেও মাঝে-মাঝে তাহারই একটা আভাস দেখা যাইত। যাহা হউক, কানাইলালের জন্য তাহার চক্ষুদু'টিও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

সুখেন্দুর যাহা সাধ্য সমস্তই করিলেন। তিনি হাঁসপাতালগুলির রেজেষ্টারী বহি দেখিয়া আসিলেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে-সকল উদ্যান বা পুষ্করিণীর তীরে বহু লোকজনের সম্মিলন

হয়, সে-সকল স্থানে দিন-কতক ঘুরিয়া-ফিরিয়া অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই যখন নিষ্ফল হইল, তখন মহেশ্বরীকে দেশে লইয়া যাইবার জন্য তিনি অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন। মহেশ্বরী কহিলেন, "আমি দেশে গিয়ে শূন্য ঘর দেখ্‌তে পার্‌ব না। তুই গিয়ে শৈলকে পাঠিয়ে দে—আর বলাইও দিনকতক আমার সঙ্গে থাক্।"

অনন্তর সুখেন্দু শৈলবালাকে না পাঠানো পর্য্যন্ত তারিণীচরণ সেখানে থাকিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি দেশে রওনা হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কানাইলাল যে ভদ্রলোকটির ঔষধ আনিতে গিয়াছিল, তাঁহার নাম গণপতি মিত্র। পূর্ব্বে হুগলি জেলায় তাঁহার বসতি ছিল। এখন খাঁটালে একটুক্রা জমি লইয়া—সেইখানেই সামান্য-রকমের একটি বাড়ী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং তথাকার বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্ত্রী ও দুইটি কন্যা সন্তান ব্যতীত সংসারে তাঁহার আর কোনো বন্ধনই ছিল না। বড় মেয়েটির বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। ছোটটির নাম নলিনা; সে একাদশ বৎসরে পড়িয়াছিল।

কানাইলাল হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গণপতির হস্তে ঔষধ-দুটি দিয়া কহিল, "অনেক দূর যেতে হয়েছিল, বড় দেরি হ'য়ে গেছে। আমার মা বোধ হয় এ গাড়াতে যেতে পারেননি। আমি একবার দেখা ক'রে আসি। এসে আপনাদের শুশ্রূষা ক'রব।"

গণপতি কহিলেন, "আপনাকে আর কি ব'লে ধন্যবাদ দেবো? যদি পারেন ত একবার এসে দে'খে যাবেন।"

কানাই দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আসিয়া দেখিল, গাড়ীখানা চলিয়া গিয়াছে। তাহার হৃদয়ের স্পন্দন অত্যন্ত দ্রুত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনও তাহার মনে ভরসা ছিল যে, মাতৃস্নেহের অচ্ছেদ্য সম্পর্কটা এমন সহজে যায় না। মহেশ্বরী কোথাও-না-কোথাও আশ্রয় লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সে প্লাটফর্ম্মের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ঘুরিয়া-ঘুরিয়া আসন্নমৃত্যু-লোকের মায়াজড়িত চক্ষু-দুটির মতো তাহার চক্ষু-দুটি সকলের দিকে ঘুরাইতে-ফিরাইতে লাগিল। যখন

কোথাও তাঁহাদের দেখিতে পাইল না, তখন সে বিশ্রাম-গৃহগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া আসিল; এবং তৃষিত চাতকের মতো নবাগত যাত্রীদের প্রতিও কিছুকাল 'হাঁ' করিয়া চাহিয়া রহিল। অবশেষে সজোরে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া বসিল; এবং হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তনের পথে আসিয়া সে একেবারে দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে যে মহেশ্বরীকে তাহার একান্তই প্রয়োজন। একমাত্র মহেশ্বরীই তাহাকে জগতের সম্মুখে পরিচিত করিয়া রাখিয়াছেন। মহেশ্বরীর অভাবে জগতের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধই নাই। আনন্দের সহিত বেদনা যে এমন জট পাকাইয়া জড়াইয়া থাকিতে পারে, যাহাদের জীবনগীতি অন্য যন্ত্রের সাহায্যে বাজিতে থাকে, তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না। বাতাসের বেগটার বাহিরে যে দম্‌-আট্‌কা পড়িবার একটা সঙ্কট-স্থান আছে, তাহা তাহাদের চক্ষে সত্য এবং পাকাপাকি হইয়া পড়ে তখনই—যখন তাহারা অবস্থার গতিকে আপনার সমস্ত পুঁজিপাটা লইয়া সেখানে যাইয়া উপস্থিত হয়। হঠাৎ এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া কানাইলালের বিচার-বুদ্ধি ও হিতাহিত জ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সে কেবল অপরের স্কন্ধে ভর করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল। সে কোনোদিন এমন সন্ধান পায় নাই যে, কিরূপে আপনার বিধি-ব্যবস্থাকে নিজের নিয়মে মিলাইয়া লইতে হয়।

গঙ্গাবক্ষের ঢেউগুলি নাচিয়া-নাচিয়া তাহাকে যেন পুরুষকারের ইঙ্গিত জানাইয়া আপনাদের গন্তব্যপথে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। গঙ্গার পুলের উপর দিয়া পিপীলিকার শ্রেণীর ন্যায় অবিরাম জনস্রোত আপন-আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চলিয়াছে। তাহারাও যেন কটাক্ষ করিয়া যাইতেছে যে, "আপনার ব্যক্তিত্বকে অন্যের হাতে বিলাইয়া দিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রের সদর-দালানে পঙ্গুর মতো বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মায়ার বোঝা মস্তকে

লইয়া শক্তি অপচয় করিলে নিজেকেই নির্জীব করিয়া ফেলিবে।” সে মনে মনে বলিতে লাগিল “ইহারা এমন অন্যায় ইঙ্গিত করিতেছে কেন? বোধ হয়, ইহারা মাতৃস্নেহ পায় নাই। তাই কল্যাণময়ী জননীর পদতলে শক্তির অপচয় করিবার যোগ্যতা পাওয়া যে কত বড় শক্তিলাভ তাহা ইহারা জানে না।”

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাহার মনে একটা অভিমানও জাগিয়া উঠিল। তাহার দৃষ্টির বাহিরে, সম্পূর্ণ ইচ্ছার প্রতিকূলে যাহা সংঘটিত হইল, তাহার কারণ যাহাই হউক না কেন—মহেশ্বরীর অপরাধের সন্ধানে তাহার চক্ষু-দুটি সর্ব্বপ্রথমে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সে ভাবিল, “বড়-মা কি একটা গাড়ীও অপেক্ষা করিয়া যাইতে পারিলেন না? ভাবিয়াও দেখিলেন না যে, এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে আমি কোথায় যাইয়া দাঁড়াইব?” একবার তাহার মনে হইল,—হয় ত তারিণীচরণই কৌশল করিয়া এই বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে। কিন্তু তাহার বড় মায়ের উপর যে কেহ শক্তি পরিচালনা করিতে পারে, এ-বিশ্বাসও তাহার মনে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। তখন মহেশ্বরীর উপর অভিমানটা আবার প্রবল হইয়া উঠিল।

চিত্তের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব শিক্ষার দ্বারা বিকশিত হয়। কিন্তু যতক্ষণ তাহাতে সংযম স্পর্শ না করে, ততক্ষণ তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করে না। মহেশ্বরীর সুশিক্ষায় কানাইলাল চলিবার একটা পদ্ধতি—একটা ইসারা পাইয়াছিল মাত্র। কিন্তু নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে ক্রমাগত চলিতে-চলিতে যতক্ষণ সে সংযম না শিক্ষা করিতেছে ততক্ষণ তাহার চিত্ত নাচিয়া-দুলিয়া যে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাই সকল সুচিন্তা ও সুযুক্তি দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া মহেশ্বরীর উপর অভিমানটাকেই সে সকলের অপেক্ষা বড় করিয়া তুলিল।

কানাইলাল ভাবিল, “বড়-মা যখন আমাকে এই বিপুল বিশ্বের

মাঝখানে অসহায় করিয়া ফেলিয়া যাইতে পারিলেন, স্নেহময়ী জননীর চিত্তের সেই অবারিত দ্বারটিতে যদি কবাটই পড়িল, তবে আমি বলপূর্ব্বক সে দ্বার ঠেলিয়া সেখানে ঢুকিয়া আর আমার স্নেহের পুঁজি বাড়াইতে যাইব না।" তাহাব নেত্র হইতে অবিরল-ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অভিমানের বস্তু সম্মুখে থাকিলে উভয়ের মন কষাকষির মধ্যেও আনুগত্য বা ত্যাগস্বীকাবের একটা দম্‌কা হাওয়ায় আবাব দুটিকে মিলাইয়া-মিশাইয়া দিতে পাবিবে এইরূপ একটা সন্ধিব কল্পনায় মনকে যেন একটু আশ্বস্ত রাখে, কিন্তু অভিমান নগ্নমূর্ত্তি ধবিলেই প্রাণটা হাহাকাবে পূর্ণ হইয়া যায়। মহেশ্বরার অবিদ্যমানে তাঁহাবই সম্বন্ধে কুটিল কল্পনায় কানাইলাল আপনার মনের মধ্যে যে আবর্ত্ত রচনা কবিয়া তুলিতেছিল, সেই আবর্ত্তে পড়িয়া সে নিজেই হাবুডুবু খাইতে লাগিল। এবং যে তাহার অন্তরের দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে, তাহাব সেই নিষ্ঠুবতাকে চক্ষের সম্মুখে প্রতিফলিত কবিয়া দিয়া সমস্ত গুণ-গবিমাকে হাল্‌কা করিয়া দিতে না পারায় তাহাব অন্তবের অস্বস্তিটা দ্বিগুণ করিয়া তুলিল।

যখন সন্ধ্যা হইল তখন সে বুঝিল, এ-ভাবে বসিয়া কাটাইলে আর চলিবে না। তাহাকে আহার্য্যের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এত লোক যাইতেছে আসিতেছে, কেহ ডাকিয়াও ত জিজ্ঞাসা কবে না! সে কাহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কবিবে? এই সংসার-পথের নূতন পথিকের মনে আতঙ্কের সঞ্চাব করিয়া দিয়া যখন বাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, তখন সে ধীরে-ধীরে ষ্টেশন-অভিমুখে চলিল; এবং গণপতির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, পীড়িতা স্ত্রীকে লইয়া তখনও পর্য্যন্ত তিনি সেইখানে অবস্থিতি করিতেছেন।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছেন?"

গণপতি কহিলেন, "একটু ভালো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখানে ত আর এভাবে রাখতে পারা যাচ্ছে না। রেল-ষ্টীমারে নিয়ে গেলেও কষ্ট পাবে। নৌকো হ'লে ভালো হ'ত। আমি নড়্‌তে পার্‌ছিনে! কে-বা এসব ক'রে দেয়—"

কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "ঘাঁটাল পর্য্যন্ত যেতে কত ভাড়া নেবে? আমি দে'খে আসি যদি ভাড়া কর্‌তে পাবি।"

গণপতি কহিলেন, "ভগবান্ আপনাকে সুখে রাখুন। ভাড়া বোধ হয় পাঁচ-সাত টাকা নিতে পাবে। ঘাঁটাল পর্য্যন্ত যদি না যেতে চায়, বাণীচক পর্য্যন্ত গেলেও সেখানে নৌকো পাবো।"

কানাইলাল চলিয়া গেল; এবং অনতিবিলম্বে আট টাকা ভাড়া সাব্যস্ত করিয়া একজন মাঝিকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল।

কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "ঘাঁটাল পর্য্যন্ত আপনাদের সঙ্গে আমাকে কি আবশ্যক হবে ব'লে মনে করেন?"

গণপতি পরম আপ্যায়িত হইয়া কহিলেন, "তা হ'লে খুবই ভালো হয়! জলপথে রোগী নিয়ে একাকী যাওয়া! আমি বল্‌তে সাহস পাইনি। কিন্তু আপনার অসুবিধা হবে না ত? আপনার মা কি সম্মতি দেবেন— আপনারা না কোথায় যাচ্ছিলেন?"

কানাই একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া লইয়া কহিল, "আমার মা তেমন নন্! তাঁর কাছে আপন-পর ভেদ নেই; বরং আপনাদের এই অসময়ে সাহায্য কর্‌তে না পার্‌লে তিনি দুঃখিত হবেন।"

গণপতি কহিলেন, "সে আপনার ব্যবহারেই বুঝ্‌তে পেরেছি। সন্তান দেখ্‌লেই বোঝা যায় জননী কেমন!"

কানাইলাল তখন একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া সকলকে লইয়া নৌকায় যাইয়া উঠিল। এই বয়সেও যে মহেশ্বরীর স্নেহাঞ্চলের নিম্নে সেই

আড়াই বৎসরের বালকটির মতো পরম সুখে বাস করিতেছিল, সে আজ সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের সঙ্গে কোন্ সুদূর দেশে ভাসিয়া চলিল!

কানাইলাল নিঃসম্বল। টাকা-কড়ি সমস্তই মহেশ্বরীর নিকটে ছিল। টাকা পয়সা হাতে থাকিলেও সে হয়ত দেশের বাড়ীতে ফিরিয়া যাইত না। মহেশ্বরী একদিন বলিয়াছিলেন যে,—সে বাগ্দীর ছেলে, তাহার বাড়ী উত্তরপাড়ায়। সে-কথাটা তখন তাহার নিকট যত ছোটো বলিয়া ঠেকিয়াছিল, এখন তাহা তত বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইল। স্নেহের বন্ধনে এমন একটু ফাঁক না থাকিলে, কে কবে সন্তানকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারে? কানাইলাল তাই কোন ইতস্ততঃ না করিয়াই নৌকায় উঠিল।

তখন রাত্রি হইয়াছে। কানাইলাল নৌকার ছাদের উপর বসিয়াছিল। এই মাতৃহারা বালকের দুঃখে আকাশের তারাগুলি যেন সেদিন অত্যন্ত নিষ্প্রভ হইয়াই দেখা দিয়াছিল। তাহার বেদনাময় প্রাণের সুরে ও রঙে যেন সমস্ত জগৎখানি অনুরঞ্জিত হইয়া অত্যন্ত বিষন্ন-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। কানাইলাল যতই মহেশ্বরীকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চাহিতেছিল, ততই তাঁহার নির্ম্মল স্নেহের একটা নিগূঢ় প্রতিধ্বনি তাহার অন্তরে ধ্বনিত হইয়া দুঃখটাকে অতি তীব্র করিয়া তুলিতেছিল; এবং তাহার চঞ্চল মনকে সংযমের দ্বারা বাঁধিয়া সু-ধার অস্ত্রে চক্ষের ছানিটা তুলিয়া ফেলিয়া দিতে পারিলে, মহেশ্বরীর প্রকৃত রূপ দৃষ্ট হইবে, এইরূপই যেন কে ইঙ্গিত করিতেছিল। বলাই শৈলবালার পেটের সন্তান; যে স্নেহ সে মাতৃস্নেহকেও পরাভূত করিয়াছে, তাহাকে ভুলিব বলিলে কি ভুলিতে পারা যায়? সে ছাদের উপর শুইয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল,—ঘুমাইয়া পড়িলে কোমল হস্তের বেষ্টনে বক্ষের মধ্যে আর বুঝি কেহ তাহাকে নিরাপদে রাখিবে না! সে কোথায় চলিয়াছে—কেন চলিয়াছে—

আর বুঝি তাহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না! যে সময়টা ভাবনারও অন্ত থাকে না, কোনো পথও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সে সময় বিবেক ও বুদ্ধি অতি দূরে গিয়া সরিয়া দাঁড়ায় এবং নিজেদের ঘরের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিজেরাই হাসিতে থাকে। কানাইলাল বিবেক বুদ্ধি হারাইয়া, স্রোতের তৃণ যেমন ভাসিয়া যায়, কোথায় যায়, জানে না, সেইরূপই সে ভাসিয়া চলিয়াছে। তাহার অন্তরের মধ্যে অভিমান, দুঃখ ও ক্ষোভ এমন ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল যে, তথায় তিল রাখিবারও স্থান ছিল না, অথচ সে যে দিকে চক্ষু ফিরায়, দেখিতে পায়, সমস্ত অন্তরটা জুড়িয়াই তাহার সেই মহেশ্বরী মা! সে অচৈতন্য হইয়া ছাদের উপর পড়িয়া রহিল।

নৌকার মধ্যে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুটি কিছু খেলেন না? খাবার রয়েছে—আপনাদের দেবো?"

গণপতি ব্যস্তভাবে কহিলেন, "তাইত, সেকথা দেখি ভু'লেই গেছি! কানাইবাবু!"

দুই-চারিবার ডাকিতে কানাইলাল উত্তর করিল।

গণপতি কহিল, "সঙ্গে কিছু জলখাবার রয়েছে, একবার নীচে আসুন না।"

কানাই বলিল, "আমার শরীরটা তত ভালো নেই, রাত্রে আর কিছু খাবো না।"

গণপতি বাহিরে আসিলেন; এবং কানাইলালকে কিছু খাওয়াইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কানাই বলিল, "আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আজ আর আমার জলবিন্দুও খেতে ইচ্ছা নেই।"

গণপতি কহিলেন, "তা আপনি ভিতরে আসুন, বাইরে একলাটি ব'সে রইলেন!"

কানাই কহিল, "আপনি কেন কুণ্ঠিত হচ্ছেন? আমি এখানে বেশ আছি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাড়ীতে যাইয়া শৈলবালাকে ভিন্ন সুখেন্দু আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না। কানাইলাল কোথায় গেল—কি হইল ইত্যাদি নানারূপ দুর্ভাবনায় তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক তিনি আব কালবিলম্ব না কবিয়া তাঁহার পিসতুতো ভাই গোকুলকে সঙ্গে দিয়া শৈল-বালাকে কলিকাতায় মহেশ্বরীব নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

শৈলবালা আসিয়া দেখিল, মহেশ্বরীর আহার নাই, নিদ্রা নাই, শরীরও নিতান্ত শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি তাঁহার সজল চক্ষু-দুটি রাস্তার জনস্রোতের উপর নিবদ্ধ করিয়া দিবারাত্রি বসিয়া থাকেন। শৈল কহিল, "মা! অমন ভেবে-ভেবে শরীর কাহিল কর্‌ছ, সে নিশ্চয়ই আস্‌বে, তোমাকে ছেড়ে থাকৃতে পারবে না। সেয়ানা হয়েছে, নিশ্চয়ই দেশেব বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হবে।

মহেশ্বরী কহিলেন, "সে আসুক না আসুক সে জন্য ভাবিনে। যে কালব্যাধির সম্মুখে পড়েছিল—তাই ভাবি। আর যদি শুনৃতে পেতাম যে সে একজনা মা পেয়েছে, তা হ'লে আর ভাব্‌নার কিছু ছিল না। তা'র যে সংসার-বুদ্ধি কিছুই হয়নি! যদি প্রাণে বেঁচে থাকে—না খেতে পেয়ে হয়ত দ্বারে-দ্বারে ঘু'রে বেড়াচ্ছে। এমন রাতারাতি সে যে অকূল সমুদ্রে পড়্‌বে, তা ত মা কোনো দিন ভাবিনি।"

শৈল কহিল, "অগতির গতি দীনবন্ধুই তা'কে দেখ্‌ছেনে। দুঃখীদের থেকে আপনাকে আল্‌গা ক'বে নেবার ঝোঁক যদি বিধাতার থাকৃত, তা হ'লে দুঃখী লোক কি বাঁচ্‌তে পেত?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সে ঠিক কথা। কিন্তু দুঃখীলোকের শক্তিটা ভগবান্ বেশী ক'রেই পরীক্ষা করেন। মানুষ কত বড় বলিষ্ঠ হ'লে তবে শক্তি-পরীক্ষায় জয়ী হ'তে পারে। সে যে মা, মাথার বোঝা বইতে পারে না—মনের বোঝা কি বইতে পার্‌বে?"

শৈল কহিল, "কিন্তু মা! ভগবান্ ত কা'কেও প্রাণে মেরে শক্তি পরীক্ষা করেন না! সে তোমার কাছে যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছে, তা'তে নিশ্চয়ই সে জয়ী হ'তে পার্‌বে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "মানুষ তা'র সত্যকার অধিকার যতদিন বুঝ্‌তে না পারে, ততদিন একটা ভয়ও আছে। তখন একটা বিপক্ষ শক্তি তা'কে এমন স্থানেও নিয়ে যেতে পাবে যেখানে আত্মনাশই প্রাণ জুড়াবার সহজ শক্তি ব'লে প্রলোভন দেখায়।"

মহেশ্ববীর প্রাণে যে কত আশঙ্কা, শৈল একে-একে সমস্তই বুঝিতে পারিল। সে কহিল, "কিন্তু এই সুবৃহৎ সহরের এক-কোণে প'ড়ে থাক্‌লে, সেও বা কি ক'রে আমাদের খোঁজ পাবে, আমরাও বা কি ক'রে পাবো?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তা বুঝি মা! কিন্তু আমার প্রাণের নিধি যে এইখানেই হারিয়েছে। তাই দেশে যেতে মন চায় না। এইখানেই জনসমুদ্রের মাঝে চোখদুটো পাতিয়ে রাখ্‌তে ইচ্ছে হয়।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমার উপর যে তা'র কত বড় জোর—সে তোমবা জানো না। যে-ধাক্কাটা লেগেছে তা আমি সাম্‌লাতে পার্‌ছি—কিন্তু তা'র যে সে-শক্তি নেই!"

শৈল কহিল, "তুমি মিছে-মিছে কেবল খারাপটাই ভাব্‌ছ। সে হয়ত সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে গেছে। তাঁরা সুস্থ হ'লে চলে আস্‌বে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "মনে এইরূপ একটা সামঞ্জস্য আন্‌তে না পার্‌লে

মানুষের প্রাণটা ফেটে চ'টে খান্‌-খান্‌ হ'য়ে পড়্‌ত। আমিও তাই ভাবৃছি। কিন্তু সে-ভাবনাটা বড় ক'রে ভাবৃতে পারিনে।"

শৈলবালা আর কিছু বলিল না।

কানাইলালের বিচ্ছেদ বলাইএর অন্তরেও বাজিয়াছিল। সে একাকী প্রতিদিন দুবেলা যতটা পারিত খোঁজ করিয়া আসিত; তারিণীচরণের বড় সাহায্য পাইত না। গোকুল আসিলে তাহার অনেকটা সুবিধা হইল। গোকুলকে সঙ্গে লইয়া সে প্রত্যহ নানা স্থানে ঘুরিয়া আসিত। কিন্তু যাহাকে সে চায়, তাহাকে কে যেন অত্যন্ত গোপন-দেশে লুকাইয়া রাখিয়াছে! বালকের হৃদয়-ভরা আগ্রহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কোনো আবশ্যকতাই সে বোধ কবিতেছে না। সে প্রত্যহ কত আশা লইয়া বাহির হইত! আজ বুঝি তাহার কানাই-দাকে আনিয়া তা'র বড়-মার হাতে দিতে পারিবে। তাহার সে আশা পূর্ণ হইত না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে বহন করিয়া লইয়া সে ঘরে ফিরিত।

কানাইলালের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পর হইতে গঙ্গাস্নানেব লালসাট মহেশ্বরীর অন্তরে অত্যন্ত বলবতা হইয়া উঠিয়াছিল। একটি দিনও ফাঁক যাইত না। তিনি প্রত্যহ বলাইকে সঙ্গে লইয়া স্নানে যাইতেন। কিন্তু ঘাটে উপস্থিত হইলে স্নান-আহ্নিক ভুলিয়া যাইতেন। শুধু পুলের উপর দিয়া যে-সকল লোক যাতায়াত করিত, তাহাদের উপর তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষু-দুটি স্থাপিত করিয়া তিনি সোপানের উপর নীরবে বসিয়া থাকিতেন। বেলা বাড়িয়া যাইত, হুঁস থাকিত না। কত লোকে তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া হাসিত—জ্ঞান নাই,—প্রাণ-পুত্তলির অপেক্ষায় তাঁহার মন ও প্রাণ তন্ময় হইয়া থাকিত। এইরূপে সূর্য্যদেব যখন মাথার উপর উঠিতেন, তখন তিনি শূন্য বক্ষ লইয়া গৃহে ফিরিতেন।

এদিকে গোকুল আসিয়া উপস্থিত হইলে তারিণীচরণও দিন কতক

কানাইলালের খুব অনুসন্ধান করিল। কেন না সেই বাঙ্গী ছোঁড়াটা তখনও যদি আত্মগোপনের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তবে তাহার সেতুবন্ধ যাওয়ার আর কোনো বাধা হয় না। কিন্তু যখন তেমন কোনো সুলক্ষণ সে দেখিতে পাইল না, অথবা মহেশ্বরীর হঠাৎ ঘরে ফিরিবারও সম্ভাবনা বুঝিল না, তখন সে ক্ষুণ্ণমনে দেশে প্রত্যাগমন করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কানাইলালের এখন নানা প্রয়োজনের সহিত সম্পর্ক পাতাইতে হইতেছে। সুখ-সুপ্তির কক্ষ ছাড়িয়া সে সহসা এমন-এক শূন্য স্থানে আসিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে যে, সেখানে আহার্য্য নাই—আশ্রয় নাই—বল-ভরসা নাই! আছে শুধু সুখ, শান্তি, আরাম ও বিরামেব অন্ত্যেষ্টির বিপুল আয়োজন—মান-অভিমানের তাড়না, আর মর্ম্মভেদী বেদনা ও হাহাকার।

গণপতিরা ঘাঁটালের গৃহে উপস্থিত হইলে নলিনী সকাল-সকাল রান্না-বান্না সারিয়া গণপতি ও কানাইলালের জন্য ভাত বাড়িয়া কানাই-লালকে ডাকিতে আসিল। কানাই বাহিরের ঘরে একখানি জীর্ণ তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িয়া তাহার বিপ্লব-শ্রান্ত হৃদয়টি শান্ত করি-বার চেষ্টা করিতেছিল। নলিনী আসিয়া তাহাকে ভাত খাইবার জন্য ডাকিয়া যখন তাহার নির্জ্জন চিন্তার মধ্যে একটা গোলমাল তুলিয়া বসিল, তখন সে সহসা মুখ ফিরাইয়া একবার জিজ্ঞাসা করিল—

"এরই মধ্যে রান্না হ'য়ে গেল?"

নলিনী কহিল "হুঁ!"

"দিয়েছ নাকি?"

"হুঁ।"

"কোথায়?"

"রান্নাঘরে। বাবাকে আর আপনাকে।"

কানাইলাল তাহার মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল। এবং কত দিনের

একটা ক্ষীণ স্মৃতি মনের মধ্যে সহসা ফুটাইয়া তুলিয়া তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। নলিনীর ডাকে সে যেন ঝটপট্ উঠিয়া যাইয়া খাইতে বসিতে পারে না। তাহার এই ঝকমারির জীবনে যেন অনেক কথাই ভাবিয়া লইবার আছে। মহেশ্বরী তাহাকে নিজের হাতে মাখিয়া-জুখিয়া খাওয়াইয়া দিলেও সে কখন তাঁহাদের রান্নাঘরে ঢুকিবার অধিকার পায় নাই। তার পর সে-বার শাস্তির শ্বশুরালয়ে তাহার উচ্ছিষ্ট লইয়া একটা লড়াই উঠিয়া, সে সংসারে তাহার অধিকারের যে মাত্রা নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল, কানাইলালের হঠাৎ মনে উঠিল, সে-মাত্রাটা বুঝি বিশ্ব-সংসারের সহিত একই সম্বন্ধে জড়িত। গণপতিরা না জানিলে না শুনিলে কি হয়, সে লুকোচুরি খেলিয়া শয়তানের রঙে আপনাকে চিত্রিত করিতে পারিবে না। তাহাকে যখন বুঝাইয়া দিবার কেহ নাই,—সে কোন্‌খানে পা ফেলিবে—কোন্‌খানে ফেলিবে না; তখন তাহাকে দূরে-দূরেই থাকিতে হইবে। সে নলিনীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "আমার শরীরের গ্লানি এখনও যায়নি, কিছু খাবো না।"

নলিনী কহিল, "কাল কিছু খেলেন না, আজও খাবেন না? রুটি ক'রে দেবো?"

"না দিদি, দেখ্‌ছ না বিছানায় প'ড়ে রয়েছি—আমার ভারি অসুখ বোধ হচ্ছে।"

নলিনী কহিল, "কিছু না খেয়ে কি লোকে থাক্‌তে পারে! একটু সুজি ক'রে দিই?"

কানাই বলিল, "না, সত্যিই বল্‌ছি, আমি এখন কিছু খেতে পার্‌ব না। ভাল বোধ করি ত তখন তোমায় ডেকে বল্‌ব।"

নলিনী যাইয়া গণপতিকে কহিল। গণপতি অন্নের থালা সম্মুখে

লইয়া কানাইলালের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কি কানাই বাবু, কিছুই খাবেন না না কি। জ্বর-জাড়ি হয়নি, ত, ববং দু-চারখানা রুটি ক'রে দিক।"

কানাই বলিল, "আপনারা সবাই ব্যস্ত ক'রে তুলছেন। আমার যখন দরকার হবে চেয়ে নিয়ে খাবো। এখন একটু ঘুমিয়ে দেখি যদি শরীরটা ভালো হয়।"

গণপতি কহিলেন, "আমি ত খেয়েই বের হ'য়ে যাচ্ছি। লজ্জা কর্‌বেন না যেন। নলিনীকে ডেকে বল্‌বেন। যা হয় কিছু খাবেন। সারাদিন উপোষ ক'বে থাকবেন না।"

তা'ব পর গণপতি আহাব কবিয়া কার্য্যস্থলে চলিয়া গেলেন।

কানাইলাল দেখিল, তাহাব চলিবার পথে কোনো পথটাই পরিষ্কাব নাই। সকলগুলিই নির্দ্দয়ভাবে আটকাইয়া দিয়া কে যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া শুনাইয়া দিতেছে,—পথ নাই! পথ নাই!

নানারূপ দুশ্চিন্তা কবিতে করিতে কানাইলাল যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতব হইয়া পড়িল, তখন সে নলিনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে একটা উনুন পেতে রান্নার ব্যবস্থা করা যায়?"

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"রাঁধ্‌তাম।"

নলিনী একটু হাসিয়া কহিল, "কেন আমাদের হাতে খাবেন না বুঝি?"

কানাই সঙ্কোচের সহিত বলিল, "আমি নিজে রেঁধে-বেড়ে খেলেই ভালো থাকব।"

"তাই বুঝি ও-বেলা খেলেন না? বরাবরই কি নিজে রেঁধে-বেড়ে খান্?"

"তা খাইনে, এখন থেকে খাবো।"

"আপনার গলায় কি পৈতে আছে?"

"তা নেই। আমি ত বামুন নই।"

"তবে কি?"

"মজুমদার।"

"তবে আমাদের হাতে খাবেন না কেন?"

"হাতে খেতে বাধা নেই। আমাকে কিছুকাল এইভাবে চল্‌তে হবে।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "যা বল্‌লাম তা'র কোনো উপায় হবে?"

"দেখি মা'র কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।"

এই বলিয়া নলিনী চলিয়া গেল; এবং মহামায়াকে সকল কথা বলিল। মহামায়া কহিলেন, "কাল থেকে না হয়, তাই করবেন। আজ দু'দিন খাননি—আজ ঘরে খেলে পার্‌তেন।"

নলিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া কহিল, "আজকের দিনটা ঘরে খান—দু'দিন খান্‌নি, কাল থেকে রেঁধে বেড়ে, খাবেন।"

কানাই দেখিল, যে সংশয়টা তাহার মনে জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে, তাহাকে এইরূপে থামাইয়া দিলে, এই নলিনী মেয়েটিই হয়ত একদিন-না-একদিন ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার করিয়া, যে-কারণে শাস্তির ননদিনী তাহাকে দিয়া সমস্ত ঢেঁকিশালাটা গোময়লিপ্ত করাইয়া লইয়াছিলেন, ঠিক সেই কারণেই নিজেদের মধ্যে একটা অনিষ্ট ঘটনা করিয়া তুলিবে। প্রথম হইতেই ছাড়া-ছাড়ি থাকিলে সকলের পক্ষেই মঙ্গল হইতে পারিবে।

সে কহিল, "না দিদি, আমি অকারণ কিছুই বলিনি। বোধ হয় সকল কথা জান্‌তে-শুন্‌তে পার্‌লে তোমরা সন্তুষ্ট হ'তে পার্‌তে। কিন্তু সে উপায় নেই।"

নলিনী কহিল, "তবে আমি উনুন তৈরি ক'রে দিই, আপনি সকাল-সকাল রাঁধুন—দুদিন খাননি।"

এই বলিয়া সে বাড়ীর ভিতর হইতে একখানি খন্তা লইয়া আসিল; এবং মাটি খুঁড়িয়া উপরে তিনদিকে তিনখানি ইঁট বসাইয়া অবিলম্বে একটি উনুন তৈরি করিয়া দিল। তা'র পর একখানি থালায় করিয়া চা'ল, ডা'ল, নুন, তেল, দুটি লঙ্কা, চারিটি আলু, একটু হলুদের গুঁড়া ও একঘড়া জল আনিয়া দিল। রাঁধিবার জন্য একটি পিতলের ডেক্ আনিয়া দিলে কানাইলাল বলিল, "একটা মেটে হাঁড়ি পেলে ভালো হয়। এসব আবার মাজা-ঘষা কর্‌তে হবে—হ্যাঙ্গামা আছে।"

নলিনী বলিল, "সে আমি ক'বে দেবো।"

কানাই কহিল, "না। এম্‌নি কত-কি কর্‌তে হবে। তুমি দেখ, যদি একটা হাঁড়ি পাও।"

নলিনী তখন বাড়ীর মধ্যে যাইয়া সিকার উপর টাঙানো যেসব হাঁড়ি নানাবিধ দ্রব্য উদরে লইয়া বিরাজ করিতেছিল, তাহার মধ্য হইতে একটি বাছিয়া বাজাইয়া লইয়া চলিয়া আসিল; এবং চুল্লীতে আগুন ধরাইয়া দিল। বলিল, "ভাতটা চাপিয়ে দিন—আমি মশলা বেটে আনি।"

কানাই কহিল, "ডা'ল আর রাঁধ্‌ব না—আলু-ভাতে দিলেই হবে।"

নলিনী বলিল, "শুধু আলু-ভাতে দিয়ে কি খাওয়া যায়? ডা'লটা রাঁধুন—কতক্ষণ লাগ্‌বে!"

কানাই কহিল, "কিচ্ছু দরকার নেই। আলুভাতে দিয়েই বেশ খাওয়া হবে।"

নলিনী কিছু না বলিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল; এবং একখানি

নেকড়া আনিয়া ডালগুলি লইয়া একটি পুঁটুলি বাঁধিল। বলিল, "ভাতের মধ্যে ছেড়ে দেবেন। আলুভাতে আর ডা'লভাতে হবে, আর একটু দুধ এনে দেবো।"

কানাই তখন ভাতের হাঁড়িতে নলিনীর নির্দেশমতো জল দিয়া চা'ল আলু এবং ডা'লের পুঁটলিটি তাহাতে ছাড়িয়া দিল। নলিনী বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ বাদে সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, উনুনে জ্বাল হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। ভাতের হাঁড়িটার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া সে কহিল, "করেছেন কি ? যে জ্বল্‌ছে !—কাঠ-ক'খানা তু'লে ফেলুন। কাঠিতে দুটো ভাত তু'লে টি'পে দেখুন ত—ভাত বোধ হয় হ'য়ে গেছে—গ'লে গেল যে!"

কানাইলাল ভাত লইয়া টিপিয়া দেখিল। বলিল, "হ'য়ে গেছে।" সে তাড়াতাড়ি বেড়ি দিয়া হাঁড়িটা নামাইল। নলিনী কহিল, "নামিয়ে ফেল্‌লেন ? ফেন রইল যে, ফেনসুদ্ধ ভাত খাবেন কি ক'রে ? হাঁড়িটা চুল্লীর উপর তু'লে দিন। মুখে সরা চাপা দিয়ে মালসাটায় ফেন গেলে ফেলুন। বেড়িটা শক্ত ক'রে ধর্‌বেন। দেখ্‌বেন যেন স'রে এসে ভাত-সুদ্ধ গায়ে-পায়ে না পড়ে।"

ভাতের ফেন গালা হইলে নলিনী উঠিয়া যাইয়া বাগান হইতে দুটা কাঁচা-লঙ্কা তুলিয়া আনিল। বলিল, "কাঁচা-লঙ্কা না হ'লে ভাতে-পোড়া খেয়ে সুখ হয় না। থালাটায় ভাতগুলো ঢেলে ফেলুন। সরাতে আলু আর ডা'ল-ভাতে মেখে নেবেন।"

কানাই বলিল, "থালাটা আর এঁটো কর্‌ব না। সাম্‌নেই ত কলার পাতা রয়েছে, একখানা কেটে নিলেই হবে।"

নলিনী হাসিয়া কহিল, "ওঃ! আপনি মোটেই গায়ে সেক-তাপ লাগাবেন না—অথচ রেঁধে খেতে চান!"

কানাই বলিল, "সেই তো ভালো। পাতাটা ফে'লে দিলেই চু'কে যাবে।"

নলিনী তখন নিজেই একখানা পাতা কাটিয়া আনিয়া দিল। তা'র পর সে যেমন-যেমন দেখাইয়া দিল, কানাই সেইরূপ করিয়া রাঁধিবার পাত্রগুলি ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দিল। তা'র পর খাইতে বসিল। নলিনী কিছু দুধ ও একটু গুড় আনিয়া দিল। বলিল, "দুধ বড় কম হ'ল। একটা গরু মোটে,—বাবার আবার দুবেলা একটু-একটু দুধ নইলে খাওয়া হয় না।"

কানাই কহিল, "দুধ না হ'লেও চল্‌ত। গরম-গরম ভাতে একটা ভাতে-পোড়া হ'লেই যথেষ্ট,—তাই দু-দুটো হ'ল। আর চাই কি?"

"সে সন্ন্যাসী মানুষের চলে। দুইতিন তরকারী না হ'লে বাবা দেখি মুখ শিঁট্‌কতে লাগেন।"

নলিনীর এই ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ ভাব সন্ধানে-সন্ধানে যেন কানাই-লালের কোন্ জমাট-বাঁধা স্মৃতির দুয়ার অল্পে-অল্পে খুলিয়া দিতে লাগিল। একটা রুদ্ধ ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস চাপিয়া লইয়া কানাইলাল চক্ষু দুটি একবার মুছিয়া লইল।

ইতিমধ্যে গণপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এইসমস্ত দেখিয়া কিছুকাল বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কানাই-বাবু, এসব হয়েছে কি?"

কানাই হাসিয়া কহিল, "স্বপাকে খেলাম—এই-ই ভালো।"

গণপতি মেয়েকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "ভাত ছিল না বুঝি? তা তোরা সকাল-সকাল দুটো রেঁধে দিতে পারিসনি?"

নলিনী মুখ কঁচুমাচু করিয়া কহিল, "উনি শুন্‌লেন না যে! যতদিন থাক্‌বেন নিজেই নাকি রেঁধে-বেড়ে খাবেন।"

গণপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই নাকি কানাই-বাবু? কেন এমন স্থির করেছেন?"

"কেন—সে-কথা বুঝিয়ে বল্‌বার অধিকার আমি এখনও পাইনি। এ বেশ হবে, আপনারা কিছু মনে কর্‌বেন না।"

"আপনি এ-বড় লজ্জার মধ্যে ফে'লে দিলেন! সত্যিসত্যি আপনি কারুর হাতে খান না না কি?"

"তা খাই। কিন্তু এখন থেকে কেন খাবো না সেকথা বুঝিয়ে বল্‌বার মতো আমার কিছু জানা নেই। আপনি কাপড়-চোপড় ছাড়ুন গিয়ে। এইত রান্না-বান্না ক'রে খেলাম, কোনো কষ্টই হয়নি।"

গণপতি চলিয়া গেলেন।



অষ্টম পরিচ্ছেদ

গণপতির স্ত্রীর নাম মহামায়া। ইনিই কলিকাতার ষ্টেশনে পীড়িতা হইয়াছিলেন। সাংসারিক জ্ঞান কানাইলালের আদৌ ছিল না। মহামায়াকে ঘাঁটাল পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলে যে তাহার কর্ত্তব্য ফুরায়, তাহা সে বুঝিয়া দেখিল না। সে তাহার মহেশ্বরী মায়ের মতন যে আর একটি আশ্রয়স্থল পাইল, এইটাই সে বড় করিয়া বুঝিল। ভাবিয়া বসিল এই নবমাতৃ-গৃহেও তাহার বুঝি একটা অধিকার আছে। সপ্তাহ-কাল অতীত হইলেও যখন তাহার নড়িবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, তখন শেষে মহামায়াই একদিন নলিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "হু'বেলা খালি-খালি সিধে-পত্তর গুছিয়ে দিবি, একটু পড়াশুনা কর্‌গে না কানাই-বাবুর কাছে ?"

কানাইলালের গৃহস্থালীর সহযোগী হইয়া তাহার ভদ্র এবং শিষ্ট আচরণ নলিনীর বড় ভালো লাগিয়াছিল। সুতরাং তাহার নিকট পড়াশুনা করিতে নলিনার বেশ কৌতূহল জন্মিল। কিন্তু তাহার মাতা যে ঢংএ কথাটি পাড়িলেন, তাহাতে তাহার মনে বড় আঘাত দিল, ক্ষণিকের উত্তেজনায় তাহার মুখখানা কিছু লাল হইয়া উঠিল। সে কহিল, "গুছিয়ে-গাছিয়ে দিই ব'লেই কি প'ড়ে-শুনে মূল্য আদায় কর্‌তে হবে ?"

মহামায়া অবাধে বলিলেন, "তিন রাত্রের বেশী একজায়গায় বাস কর্‌তে হ'লে ঐরকম একটা-কিছু হাতে না থাক্‌লে উভয় দিক্‌কার মন অপরিষ্কার থেকে যায় যে।" সংসারের নিয়মমতন কথাই তিনি বলিয়াছিলেন।

নলিনী রাগিয়া কহিল, "তুমি অমন চেঁচামেচি ক'রে কথা বোলো না—

শুন্‌তে পাবেন যে! কিন্তু তুমি একথা কেমন ক'রে মুখ দিয়ে বের কর্‌লে মা? ষ্টেশনে ওষুধ না পেলে যে ম'রে যেতে? সে-কথা কি এরি ভিতর ভু'লে গেছ?"

মহামায়া কিছু নরম হইয়া বলিলেন, "তা নয়। বাবুটি একা-একা ব'সে থাকেন, পড়া-শুনো নিয়ে না হয় দুটো গল্প কর্‌লি তাঁর সঙ্গে। তোরও লাভ; তাঁরও লাভ।"

নলিনী কহিল, "সে পৃথক্‌ কথা। তা'তে ত আমি আপত্তি কর্‌ছিনে। কিন্তু তোমাব কথাব ধবণ-ধারণ দেখ্‌লে যে গা জ্ব'লে যায়।"

মহামায়া আর কিছু বলিলেন না।

নলিনীর মনেব উত্তেজনাটা আপনা-আপনি যখন থামিয়া গেল, তখন সে বই-দপ্তব লইয়া কানাইলালেব নিকট হাজিব হইল। কাবণ পড়িবার উৎসাহ তাহাব অসাধাবণ-বকম ছিল, কানাই শিক্ষক হইলে ত কথাই নাই। কানাই তখন বিছানাব উপর গড়াইতেছিল। নলিনীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "মাব সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কর্‌ছিলে বুঝি?"

নলিনী হাসিতে-হাসিতে গড়াইয়া পড়িল। বলিল, "মায়ে ঝিয়ে বুঝি ঝগড়া কবে? বেশ বুদ্ধি আপনাব!"

কানাই অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কথা বল্‌ছিলে কিনা —তাই।"

নলিনী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি সব শুন্‌তে পেয়েছেন? বেশ কান-দুটো ত আপনার। বলুন আমি কি বলেছি—মা কি বলেছেন?"

এই সরল জিজ্ঞাসার মধ্যেও বালিকা তাহার সন্দেহটি কাটিয়া-ছাঁটিয়া পরিষ্কার করিয়া তুলিবে এই প্রলোভন তাহার মনেব মধ্যে ছিল।

কানাই বলিল, "তুমি চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কথা বল্‌ছিলে না? তোমার

কথাটাই বেশী শুন্‌তে পেয়েছি। মা'র কথা অত শুনিনি। হাতে কি?"

"বই।"

"কেন?"

"মা বল্‌লেন আপনার কাছে পড়্‌তে। আপনি বেশ ভালো পড়াতে পারেন, না?"

বাড়ীর মধ্যের কোলাহলটি এইবার কানাইলালের নিকট বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল। সবটা না শুনিয়া এতক্ষণ তাহার মন নানা সন্দেহে আকুল হইয়া উঠিতেছিল। সে আপনার মানসিক অবস্থা অনেকটা দমন করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা কবিল, "কি বই পড়ো—দেখি?"

নলিনী দপ্তর খুলিয়া এক-একখানি বই তুলিয়া-তুলিয়া দেখাইতে লাগিল,—সাহিত্য ও নীতি—ভূগোল-প্রকাশ—স্বাস্থ্যতত্ত্ব—রচনা-শিক্ষা—পাক-প্রণালী—পূজা-বিধি—চাণক্য-শ্লোক।" একটু হাসিয়া কহিল, "অঙ্ক কিন্তু আমি মিশ্র-ভাগের বেশী পারিনে। আর আমাকে একটু-একটু ড্রয়িং শিখিয়ে দিতে হবে। বই একখানা আছে,—চায়ের পেয়ালা—বদ্‌না আরো কত-কি ছাই-ভস্ম—ও আবার কি আঁকে? আমি কিন্তু গাছ আঁক্‌ব—পাখী, মানুষ এইসব আঁক্‌ব। আর সমুদ্রের কোলে সূর্য্য ওঠে সেটাও আঁক্‌তে বেশ লাগে।"

কানাই কহিল, "আঁক্‌তে ত আমি ভালো জানিনে।"

নলিনী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "জানেন না? কেন আপনাদের শেখায়নি? আমি ঝাউ গাছ—বটগাছ—এইসব আঁক্‌তে পারি। একটা একটা গাছ এঁকে যখন শেষ ক'রে তুলি, তখন তা দে'খে মন কি-রকম মেতে ওঠে! বাবা—ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বসুমতী, বাঁশরী এইসব মাসিক-পত্র নেন্ কিনা—তা'রই ছবিগুলো আঁকতে আমার খুব মজা

লাগে! দে'খে-দেখে আঁক্‌তে যাই—একুড়ো-খেবুড়ো হ'য়ে যায়, শিখিনি কিনা!"

বালিকার সরলতায় কানাইলালকে আবার প্রফুল্ল করিয়া তুলিল। সে শিক্ষকতার দেনা-পাওনা হিসাবের কথা ভুলিয়া গেল। সে বলিল, "আচ্ছা, আমি যতটুকু পারি শিখিয়ে দেবো। দেখি, তুমি পড়াশুনা কেমন করো?"

কানাইলাল তখন এক-একখানি বই লইয়া নলিনীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তিনচারিটি অঙ্কও কষাইল। দেখিল বালিকা যাহা যতটুকু শিখিয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষ কিছু ত্রুটি নাই। সে তখন একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি স্থির করিয়া লইয়া নলিনীকে পড়াইতে আরম্ভ করিল। এবং তাহাব সুশিক্ষা-দানে নলিনী বেশ দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও মহামায়াব মন উঠিল না। নলিনী মেয়ে-সন্তান, পড়িলেও যা না পড়িলেও তা; তাহার পড়াশুনার বিনিময়ে কানাইলালের খোরাক জোগান দেওয়া, তাঁহাব নিকট সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিল না—লোক্‌সানই ঠেকিতে লাগিল।

নলিনী নিজেদের রান্না-বান্না করিত, তাহারই মধ্যে সময় করিয়া লইয়া কানাইলালের রান্নার আয়োজন করিয়া দিত। এবং এক-একবার আসিয়া দর্‌কার-অদর্‌কার, কিছু বিশৃঙ্খলা হইতেছে কি না দেখিয়া শুনিয়া যাইত। কেন না কানাইলালকে একমাত্র তাহারই পথ চাহিয়া থাকিতে হইত। মহামায়া মাঝে-মাঝে ঝাঁকুনি দিয়া উঠিতেন। একদিন অসহিষ্ণু হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "রান্না ফে'লে দুশোবার দৌড়াদৌড়ি না কর্‌লেই কি নয়? কি এমন গুরু-পুত্তুর এসে স্থান নিয়েছেন?"

নলিনী বলিল, "মা, তুমি একটু আস্তে কথা বল্‌তে পারো না?

আমি ছাড়া তুমি ত কর্‌বে না কিছু—তার জন্য তোমার অত ভাবনা কি? আমার কাজ আমি বুঝ্‌ব।"

মহামায়া বলিলেন, "তা ত জানি। কিন্তু এদিকে রান্না-বান্না যা কর্‌ছিস্‌ মুখেই যে দিতে পারা যায় না।"

গাল ফুলাইয়া মেয়ে বলিল, "কেন—কোন্‌ দিন রান্না খারাপ হ'ল? বাবা ত কিছু বলেন না, আমার মুখেও ত মন্দ লাগে না। আগে যেমন রাঁধ্‌তাম—এখনও তাই রাঁধি।"

"নিজের রান্না নিজে খেতে আর কবে খারাপ লাগে? কাঁঠালের বিচিগুলো নিজেরা না খেয়ে তুক্‌তুক ক'রে ভাঁড়ের মধ্যে লেপে-পুঁছে রেখেছি, সেইগুলি বের ক'রে দিয়ে আসা হয়েছে বুঝি?"

নলিনী বলিল, "রোজ-রোজ একঘেয়ে আলু-ভাতে দিয়ে কি লোকে খেতে পারে? ডা'ল রাঁধেন না—মাছ রাঁধেন না—এক ভাতে-পোড়া বই ত নয়? একটু দুধ দিতে, তাও বন্ধ ক'রে দিয়েছ।"

মহামায়া রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তোর জ্যাঠামো কর্‌তে হবে না বল্‌ছি। ফের যদি ফোঁপর-দালালি কর্‌বি ত আমি এ-সকল অতিথ্‌শালা ভেঙে দেবো। কোথায় একদিন ওষুধ এনে দেওয়া হয়েছে—তাই চিরদিন পুষ্‌তে হবে—নয়?"

নলিনী চক্ষু-দুটি বিস্ফারিত করিয়া কিছুকাল জননীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। বাহিরে কানাইলালের কর্ণে সকল কথাগুলিই প্রবেশ করিল। কানাইলালকে লুকাইয়া অন্তরের বিষের ভাণ্ডার শুধু মেয়ের সম্মুখে উদ্গীর্ণ করিতে বোধ হয় মহামায়ার ইচ্ছা ছিল না। সে শুনিতেছে মনে করিয়া তাঁহার কণ্ঠ উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল, মনে একটা হিংস্র আনন্দ জাগিতেছিল।

কানাইলাল জড়ের মতন নীরবে বসিয়া থাকিয়া ভাতের হাঁড়িটার

দিকে চাহিয়া রহিল। অব্যক্ত রোদন যখন বুকের মধ্যে দুর্নিবার হইয়া উঠিল, তখন সে একবার কাঁদিয়া লুটাইয়া প্রাণ ভরিয়া তাহার মহেশ্বরী-মাকে ডাকিতে চাহিল, কিন্তু তাহার মুখ ফুটিল না। সে কোনোরকমে মুখে চারিটা গুঁজিয়া বিছানার উপর যাইয়া শুইয়া পড়িল। চিরন্তন চিন্তায় যখন তাহার চক্ষু-দুটি বুজিয়া আসিল, তখন সে তাহার স্নেহের নির্ঝরিণী সেই মহেশ্বরী-মাকে সারা-গৃহখানি লইয়া বিদ্যুৎচমকের ন্যায় খেলিয়া-খেলিয়া বেড়াইতে দেখিতে পাইল। কিন্তু তাহাকে তাঁহার স্পর্শ হইতে দূরে রাখিবার জন্য, বায়ু যেন স্তরে স্তরে জমিয়া উঠিয়া সম্মুখভাগে পাঁচিল তুলিয়া দিয়া আপনার স্বচ্ছতায় মহেশ্বরীকে দেখাইয়া-দেখাইয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ বাদে নলিনী বই-দপ্তর লইয়া পড়িতে আসিল। সে হাসিয়া বকিয়া কানাইলালের মন হইতে অতীতের বিষাদময় ঘটনাটা যেন সরাইয়া দিতে লাগিল। নলিনীকে দেখিলে তাহার মনটা খুসী হইয়া উঠিত। নলিনী চক্ষু দুটি টানিয়া কহিল, "আপনার মুখ-চোখ্ দেখ্ছি একেবারে ব'সে গেছে—কি হয়েছে আপনার?"

কানাই হাসিয়া কহিল, "কি হবে—কিছুই ত হয়নি!"

ঘাড় বাঁকাইয়া নলিনী বলিল, "না হয়নি, চোখ-মুখ যা দেখাচ্ছে। আপনি একা-একা ব'সে ব'সে কি সমস্ত ভাবেন—আর শরীরের ক্ষতি করেন। এ আপনার ভারি অন্যায়।"

কানাই কহিল, "না না, আমার কিছু হয়নি। দেখি তোমার বই বা'র করো। অঙ্ক-কটা কষেছ ত? না কেবল গিন্নিপনা হচ্ছে?"

হাসিয়া নলিনী বলিল, "ওঃ! সে কখন্। আজ কিন্তু প্রথমে পড়্ব না—প্রথমে আঁকব। একটা টিয়া পাখী—বুঝ্লেন ত? দাঁড়ের উপর ব'সে রয়েছে, দু'পাশে দুটো খাবার বাটি থাক্বে। বাটির ছোলাগুলো আঁক্তে পারা যাবে ত?"

কানাই বলিল, "যারে। টিয়া পাখীর ছবি পেয়েছ ?"

"হাঁ—এই দেখুন মাসিক-পত্রে কেমন ছবি দিয়েছে! আচ্ছা রং কর্‌ব কি-দিয়ে ? কিচ্ছু রংটং নেই আমার।"

কানাই বলিল, "নাই বা থাক্‌ল। রং তৈরী ক'রে নিতে কতক্ষণ ? গাছের পাতা আর হলুদ দিয়ে গায়ের রং, আর লাল কালি দিয়ে ঠোঁট আর পা। দাঁড়টা কালো কালিতে কর্‌লেই হবে। আর এইসব মিশিয়ে-টিশিয়ে অন্য রংও করা যাবে।"

সেদিন পাখীটি সুচারুরূপে অঙ্কিত হইয়া যখন নলিনীর হাত হইতে নামিল, তখন বালিকার আনন্দ দেখিয়া কানাইলালের হৃদয়ের তাপ দূর হইয়া গেল। এই মেয়েটি এতটুকু বটে, কিন্তু ইহাকে খুসী করার ভিতর আনন্দ অফুরন্ত ছিল।

নলিনী পড়াশুনা শেষ করিয়া উঠিয়া গেলে কানাইলালের অন্তঃকরণ আবার বেদনায় আক্রান্ত হইয়া উঠিল। আনন্দের আলো যেন হঠাৎ নিভিয়া গেল। এইরূপে নানা আঘাতে কানাইলালের সাংসারিক জ্ঞান একটু-একটু জন্মিতেছিল। সে তখন ভাবিয়া দেখিতেছিল যে,—মহামায়া সুস্থ হইয়া উঠিবার পর বাস্তবিক তাহার আর সেখানে দাঁড়াইবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, অথচ দেখাইতে হইল যেন নিতান্তই প্রয়োজন। নহিলে সে যায় কোথায় ? একটা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা দেখিলে হয় না ? কিছু-কিছু উপার্জ্জন করিয়া ইঁহাদের হাতে আনিয়া দিতে পারিলে বোধ হয় সংসারের একজন হইয়া থাকিতে পারা যাইবে। তাহা হইলে আশ্রয় ছাড়িয়া আনন্দ ছাড়িয়া গৃহ ছাড়িয়া তাহাকে পথে-পথে ফিরিতেও হয় না, লোকের গলগ্রহও হইতে হয় না। ছোট্ট নলিনীর সেবা-যত্ন, আদর-আব্দারও পাওয়া যায়।

গণপতি লোকটি মন্দ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাকে প্রাতে ও মধ্যাহ্নে

দুই বেলাই কার্য্যস্থলে থাকিতে হইত। তিনি রাত্রিবেলা ক্লান্ত হইয়া আসিয়া শয্যা আশ্রয় করিতেন। যেন আর সংসারে কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে বড়-কিছু সংবাদ রাখিতে পারিতেন না। অগত্যা সেদিন তিনি গৃহে ফিরিলে কানাই নিজেই তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "আমি আর অকারণ এখানে ব'সে-ব'সে থাকি কেন? কল্‌কাতায় চ'লে যাই।"

গণপতি যেন বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন, বিশেষ কিছু কাজ আছে?"

"কাজ এমন-কিছু নেই।"

"তবে আর দিন-কতক থাকুন না। আমি একলা মানুষ, আপনাকে পেয়ে বেশ আছি। নলিনীও একলাটি থাক্‌ত, এখন সর্ব্বদা আনন্দে কাটাচ্ছে। কেবল নিজের হাতে কষ্ট ক'রে বেঁধে-বেড়ে খাচ্ছেন, তাইতে মনে বড় দুঃখ পাই।"

কানাই কহিল, "সে আমি বেশ আছি, ও সবের জন্যে কোনো কষ্টই নেই। তবে সময়টা আর যেতে চায় না। একটা কাজ-কর্ম্ম জু'টে গেলে আরও কিছুদিন থাকতে পারি। না হ'লে ব'সে-ব'সে আর কত কাল কাটানো যায়?"

গণপতি কিছু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "এ-কথা কেন বল্‌ছেন? কাজ-কর্ম্ম না জুট্‌লে যে থাক্‌তে পার্‌বেন না, হয়ত এমন-কোনো আচরণ আমাদের মধ্যে পেয়েছেন?"

কানাই হাসিয়া বলিল, "না, না; নলিনী যেরূপ ভায়ের মতন আদর-যত্ন করে, সে আমি জীবনে ভুল্‌তে পার্‌ব না। ওর মতন মেয়ে কম দেখেছি। শুধু-শুধু ব'সে কাটানো আমার নিজের পক্ষেই বড় অসহ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।"

গণপতি কিছুকাল ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আমি চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব।"

সত্বরই একজন মহাজনের ঘরে কানাইলালের ত্রিশ টাকা বেতনে একটি কর্ম্ম হইল। সে প্রথম মাসের বেতন গণপতির হাতে দিতে গেলে তিনি কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "আপনি আমাদের পরিত্যাগ কর্‌বেন— সেইপথেই চলেছেন দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমাদের যাতে গ্লানি হয়, আপনার নিকট তেমন ব্যবহার পাবো কোনো দিনই আশা করিনি। আপনাকে ততটা পরও কোনো দিন ভাব্‌তে পারিনি।"

কানাই কহিল, "কিন্তু বেশী পর ক'রেই ভাব্‌ছেন। আমাকে পরিবারের একজন মনে কর্‌তে পারেননি, তাই বাইরের লোকের সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন।"

গণপতি হার মানিয়া বলিলেন, "আপনার যুক্তি সত্য, খণ্ডন করা যায় না। কিন্তু আমি সরলভাবে যেটা নিতে পার্‌ছিনে, তর্কের দিক্ দিয়ে সেটা নিতে বাধ্য করালে বড় দুঃখিত হবো। আমাকে ওটা জোর কর্‌বেন না। আমার এই মেয়েটি নিয়েই যা কিছু দায়। তা-ছাড়া আমি যা কিছু উপায় করি তা'তেই সংসার বেশ চ'লে যায়। আপনার ঐ সামান্য আয়ের উপর লালসা কর্‌বার আমার কিছু কারণ নেই।"

গণপতি যখন টাকা লইতে সম্মত হইলেন না, তখন কানাইলাল তাহা ব্যয় করিবারও একটা সদুপায় স্থির করিল। সৎকার্য্যে ওই অর্থ ব্যয় করিয়া সে ঋণমুক্তির আনন্দ সংগ্রহ করিতে লাগিল। সে তথাকার স্কুল-পাঠশালাগুলিতে অনুসন্ধান লইয়া দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া লইল। এবং তাহাদের পড়িবার ব্যয়ভার নিয়মিতভাবে বহন করিতে লাগিল। অবশিষ্ট যাহা থাকিত, সে-অর্থ সে দীন দুঃখীকে দান করিত। নিজের জন্য কিছুই রাখিত না।

কিছুদিন পরে কানাইলালের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া মহাজন তাহার দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। বেলা দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত

তাহাকে মুন্সিবের কার্য্য করিতে হইত। সন্ধ্যাব সময় আসিয়া রান্না শেষ কবিয়া সে নলিনীকে পড়াইত। তবুও যে সময়টুকু সে ছাড় পাইত, তাহাতেই মহেশ্বরীব জন্য তাহার মন-প্রাণ হাহাকাব কবিয়া উঠিত। আপনাকে তাহাব এমন বাঁধা-ধবাব মধ্যে বাখাব প্রয়োজনই ছিল এই যে, তাহাব দুর্ব্বল মন যেন মুহূর্ত্তেব জন্যও বাহিবেব দিকে ছুটি না পায়।

তাহাব বেতনবৃদ্ধি হইলে সে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক আনাইয়া গবীব-দুঃখীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও ঔষধ দিতে আবম্ভ কবিতে লাগিল। আবশ্যক হইলে সে সেই সঙ্গে সঙ্গে বোগীব সেবা-শুশ্রূষাও কবিত। এবং তাহাব দ্বাবা যাহাব যেটুকু উপকাব হইতে পাবিত, সে ঘাটালবাসী সকলেবই সে-উপকাবটুকু উপযাচক হইয়া কবিয়া আসিত। অতি সামান্য ব্যক্তি হইলেও অত্যল্পকাল মধ্যে এইরূপে কানাইলাল ঘাটালেব মধ্যে বেশ সুপবিচিত হইয়া উঠিল।

মহামায়াও আবাব কানাইলালেব পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে প্রায়ই তাঁহাদেব মাছটা-তবকাবীটা সংগ্রহ কবিয়া আনিত। নিজ ব্যয়েই এ সকল কবিত। এবং গণপতিব অনুপস্থিতিকালে অভাব-অভিযোগেব কথা তাহাব কর্ণগোচব হইলে সে তাহাও পূবণ কবিত। এইরূপে ঘাটালে তাহার এক বৎসব অতীত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

কানাইলাল সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলে নলিনী একখানি রেকাবিতে যেদিন যেমন জুটিত তেম্‌নি জলখাবার সাজাইয়া লইয়া উপস্থিত হইত। কানাই জলযোগ করিবার পর নলিনীই জোগাড় করিয়া দিত, তবে রন্ধন হইত ; রন্ধন কার্য্য শেষ হইলে সে তাহার নিকট বসিয়া পড়াশুনা করিত। কানাই তাহাকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিত। এবং যত্নপূর্ব্বক পড়াশুনা বলিয়া দিত। এই ছোটো মেয়েটির সঙ্গই তাহার জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল।

সে দশটার সময় খাইয়া কাজে বাহির হইয়া গেলে নলিনী খাওয়া-দাওয়ার পর তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার কাপড় চোপড়, বই, কাগজ, কলম, পেন্‌সিল সমস্ত গোছাইয়া রাখিত। এবং ঘরটি ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কবিয়া আসিত। কানাইলালকে নলিনীও বড় ভালোবাসিত।

মহামায়াও ইদানীং কানাইলালকে খুব আদর-যত্ন করিতেছিলেন। কিন্তু মাতৃ-স্নেহের যে একটা স্বচ্ছ প্রবাহ—একটা সুমিষ্ট আস্বাদ কানাইলালের চিত্ত সতত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, এ সকল স্নেহ সেই স্থানটা একটু নাড়া-চাড়া দিতে পারে মাত্র—জাঁকিয়া বসিতে পারে না। বরং এই নাড়া দেওয়ার ফলে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, সেই চিত্ত-চাঞ্চল্যই একটা গতি উৎপাদন করিয়া তাহাকে সেই স্বচ্ছ প্রবাহের দিকে ছুটাইয়া আনিয়া দাঁড় করাইয়া দেয়। মহেশ্বরীর মাতৃ-স্নেহের আস্বাদের মধ্যে সে এমন একটু বিশেষত্ব পাইয়াছিল, যাহার পূর্ণবিকাশ সে আর কোথাও

দেখিতে পাইতেছে না। যে-স্নেহের পিছনে প্রয়োজন-সিদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই নাই, তাহার সংস্পর্শে একটা সাময়িক স্নায়বিক উত্তেজনা আসিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা নিবিড় সম্বন্ধ-স্থাপনে সফলকাম হয় না। দিন গেল—মাস গেল—বর্ষ গেল—তবু মহেশ্বরীর প্রাণের সেই যথার্থ পরিচয়টুকু কানাইলাল ভুলিতে পারিতেছিল না। তাহাকে ভুলাইবার মতন কোনো শক্তির সন্ধান যে সে কোথায়ও পাইতেছিল না।

একদিন সন্ধ্যার পর মহামায়া নলিনীকে ভিতরের বাড়ীতে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখিয়া কানাইলালের গৃহে আসিয়া বসিলেন। আজ তাঁহার কথায় স্নেহধারা উছলিয়া পড়িতেছিল। প্রসন্নমনে নানা কথার পর তিনি বলিলেন, "বাবা, নলিনী যে দিন দিন ধিঙ্গী হ'য়ে উঠ্ল, কি করা যায় বলো না! সহজে যে আর ভাত গিল্‌তে পারিনে!"

কানাইলাল প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে আর একটু পরিষ্কার করিয়া শুনিবার জন্য মহামায়ার দিকে উৎকণ্ঠাপূর্ণ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। মহামায়া কহিলেন, "তুমি দেখি সংসার-সম্বন্ধে কোনো খবরই রাখো না। আমাদের হিন্দুর ঘরে আট বছর বয়সে গৌরীদান করতে হয়। মেয়েটি এই বারো পেরিয়ে তেরয় পড়তে যায়, আজও পাত্তর জুটোতে পারা গেল না। বড় মেয়েটি যা হোক সময়মতন পাত্রস্থ হয়েছিল। এর বেলা কি হবে—তাই ভাবনায় পড়েছি।"

কানাই এতক্ষণে সকল বুঝিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাও কথাবার্ত্তা কিছু করা হয়নি?"

"কই—কিছুই ত দেখিনে। একাপ্রাণী—তা'তে কাজ নিয়েই ব্যস্ত। দেখ্‌ছ ত—হাঁপ্ ছাড়্‌বার সময় নেই। ঘাঁটালে বা তেমন ছেলে কই? একটু উ'ঠে-প'ড়ে চেষ্টা না করলে আজকাল ছেলের বাপে কি মেয়ে সেধে নিতে আসে?"

কানাই একটু চিন্তা কবিয়া কহিল, "আমি কি দিনকতক বেব হ'য়ে চেষ্টা ক'বে আস্ব ?"

"আস্তে পাব্লে ত ভালোই হ'ত। কিন্তু শেষকালে তোমাব চাক্‌রিটাও যাবে ! সেটা কি ভালো হবে ?"

কানাইলাল হাসিয়া কহিল, "সেজন্যে ভাবনা নেই। একটা গেলে আব একটা জুটিয়ে নেওযা যাবে। যখন এত ক'বে বল্‌ছেন, তখন এইটেই ত আগে দেখা উচিত।"

মহামায়া কিছুকাল ইতস্ততঃ কবিয়া কহিলেন, "আমাদেব মনে একটা ইচ্ছা জেগে আছে। সাহস ক'বে বল্‌তে পাবিনে। তোমাবও ত, বাবা, গৃহ ধর্ম্ম কব্‌তে হবে ?"

কানাই হঠাৎ চম্‌কাইয়া উঠিল, তা'ব পব ললাট-দেশ কুঞ্চিত কবিয়া কহিল, "আমাব সঙ্গে আপনাব কথাব সম্পর্ক কি বুঝ্‌তে পাব্‌ছিনে।"

মহামায়া কহিলেন, "কিছুই দেখি বোঝো না। নলিনীকে তুমি যদি গ্রহণ ক'বে সংসাবী হও—তা হ'লে আমাদেব জাতি বক্ষা হয়।"

ম্লানমুখে কানাই হাসিয়া কহিল, "এইবাব বেশ বলেছেন। আমাব কি আছে যে সংসাবী হবো ?"

"কেন—বাড়ীঘব আছে, মাও ত আছেন ?"

কানাইলালেব মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল। একটা উত্তপ্ত বায়ুস্রোত আসিয়া যেন তাহাব স্নায়ুগুলিব শিহবণ জাগাইয়া দিয়া গেল। সে নিম্নস্বরে কহিল, "মা কি সবাবই চিবদিন থাকে ?"

মহামায়া বুঝিলেন যে, তাহাব মনেব মধ্যে একটা যাতনা উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সে সম্বন্ধে আব কিছু জিজ্ঞাসা না কবিয়া বলিলেন, "তোমাকে পেলেই আমাদেব সব পাওয়া হ'ল। আমবা আব-কিছু দেখ্‌তে শুন্‌তে চাইনে।"

কানাইলাল কিছুকাল আরক্তমুখে চুপ করিয়া রহিল। তা'র পর কহিল, "আপনাদের কথার উত্তর না দিতে পেরে আমি লজ্জিত হ'চ্ছি। এবিষয়ে মত দেওয়ার কোনো যুক্তিই আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। হয়ত কতকগুলি বাধা এসে উপস্থিত হবে।"

"কি বাধা ?"

"কি যে বাধা আমি জানিনে। না জেনেও কথা দিতে পারিনে।"

"কার কাছে জান্‌বে ?"

"কার কাছে যে জান্‌ব, তাও ত খুঁজে পাইনে।"

মহামায়া কহিলেন, "বল্‌ছ, বাধা আছে। কি বাধা, তা জানো না। আবাব জান্‌বাব লোকও খুঁজে পাচ্ছ না। তোমার কথার মর্ম্ম ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। বুঝিয়ে বলো না; সব যে হেঁয়ালির মতন ঠেক্‌ছে।"

কানাই বলিল, "আমি বুঝিনে মা, তা আপনারা কি বুঝ্‌বেন ?"

মহামায়া ক্ষুণ্নমনে চলিয়া গেলেন। এ রহস্য না ছলনা, না আর-কিছু, তাহা বুঝিতে পাবিলেন না।

তা'র পর তিনি এক সময় গণপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুখ বুজে ত খেয়ে বের হও। মেয়ের দিকে কখনও চেয়ে দেখ ?"

গণপতি কহিলেন, "দেখে আর কি কর্‌ব ? যা বরাতে আছে হবে। পেটের চিন্তা না থাক্‌লে না হয় ঐ কাজে লেগে পড়া যেত।"

"তা বল্‌লে ত আর লোকে শুন্‌বে না। আচ্ছা, ঘরেই না হয় একবার চেষ্টা কবো; কানাইএর সঙ্গে হ'লে কেমন হয় ?"

"ছেলেটি ত বেশ। কিন্তু এতদিন রয়েছে নিজের পরিচয় কিছুই দিতে চায় না। বাড়ী-ঘরও জানা নেই। তাইতে ত খট্‌কা লাগে।"

গৃহিনী সুর চড়াইয়া বলিলেন, "নিজে পাও না হাঁপ ছাড়্‌বার সময়—

অত শত তোমায় কে দেখা-শুনা ক'রে দেবে? ছেলেটি ভালো—করিয়ে-কম্মিয়ে হয়েছে, আর-কিছু দেখায় কাজ নেই। অত-শত আমার চাই নে। জাত রক্ষা পেলেই বাঁচা যায়।" নিরীহ গণপতি বলিলেন, "তা বেশ। তা'কে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না?"

মহামায়া বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "সকল ভূতই বুঝি আমাকে দিয়ে ঝাড়াতে চাও? আমি জিজ্ঞাসা করেছি, কোনো সদুত্তর পাইনি।"

"কেন—কি বল্‌লে?"

"কি জানি ছোঁড়াটার ধরণধারণ যেন কেমন হেঁয়ালি-মতন। নিজে রাঁধে-বাড়ে—খায়-দায়—উচ্ছিষ্ট ছুঁতে দেয় না। বিয়ের কথা পাড়্‌লে বল্‌লে যে,—কি নাকি বাধা আছে, সে-বাধা আবার নাকি সে জানে না, জান্‌বার লোকও খুঁজে পায় না।"

"তবে আর কি কর্‌বে, বলো! ও-আশা ছেড়েই দাও।"

গৃহিনী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি একবার জিজ্ঞেস্ ক'রে দেখ না? সব তা'তে হাল ছাড়্‌লে সংসারে কোনো কাজ করা চলে না।"

গণপতি কহিলেন, "তোমাদের সঙ্গে যখন মন খু'লে বলেনি, তখন আমার সঙ্গে কি আর বল্‌বে? তুমি বরং আর-একবার বুঝিয়ে-পড়িয়ে চেষ্টা ক'রে দেখো। সেই ভালো হবে।"

মহামায়া আর-এক সময় নির্জ্জনে কানাইলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, ভেবে-চিন্তে দেখ্‌লে কি একবার?"

ম্লানস্বরে কানাই কহিল, "দেখেছি মা, প্রতিপদেই বাধা পাই।"

"কে বাধা দেয়?"

"আমার বিবেক।"

মহামায়া চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "তোমার বিবেক কি বলে না—আমাদের দায়-মুক্ত কর্‌তে?"

কানাই মলিনমুখে কহিল, "কি জানি মা, হয়ত আমারও আপনাদের পেতে অধিকার নেই—আপনাদেরও হয়ত নেই।"

মহামায়া কহিলেন, "তোমার কথার অর্থ বোঝা যায় না। কেবলই কথার প্যাঁচ-গোঁচ দিচ্ছ—অথচ স্পষ্ট ক'রে কিছু বল্ছ না।"

কানাই দুঃখিত হইয়া কহিল, "না মা, আমি প্রতারণা কর্‌ছি না। আমি কিছুই জানিনে। কিন্তু আমার বিবেক যে কাজ কর্‌তে নিষেধ করে, আমি তা কর্‌তে পারিনে।" সে আর কিছু বলিল না। বেদনায় তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

মহামায়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার বক্ষের মধ্যে একটা আক্রোশ উঠিয়া-পড়িয়া বিদ্রোহ জমাইয়া তুলিতে লাগিল। তিনি মরীয়া হইয়া কিছুকাল আঙ্গিনার উপর বসিয়া রহিলেন। তিনি কাহার ঘাড়ে গিয়া এ-উপেক্ষার অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন নলিনী কানাইলালের জন্য জলখাবার লইয়া বাহির হইতেছে। তিনি রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আর সোহাগ জানাতে হবে না। বলে,—কেঁদে-কেঁদে লুটি পায়, সে আমার ফিরে না চায়। আমি মা—আমাকে এই অপমানটা ক'রে ছেড়ে দিলে, মেয়ে আমার খাইয়ে-দাইয়ে স্বয়ম্বরা হ'তে চলেছেন।"

নলিনী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই হাতের রেকাবিখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং হাঁটুর উপর মাথাটি রাখিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। তাহার চক্ষু-দুটি দিয়া জলধারা গড়াইতে লাগিল।

কানাইলালের সুমিষ্ট ব্যবহারে তাহার প্রতি নলিনীর মধ্যে যে সহজ সরল ভালোবাসা জমিয়া উঠিতেছিল, মহামায়া বোধ হয় কোনো সঙ্গত কারণ দেখাইতে না পারিলে তাহাদের এ স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে

পারিতেন না। কিন্তু তিনি এমন-একদিক্ দিয়া বাক্য প্রয়োগ করিলেন যাহাতে কন্যার পা-দুখানা খোঁড়া করিয়া দিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না! মাতার বিষ-দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া নলিনী সেইভাবে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার মনে একটা নূতন সত্যের ছায়াও দেখা দিল।

মহামায়া ঘরের কাজকর্ম্মগুলি সারিয়া আসিয়া যখন দেখিলেন, নলিনী উঠে নাই, সেইভাবেই বসিয়া আছে, তখন তিনি খুব নরম করিয়া কহিলেন, "নে ওঠ, আর আমাকে চারিদিক্ থেকে জ্বালাস্‌নে। যা রান্না-বান্নার জোগাড় ক'রে দিয়ে আয়। বাড়ী এসে যদি এ-সকল দেখ্‌তে-শুন্‌তে পায় তা হ'লে আর রক্ষা থাক্‌বে না।"

নলিনী দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মহামায়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে বলিলেন, "নে মা, ওঠ, ভর সন্ধ্যে-বেলায় কাঁদ্‌তে নেই। তোদের পেটে ধরেছি—মার একটি কথা সইতে পার্‌বিনে? আমার লক্ষ্মী, দিয়ে আয় একটু জোগাড়-যন্তর ক'রে, মানুষটা অনাহারে থাক্‌বে নইলে!"

নলিনী তাহার মাতাব হাত ঝাড়া মারিয়া ফেলিয়া কহিল, "আমি পার্‌ব না—পারো তুমি যাও।"

মহামায়া কহিলেন, "আমি কোন্‌দিকে যাবো, এদিকে ঘরে এখনও কত কাজকর্ম্ম সার্‌তে প'ড়ে রয়েছে।"

"সে আমি কর্‌ব—তুমি যাও।"

"না মা, তুই যা। তা'র যা দর্‌কার লজ্জায় হয়ত আমার কাছে ভালো ক'রে চাইবে না।" নিজে যাইবার তাঁহার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। নলিনীকে দিয়াই নলিনীর কার্য্যোদ্ধার যদি হয়, এই আশায় তাহারই শরণ তিনি লইতেছিলেন।

নলিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, তাহার মাতা তাহার চক্ষু-ছুটি যে রঙে ফুটাইয়া দিলেন, তাহাতে যেন একগাছি লজ্জার শৃঙ্খল তাহার পা-দুখানিতে বন্ধন আঁটিয়া ক্রমাগত মাটির দিকে টানিতেছে। তাহার মাতা যাহা চাহেন, সে ত তাহা চাহে নাই। অন্ততঃ ইতিপূর্ব্বে এ-কথা সে একবারও ভাবে নাই। সে কিছু উদ্ধত-স্বরে কহিল,—

"আমার দাদা না—কেন তুমি এসকল কথা বলো তাকে? পারব না আমি—যাও্ তুমি।"

এই বলিয়া সে মাটির উপর বসিয়া পড়িল। মহামায়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া কহিলেন, "তার শাস্তি ত আমি পেয়েছি। এখন যা, আর দেরী করিস্‌নে। এখুনি তিনি এসে পড়্‌বেন।"

নলিনী রান্নার সামগ্রীগুলি লইয়া গিয়া একে-একে রাখিয়া আসিল। চুল্লীটাও ফুঁ দিয়া ধরাইয়া দিল। কিন্তু সে একটি কথাও বলিল না। কানাইলালও কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। বাড়ীর মধ্যের অনেক কথাই তাহার কর্ণে পৌছাইয়া তাহার দেহখানি রোমাঞ্চিত করিয়া দিয়াছিল। নলিনীকে কিছু বলিবার মুখও তাহার ছিল না, শক্তিও ছিল না।

কানাইলাল উঠিয়া যাইয়া ভাত চাপাইয়া দিল। নলিনী বাড়ীর মধ্যে আসিয়া রাঁধিতে বসিল। সে এক-সময় উঁকি মারিয়া যখন দেখিয়া আসিল, তাহার মাতার রান্নাঘরের দিকে হঠাৎ আর আসিবার সম্ভাবনা নাই, তখন সে রেকাবিতে আর একবার জলখাবার সাজাইয়া লইয়া চুপি-চুপি পা টিপিয়া টিপিয়া কানাইলালের সম্মুখে গিয়া রাখিল। কিছুক্ষণ থাকিবার পর বলিল,—

"আমি আজ কিন্তু পড়্‌তে আস্‌ব না।"

"কেন?"

"মাথাটা বড্ড ধরেছে।"

কানাইলাল কিছু বলিল না। সে-ও বেশীক্ষণ সেখানে না দাঁড়াইয়া চলিয়া আসিল। কিন্তু কানাইলালের মনে বেশ ধারণা জন্মিল,—এই মিত্র পবিবাবে আর অধিক দিন বাস করিতে গেলে উভয়ের মধ্যে একটি প্রাচীর সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়া দেখাইয়া দিবে যে, এই আপনার জন হইতেও সে কত পৃথক্। নলিনীকে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেই হইবে; এইবেলা নিষ্ঠুরহস্তে আপনাকে আঘাত দিয়াই সরিয়া যাওয়া ভালো; বিলম্বে হয়ত সে নলিনীকেও দুঃখ দিতে পাবে।

দশম পরিচ্ছেদ

কানাইলাল যাহা ভাবিল, কার্য্যতঃ তাহাই ফলিতে আরম্ভ হইল। মহামায়া যত সহজে কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া আসিলেন, তত সহজে মনের গ্লানিটা নির্ব্বিবাদে পরিপাক করিতে পারিলেন না। কানাইলাল যখন এপথে অগ্রসর হইবার আব কোনো লক্ষণও দেখাইল না, তখন তাহার প্রতি আক্রোশে মহামায়ার শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। তিনি যেন প্রতিকার্য্যে ফুটাইয়া দেখাইতে চান্ এখানকার দ্বারপথ প্রতিদিন ঠেলাঠেলি করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে সে যেন আর বৃথা চেষ্টা না করে। যে কাছে ডাকিলে আসে না, তা'র একেবারে দূরে যাওয়াই ভালো। এইরূপে তাহাকে জড়াইয়া লইয়া তিনি এক-একদিন কন্যাকে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন। সেদিন নলিনী পড়িতে যাইত না। কানাইলালের গৃহে জামা, জুতা, বিছানা, কাগজ, পেন্সিল সকলই অবিন্যস্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। কিছুই গোছাইয়া রাখিয়া আসিত না। মহামায়াও কানাইলালের সঙ্গে ভালো করিয়া কথা বলিতেন না। এমন ছাড়া-ছাড়া হইয়া বাস করিতে সে দুইদিনেই হাঁপাইয়া উঠিবে। কিসের আকর্ষণে তবে সে পরের ঘরে এমন গায়ে পড়িয়া গলগ্রহ হইয়া থাকিবে? শুধু চোখের দেখায় পরকে আপন করিয়া লইতে ত সে পারিবে না।

সেদিন মহাজনের কুঠী হইতে ফিরিবার সময় নদীর ধারে বসিয়া তাহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের কত কথাই সে ভাবিতে লাগিল। এত অসংখ্য নদ, হ্রদ, সমুদ্র থাকিতে সে একটা জলকণা উত্তপ্ত বালুকার উপর শুকাইয়া যাইবে? কোথাও আশ্রয় পাইবে না! সে দেখিল,

বাহিরের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া কত-কত লোক আপন-আপন গৃহের দিকে ছুটিয়াছে, তাহার মতন নিরাশ্রয় বোধ হয় জগতে আর একটিও নাই। তাহার কেমন আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল যে, এই বিশাল বিশ্বে সে অসংখ্য গৃহ দেখিতেছে ; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, পরিবার লইয়া সকলে সুখে বাস করিতেছে, তাহারই বেলায় কি বিধাতা গালে আঙুল ঠেকাইয়া বসিয়া ছিলেন? কেন তাহার কেহ নাই, কেন তাহাকে বারবার গৃহের স্বাদ দিয়া বিধাতা আবার বঞ্চিত করেন? সে কোথা হইতে আসিল—কোথায় আসিল—কোথায় সে-গৃহ? মহেশ্বরী বলিয়াছিলেন,—তাঁহাদেরই গ্রামে—উত্তরপাড়ায়; সেখানে এখন অন্য লোকে বাস করিতেছে। তা যে হয় সে বাস করুক—সে মাটিটা একবার সে দেখিতে চায়! সে দেখিবে সে মৃত্তিকার শৃঙ্খলে তাহাকে বাঁধিতে পারে কি না? এ বিরাট্ শূন্যের মাঝখানে সে আর ঘুরিতে-ফিরিতে পারিতেছে না! আশ্রয় চাই বেড়িয়া ধরিতে, একটি প্রাণের আলিঙ্গন চাই। কোন্ খানে সে সংসারের সমস্ত দাবি-দাওয়া হারাইয়াছে—কোন্ স্থানে তাহার এই সংযোজক সূত্রটি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহার জীবনের এমন কোনো সংজ্ঞাই কি নাই, যে তাই ধরিয়া এই সংসারের উপর তা'র একটু দাবি করা চলে? কেন সে কেবলি পথে-বিপথে পরের কাছে হৃদয়ের দাবি করিয়া মরে? এইরূপ নানা চিন্তা করিতে-করিতে অতি পবিত্র—অতি নির্ম্মল—অতি বিচিত্র একখানি মুখের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। ছিঃ! ছিঃ! সে কেন এমন ভাবিতেছে—কেন এমন লালসা করিতেছে? যে স্নেহের নির্ঝরিণীকে দেখিলে জগৎ ত তুচ্ছ কথা, প্রাণের অনন্ত তৃষ্ণাও মিটিয়া যায়, একটা বৃথা অভিমানের বেড়া দিয়া সে যে সে-অতুল সম্পদ্ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে! সংসারের আর কোন্

সম্পদে তাহাকে অধিক সম্পদশালী করিতে পারিবে? যেখানে তাপ নাই—স্নিগ্ধতা আছে, তাড়না নাই—ক্ষমা আছে, ভয় নাই—ভরসা আছে, এমন জুড়াইবার স্থান সে হেলায় হারাইয়া আসিয়াছে! তাহার এক-একবার মনে হইতে লাগিল যে, ছুটিয়া গিয়া সে অভয়-চরণে লুটাইয়া পড়ে। কিন্তু বড় লজ্জা করে! মাতার স্নেহের উদ্যানে নিজের হাতে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া তাহার দগ্ধ চিহ্নটাও দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিল না—সে আজ কোন্ মুখে সে পবিত্র চরণতলে যাইয়া দাঁড়াইবে? কানাইলালের চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সে এইরূপ তন্ময় হইয়া ভাবিতেছে এমন সময় একটি ভদ্রলোক সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "এই যে, আপনি এখানে ব'সে আছেন। আমি আপনারই খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছি। মেয়েটার পেটটা বড় ফেঁপেছে—একবার দেখে আস্তে হবে।"

কানাই আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া কহিল,—"হ্যাঁ—চলুন।"
ভদ্রলোকটি বলিলেন, "বাসা হ'য়ে যাবেন কি একবার? দু'চারটা ওষুধ সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে আমায় আর আস্তে হয় না।"

"তাই চলুন।" এই বলিয়া উভয়ে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

গণপতি সেদিন বাড়ীতে ছিলেন না। মনিবের কার্য্যে কোলাঘাটে গিয়াছিলেন। কানাই আসিয়া দেখিল, তাহার ঘরে আলো জ্বলে নাই। সে বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "নলিনি, একটা আলো দিয়ে যাও ত দিদি!"

নলিনী আসিয়া আলো রাখিয়া গেল।

কানাই বাক্স হইতে দুই-চারিটা ঔষধ লইয়া বাহির হইতে যাইতেছে এমন সময় মহামায়া তাহাকে শুনাইয়া কহিলেন, "নলিনি, ব'লে দে সকাল-সকাল ফির্তে। আমার শরীর ভালো নেই, দরজা আগ্‌লে ব'সে থাকবে কে?"

নলিনীর কিছুই বলিতে হইল না। কানাইলাল যে তাহার মাতার সকল কথাগুলিই শুনিতে পাইল, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। এবং বুঝিয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া ব্যথিত-হৃদয়ে দূরে সরিয়া গেল।

কানাইলাল আসিয়া দেখিল, মেয়েটি বড় গোলমেলে হইয়া পড়িয়াছে। পেট ফাঁপিয়াছে, হাত-পা বরফের মতন ঠাণ্ডা, মাঝে-মাঝে প্রলাপ বকিতেছে; জ্ঞান হইলে তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ কবিতেছে।

সে তাহাকে একদাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দিয়া গা-হাত-পা গরম কাপড়ের দ্বারা ঢাকিয়া দিল। পেটের উপরিভাগে একটি বাহ্যিক প্রলেপ ও মালিস করিয়া দেওয়া হইল। চাব-পাঁচ ঘণ্টা বিশেষ তদ্বিরেব পর মেয়েটির অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। একবার দাস্ত হইয়া পেটটি কমিয়া গেল। হাত-পা গরম হইল এবং ভুল বকাও থামিল। সে তখন ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া বাসায় ফিরিল।

সে যখন বাসায় ফিরিল, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। মহামায়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে ভয়ে-ভয়ে ডাকিল,—"নলিনি!"

নলিনী এক-ডাকেই উত্তর দিল। কানাইলালের প্রতি মহামায়ার স্বভাব ক্রমশঃ যেরূপ হিংস্র হইয়া উঠিতেছিল, তাহাতে তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া নলিনী বুঝিতে পারিয়াছিল, আজ আবার একটা-কিছু বাধিবে। কানাইলালকে আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য এবং মায়ের দোষস্খালনের জন্য তাই সে না ঘুমাইয়া জাগিয়াই ছিল। সে ঘরের মধ্যে সাড়া শব্দ না করিয়া আলো জ্বালিল এবং চুপি-চুপি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। কানাই ভিতরে প্রবেশ করিলে সে জিজ্ঞাসা করিল, "রান্না করবেন ত?" আজ তাহার কথায় বালিকা-সুলভ আনন্দচঞ্চলতা ছিল না। তার গলার স্বর আজ ব্যথায় গভীর।

কানাই বলিল "এত রাত্রে কি রাঁধা যায়। আজ আর কিছু খাবো না।"

নলিনী কহিল, "আচ্ছা, আপনি একটু বসুন, আলো নিবিয়ে শোবেন না যেন—আমি এখুনি আস্‌ছি!"

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। এবং অবিলম্বে একটা বাটিতে করিয়া দুধ, কিছু ময়দা, পাকা কলা ও কিছু গুড় আনিয়া দিল। বলিল, "এইটে মেখে খান, খেতে মন্দ হবে না—সিন্নি আর কি।" কানাইকে অনাহারে রাত্রি যাপন করিতে দিতে সে পারে না।

পরদিন প্রাতে মহামায়া নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কানাই কখন এসেছিল?"

ভয়ে-ভয়ে নলিনী কহিল, "শুতে-শুতে।"

মা বলিলেন, "দোর খুলে দিলে কে?"

"আমি।" নলিনীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। মা না জানি কি বলিবে।

মা একবার মাত্র চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, "সেয়ানা মেয়ে আমাকে না ব'লে-ক'য়ে দোর খু'লে দিতে গেলি? ভয়ডর, লজ্জাসরম নেই!"

নলিনীর কান দিয়া তাপ নির্গত হইতে লাগিল।

মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে খেলে কি?"

নলিনী তিক্তস্বরে কহিল, "তোমার মুণ্ডু।"

মহামায়া কহিলেন, "যেখানে কব্‌রেজি কর্‌তে যাওয়া হয়েছিল, সেইখানে খেলে-শুলে পার্‌তেন। বাড়ীর ওপর না খেয়ে প'ড়ে থাকা এতে কি লক্ষ্মী ভাগ্যি থাকে? বল্‌লেই হ'ত, গুছিয়ে-গাছিয়ে দেওয়া যেত—গতরটা ত বারোভূতের জন্যেই জল কর্‌তে ব'সে আছি।"

কানাই বসিয়া-বসিয়া সকল কথাগুলি শুনিল। এবং কিছুক্ষণ পরে গায়ে একটি জামা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে যখন মহামায়ার দ্বারে তাহার লাঞ্ছনার শেষ করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ছায়াবাজির মতন তাহার এই দু'দিনের হাসি-কান্না কোথায় উধাও হইয়া গিয়া মহেশ্বরীর বিচ্ছেদের সেই প্রথম হাহাকারটি তাহাকে আবার চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার অন্তরের এই ক্রন্দনের মধ্যে নলিনীর সুমিষ্ট স্নেহ-ব্যাকুলতা যেন থাকিয়া-থাকিয়া নিঃস্বভাবে উঁকি-ঝুঁকি দিয়া উঠিতে লাগিল। যাহাকে ছাড়িয়া যাইতেই হইবে, সে যে তাহার মনকে এমন কোমল বন্ধনে বাঁধিয়াছে আগে তাহা কে জানিত? তাহা হইলে এমন ফাঁদে সে কখনও পা দিত না। সে হাঁটিতে-হাঁটিতে একটি ময়দানের ধারে আসিয়া উপবেশন করিল। ভাবিয়া দেখিল, তাহার প্রাণের বেদনা জানাইতে পৃথিবী ফাটাইয়া চীৎকার করিলেও বোধ হয় তাহার ডাকে উত্তর দিবার কেহ নাই। যে-দুটি মানুষ হয়ত সাড়া দিত, দৈব তাহাকে তাহাদের কাছ হইতে টানিয়া লইয়া যায় কেন?

কিছুকাল সেইখানে বসিয়া থাকিবার পর সে আপনার দুর্ব্বলতাকে প্রাণপণে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। বাজার হইতে কিছু খাবার কিনিয়া খাইয়া মহাজনের কুঠীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং নিজের কাজে মনোনিবেশ করিল।

বেলা যখন দুইটা, তখন একটা গোলমালের শব্দে সকলে ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিল বাজারের একপার্শ্বে আগুন লাগিয়াছে। লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশমার্গে উঠিয়া সমস্ত বাজারটিকে গ্রাস করিবার জন্য যেন সম্মুখভাগে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। কুঠীর লোকজন সকলে দ্রুতপদে তথায় ছুটিল। কানাইলালও সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। ইতিমধ্যে সেখানে অনেক লোক জড় হইয়াছিল।

কানাইলাল দেখিল, ভয়ে ও উদ্বেগে সকলেই কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ

দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, কেহ-কেহ আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা কেহই করিতেছে না। হঠাৎ কানাই দেখিতে পাইল, একটি প্রজ্বলিত ঘরের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক আপনার শিশু পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া ঘরের বাহির হইবার জন্য গৃহের মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছে। কিন্তু গৃহটি চারিদিক্ হইতে এরূপ অগ্নিময় হইয়া উঠিয়াছে যে বহির্গমনের পথ নাই। ভয়ে মেয়েটি দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হাবাইয়া আগুনেব ভিতরই ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। কানাই তাড়াতাড়ি নিকটবর্ত্তী এক দোকান-ঘব হইতে দুইখানি শতবঞ্জি সংগ্রহ করিয়া জলসিক্ত কবিয়া লইল। সকলে অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। কানাই শতরঞ্জি দিয়া সমস্ত শরীর মুড়িয়া আগুন ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। পরে শিশুটিকে আপনার ক্রোড়ে লইয়া একখানি সতরঞ্চ দ্বারা নিজের দেহ আবৃত কবিল। অপরখানিব দ্বারা শিশুর জননীকে আচ্ছন্ন করিয়া সকলকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে ঘরের বাহিব হইয়া আসিল।

তাহাব উপস্থিতবুদ্ধি দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যাহারা এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা দলে-দলে ছুটিয়া আসিয়া কানাইলালকে তাহার সৎসাহসের জন্য প্রশংসা করিতে লাগিল। কানাই-লাল সে-দিকে লক্ষ্য না করিয়া যাহাতে এই অগ্নি বহুস্থানব্যাপী না হয়, তজ্জন্য একটি কলসী হস্তে লইয়া, নিকটবর্ত্তী জলাশয়ের দিকে ছুটিল। কাহারও কথায় মন দিবার তখন সময় ছিল না। সকলকে ডাকিয়া উত্তেজনাপূর্ণস্বরে সে কহিল, "হাঁ ক'রে দেখ্‌ছ কি তোমরা? যেখানে যে জলপাত্র পাও শীঘ্র নিয়ে এস।"

কানাইলালকে অগ্রবর্ত্তী দেখিয়া তখন দল বাঁধিয়া সকল লোক ভারে-ভারে জল আনিয়া জ্বলন্ত অগ্নিশিখার উপর ঢালিতে লাগিল। সে কি দৃশ্য! কেহই দাঁড়াইয়া নাই—পিপীলিকাশ্রেণীর মতন জনস্রোত দলবদ্ধ

হইয়া ক্রমাগতই সেই ভীষণ অগ্নিস্রোতের উপর ছুটিয়া-ছুটিয়া আসিয়া জল ঢালিতেছে, ক্রমাগত জল ঢালিতেছে। শরীরের প্রতি মায়া নাই—বিশ্রাম নাই। মায়ামন্ত্রে সকলে যেন আসুরিক শক্তি পাইয়াছে। কেহ-কেহ বা কানাইলালের উপদেশ মতন কাঁথা, শতরঞ্জি ও মাতুর প্রভৃতি শয্যাদ্রব্য জলসিক্ত করিয়া আনিয়া নিকটবর্ত্তী গৃহগুলি আবৃত করিয়া দিতেছে। এইরূপে কানাইলালের উৎসাহে ও যত্নে অতিশীঘ্রই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। কতক গৃহ অর্দ্ধদগ্ধ, কতক বা অদগ্ধ অবস্থাতেই রক্ষা পাইল। যাহারা গৃহহারা হইল তাহারা আজ প্রতিবাসীব গৃহে অনায়াসে স্থান পাইল। বিপদ্ তাহাদের পরস্পরের আত্মীয় করিয়া তুলিয়াছে।

মনিবের বাসা হইতে সন্ধ্যার সময় কানাই যখন গৃহে ফিরিবে তখন গণপতির গৃহে যাইতে তাহার মন উঠিল না। এই নিদারুণ পরিশ্রমে সে যেমন ক্লান্ত হইয়াছিল, সেইরূপ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যধিক কাতরও হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মহামায়ার বিষাক্ত কথাগুলি তখনও পর্য্যন্ত তাহার কর্ণে বাজিয়া-বাজিয়া উঠিতেছিল। সে-গৃহে আর সে যাইবে না—যাইতে পারিবে না! রাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে, সে ক্লান্ত—ক্ষুধার্ত্ত—তাহার আশ্রয় নাই; তাহার সাধু ব্যবহারে ঘাঁটালবাসী ইতর ভদ্র সকলেই তাহার পরমাত্মীয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে আশ্রয়প্রার্থী হইলে সকলেই তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু উপযাচক হইয়া কি করিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতে হয় সে তাহা জানিত না। কাহারও গৃহের দ্বারে গিয়া সে দাঁড়াইতে পারিল না। আপনি বাজার হইতে দুইটি ডাব-নারিকেল খরিদ করিয়া খাইল। এবং পরিচিত একটি ঔষধের দোকানে আসিয়া সামান্য একটা মাতুরে পড়িয়া রাত্রি যাপন করিল।

তাহার সৎসাহসের কথা লোকমুখে ইতিমধ্যে সহরের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। গণপতিরাও এ-সংবাদ পাইয়াছিলেন। গণপতি

গৃহে আসিয়া যখন শুনিলেন কানাইলাল আসে নাই, গতরাত্রে কিছু খায় নাই, প্রাতে সেই যে জামা-গায়ে দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, দুপুরেও আসিয়া খাওয়া-দাওয়া করে নাই, তখন তাঁহার মন কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিল। হাওড়া ষ্টেশনে এই বালকই যে তাঁহার স্ত্রীর জীবন রক্ষা করিয়াছিল! তা'র পর বৎসরাধিককাল সে ত তাঁহারই পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতেছে। বিশেষতঃ এই অগ্নিকাণ্ডে তাহার নিঃস্বার্থ পরোপকার-বৃত্তির পরিচয় নূতন করিয়া পাইয়া তাঁহার মনের চাঞ্চল্য একটু বাড়িয়াই উঠিল। সাধারণতঃ তিনি অল্প কথা কহিতেন, লোকদেখানো ভালোবাসা তাঁহার ছিল না; কিন্তু আজ তিনি কানাইকে না খুঁজিয়া আনিয়া শান্ত হইতে পারিতেছিলেন না। তিনি একটি লণ্ঠন জ্বালিয়া লইয়া তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। মহাজনের ঘরে আসিয়া শুনিলেন, সে অনেকক্ষণ বাসায় চলিয়া গিয়াছে। তা'র পর আরও অনেক স্থানে খোঁজ করিবার পর কোথাও তাহাকে না দেখিয়া তিনি বিষণ্ণ-মনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মহামায়াকে বলিলেন, "না—কোথাও তা'কে খুঁজে পেলাম না। ছেলেটা কোথায় যে গেল! ঘরের ছেলের মতন ছিল।"

মহামায়া বলিলেন, "তুমিও যেমন সারাদেশ খুঁজে বেড়াতে গেছ—কাজকর্ম্ম না থাক্‌লে যা হয়। সে কোথায় মজা লু'টে বেড়াচ্ছে, তুমি মরছ ঘ'রে।"

গণপতি কহিলেন, "বলো কি? কাল কিছু খায়নি—আজও খেলে না! আজ বাজারটা বল্‌তে গেলে সেই-ই রক্ষা করেছে।"

মহামায়ার বলিতে বাধিল না যে "ওড়ম্বাজ ভবঘুরে যারা—যাদের চাল-চুলো নেই, তা'রাই ঐসব ক'রে বেড়ায়।"

গণপতি স্ত্রীর কথায় কিছু উত্তর দিলেন না। এমন কথা যে বলিতে পারে, তাহার সঙ্গে তর্ক করিতে যাওয়াও বৃথা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মহেশ্বরী এযাবৎকাল দেশের বাড়ীতে যান নাই। শৈলবালা, বলাই ও গোকুল তাঁহার সঙ্গে কলিকাতাতেই বাস করিতেছিল। যে-গৃহ হইতে কানাইলালকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, কানাইকে না লইয়া সেখানে ফিরিতে তাঁহার মন কিছুতেই সায় দিত না।

সুখেন্দু কয়েকবার আসিয়া তাঁহাদের দেখিয়া-শুনিয়া গিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও মহেশ্বরী আপনাকে সুস্থির করিতে পারেন নাই। তন্দ্রার মতন একটা আব্ছায়া আসিয়া তাঁহার চক্ষুদু'টি হইতে কানাই-লালকে ঢাকিয়া ফেলিতে চাহে, কিন্তু নিরাশ্রয় বালকেব পৃথিবীব্যাপী নির্য্যাতন ও দুঃখের চিত্র তাঁহার মন ও প্রাণকে এমন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল যে, কোনো বিপরীত শক্তিই আর সেখানে আসিয়া বাসা বাঁধিবার অবসর পাইতেছিল না।

মহেশ্বরী গাড়ী করিয়া প্রায়ই ষ্টেশনে যাইতেন। এ যেন তাঁহার একটা তীর্থস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। কোনোদিন বলাই, কোনোদিন বলাই এবং শৈল উভয়েই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। যখন যেখান হইতে যে গাড়ীখানা ছাড়িত ও যেখানা যেখানে আসিয়া দাঁড়াইত তিনি সেইখানে যাইয়া জন-স্রোতের প্রতি চক্ষুদু'টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিতেন। সূর্য্যের শেষ রশ্মি গঙ্গাবক্ষে আসিয়া লীন হইয়া গেলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বাসায় ফিরিতেন।

তিনি মাঝে-মাঝে কালীবাড়ীতেও পূজা দিতে যাইতেন। পথে কানাইলালের সন্ধান ও মঙ্গল যত কামনা করা যায় কোনোটাই বাকি

রাখিতেন না। একদিন দ্বারপাণ্ডাকে কিছু অতিরিক্ত দক্ষিণা দিয়া তিনি কিছুকালের জন্য মন্দিরটি নির্জ্জন করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি নয়নাশ্রুতে দেবীর পদতল ধৌত করিয়া দিয়া শেষে প্রার্থনা জানাইলেন, "মা, আমার কানাইকে এনে দাও, আমি তাকে সংসারে চল্‌তে ফির্‌তে শিখিয়ে দিই।" এইরূপ প্রার্থনা শেষ করিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিলে চারিদিক্ হইতে ভিক্ষুকেরা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি সকলকেই কিছু-কিছু দিয়া সন্তুষ্ট কবিলেন। একটি বালকের উপর তাঁহার দৃষ্টি সমধিক আকৃষ্ট হইল। বালকটির হাবভাব, প্রার্থনা সমশ্রেণীর লোকের অপেক্ষা উন্নত। তাহাব চক্ষুদু'টি দিয়া জল ঝরিতেছিল। সে নীরবে শুধু দক্ষিণ হস্তখানি মহেশ্ববীর দিকে সঙ্কোচে আগাইয়া ধরিয়াছিল। মহেশ্বরীর জন্য যেখানে ঘোড়াগাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি তাহাকে সেই পর্য্যন্ত লইয়া আসিলেন, এবং কতই প্রশ্ন করিলেন। তিনি সংক্ষেপে শুধু এইটুকু জানিতে পারিলেন যে, তাহার বাপ-মা কেহই নাই। সে এখানে এক বাবুর বাড়ীতে থাকিত। তাঁহারা কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহাকে পবিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। মহেশ্বরী তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। অন্ন-বস্ত্রাদি দিয়া মাসাধিক কাল প্রতিপালন করিবার পর একদিন দেখিতে পাইলেন, বালকটি তাঁহার অন্তঃকরণ বিচলিত করিয়া দিয়া কোথায় প্রস্থান করিয়াছে। পথের কুড়ানো ছেলে দিয়া হারানো ছেলের শোক মিটিল না।

এতদিন পরেও কানাইলালের সন্ধানে বলাই সমানভাবে নিযুক্ত ছিল। সে একটুও অবসাদ বা বিরক্তি অনুভব করে নাই। একদিন সে একখানি সংবাদপত্র হাতে লইয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে আসিয়া কহিল, "বড় মা, দেখত, এ আমাদের কানাই-দা নয়?"

মহেশ্বরী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শুধু চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিয়া একবার বলাই-এর মুখের দিকে, একবার সংবাদপত্রের দিকে চাহিতে লাগিলেন। খবরের কাগজে হঠাৎ কানাই কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল বুঝিতে পারিলেন না।

বলাই কহিল, "দেখ, ঘাঁটালে এক কানাইলাল মজুমদার কি ক'রে একটি রমণী ও একটি শিশুকে আগুনের মুখ থেকে রক্ষা করেছেন—আর সমস্ত বাজারটা আগুনের গ্রাস থেকে বাঁচিয়েছেন।"

এই বলিয়া সে সংবাদপত্রখানি মহেশ্বরীর হাতে দিয়া সেই স্থানটি দেখাইয়া দিল। শৈলও কাগজের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। এবং পড়িয়া দেখিয়া বলিল, "এ যেন আমাদের কানাই ব'লেই বোধ হচ্ছে।"

মহেশ্বরীর চক্ষুদু'টি দিয়া তখন ধারা বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি কোনো কথাই বলিলেন না। শৈল কহিল, "রমাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কাগজে লিখেছেন। তাঁর কাছে একখানা চিঠি লিখ্‌লে হয় না?"

মহেশ্বরী কিছুকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তা'তে হয়ত হিতে বিপরীত হবে। বুঝ্‌তে পারছ না, সে অভিমান ক'রে-ব'সে আছে। আমরা খোঁজ পেয়েছি জান্‌তে পার্‌লে হয়ত সেখান থেকে পালাবে। খবর নিয়ে আনাবার হ'লে সে কি এতদিনে আপনি খবর দিতে পার্‌ত না?"

"তবে কি কর্‌বেন?"

"কি আর করব, আমাকেই যেতে হবে।"

পরদিনই মহেশ্বরী গোকুলকে সঙ্গে লইয়া ঘাঁটাল রওনা হইলেন। কলিকাতায় থাকিবার আর তাঁহার কোনো আগ্রহ ছিল না। শৈল এবং বলাইও তাঁহার পিছু লইল। তাঁহারা কোলাঘাট পর্য্যন্ত রেলে আসিয়া ষ্টীমারে উঠিলেন। ষ্টীমারখানি রাণীচকে পৌঁছিলে তাঁহারা সেখানে নামিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া সেখান হইতে নৌকাযোগে ঘাঁটাল রওনা হইলেন।

এদিকে কানাইলাল যখন ঘাঁটালে পথে-পথে ঘুরিয়া তিন দিন উপবাস

করিল, এবং মহাআত্মার বাতাসের সংস্পর্শে সমস্ত ঘাঁটাল সহরটি জুড়িয়াই আছে, এইরূপই যখন তাহার ধারণা জন্মিল, তখন সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য নদীর তীরবর্তী বাঁধের রাস্তা ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তিন দিনের অনাহারে তাহার পা-দু'খানা মাটির সঙ্গে জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

সংসারেব এই সাহাবার পথযাত্রীর নিকট চারিদিকে ধূ ধূ বালুকা ভিন্ন যখন আব কিছুই প্রত্যক্ষ হইল না, তখন কে যেন ধীরে ধীরে তাহার অন্তবের কপাটটি খুলিয়া দিল ; এবং তথায় এক বৃহত্তর জগৎ রচনা কবিয়া মধ্যস্থলে এক চিরপবিচিতা মহীয়সী নারীকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল,—ঐখানেই গতি—ঐখানেই মুক্তি—ঐখানেই ভেদের মধ্যে ঐক্য। কানাইলাল দুই বাহু দ্বাবা আপনার বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধবিয়া যখন সেই প্রেমময়ী মাতৃমূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে গেল, তখন রিক্ততায় তাহার হাত দুইখানি শিথিল হইয়া আবার স্খলিত হইল। সে অবসন্ন দেহে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িল। কিছুকাল সেইভাবে বসিয়া থাকিবার পব তাহার মন যখন স্থির হইয়া আসিল, তখন সে ভাবিতে লাগিল, কেন সে তাহার একমাত্র স্নেহেব বন্ধন এবং আকর্ষণ ছিন্ন করিতে ব্যগ্র না হইয়া দেশেব বাড়ীতে ফিবিয়া গেল না? কেন মাতার চরণে দীন সন্তানের মত দাঁড়াইয়া আপনাকে জয়ী কবিয়া মাতাকে পরাজয় স্বীকার করাইল না? মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া কে কবে আপনাকে জয়যুক্ত করিতে পারিয়াছে? সে তাড়াতাড়ি কবিয়া গণপতির সঙ্গে ঘাঁটাল চলিয়া না আসিলে হয়ত মহেশ্বরীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত। শান্তির শ্বশুরবাড়ীতে তিনটি বাত্রি অতিবাহিত না কবিতেই যিনি তাহাকে আনিবার জন্য লোক ও নৌকা পাঠাইয়াছিলেন, তিনি তাহাকে পথের মাঝে হারাইয়া কি যখন-তখন চলিয়া যাইতে পারেন? হয়ত তাঁহার

সেতুবন্ধ যাওয়াই ঘটে নাই। তিনি যখন তাহাকে যে-স্থানে খুঁজিয়াছেন, সে তখন অন্য স্থানে খুঁজিয়াছে, এইরূপে হয়ত দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। অপেক্ষা করিয়া থাকিলে অবশ্যই মিলিত হইতে পারা যাইত। যে-যাতনায় সে ছিন্ন-ভিন্ন হইতেছে, সে-যাতনায় তাঁহাকে না জানি কতখানি কাতর করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপে মর্ম্মন্তুদ চিন্তায় যখন তাহার চক্ষুদু'টি সাত সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া লইয়া রহিয়া-রহিয়া আবার নেত্রপথেই বাহির করিয়া শেষ করিল, তখন তাহার দেহের ক্লান্তি কিছু দূর হইয়াছে। সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, চলিবার জন্য পা বাড়াইল। কিন্তু মহেশ্বরীকে পাইবার পথ ভিন্ন সে ত আর কোনো পথই ধরিবে না। সে আবার সেইখানে বসিয়া পড়িল। বৃক্ষের গুঁড়িটা ঠেস্ দিয়া সে কিছুকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল। মহেশ্বরীর অম্লান-স্মৃতি আবার তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে একান্ত মুগ্ধ ও বিভোর করিয়া তুলিল। তাহার অন্তরের বেদনা, সুর, তান ও লয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাতাসের গায়ে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল,—

মা, আমায় এক্‌লা করেছ ভবে।
পথ-মাঝে, ঘন সাঁঝে, দূরে ঠেলেছ যবে॥
(ওমা) ছেড়েছ যে রণে চিনিতে পারিনে
মানব দানবে—
(তব) চরণে চরমে সমাধি-সাধনে
(আমার) সেই ত সমর হবে॥

বেদনার এই অস্পষ্ট উচ্ছ্বাস বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া দূরে মহেশ্বরীর নৌকার উপর ভাসিয়া-ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার কর্ণে সুস্পষ্টভাবে বাজিয়া উঠিল। মহেশ্বরী নৌকার দ্বারপথে মুখ বাড়াইলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে মুক্তার ঝুরির মতন কয়েক বিন্দু জল নদীর জলের সহিত যাইয়া মিশিল। তিনি মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৈল, কে গায়?"

অজানা স্থানে মহেশ্বরীর অসঙ্গত প্রশ্নটা যে কেবল একজনকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইল, শৈল তাহা বুঝিতে পারিল। কিন্তু এই জনহীন প্রান্তরের পথে এরূপ মনে করিবার সে কোনো হেতুই দেখিল না। সে বলিল, "পথে ঘাটে কোথায় কে গাচ্ছে তার কি কিছু ঠিক আছে, মা?"

সঙ্গীতটি এবার আর-একটু সুস্পষ্ট হইল। কে যেন সন্ধানে সন্ধানে মহেশ্বরীর নাগাল পাইয়া তাহার এই বহুদিনের আ[illegible] জন্য তাহার শেষ কথাগুলা [illegible] -ষণ করিতে লাগিল,—

থেকে থেকে কার স্মৃতি আসে ভেসে
বাতাসে ? রবে—
কলঙ্ক লাগিয়া কলঙ্ক কিনেছ মা
তুমি মা নীরবে॥
* কে আমি—কেন এ পান্থ নিবাসে
আঁধারে কি র'বে—
চিরদিন কি মা, সুগভীর শ্বাস
বক্ষ ভরি' র'বে॥

মহেশ্বরী কহিলেন, "শুধু গান নয়, প্রাণের কথা যেন টেনে টেনে বের করছে। তোমরা একবার দেখ্‌লে পারতে।"

শৈল কহিল, "মাঝ-গাঙ দিয়ে চলেছে, অকারণ এখন কূলে ভিড়্‌তে গেলে দেরী হয়ে যাবে, মা। চারিদিকে মাঠ আর জঙ্গল—এখানে সে আস্‌বে কি কর্‌তে? ও আর কেউ হবে বোধ হয়।"

ক্রমে সে গীতধ্বনি মহেশ্বরীর কর্ণে অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া গেল,—

(আমায়) দিতে কি যন্ত্রণা করিছ মন্ত্রণা
মরণ-উৎসবে—

(ও মা) তোমারি নন্দনে নিবিড় বন্ধনে
বেঁধেছ কেন তবে॥

মহেশ্বরী স্তব্ধ হইয়া ডাঙার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। নৌকাখানি কানাইলালকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

* * * * *

তাঁহাদিগের নৌকা ঘাঁটাল আসিয়া পৌঁছিলে বলাই ও গোকুল কানাইলালের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। তাহারা খোঁজ করিয়া প্রথমতঃ হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর নিকট পৌঁছিল। তিনি তাহাদের সঙ্গে একটি লোককে দিয়া কানাইলাল যে-মহাজনের কুঠীতে কাজ করিত তথায় পাঠাইয়া দিলেন। মহাজন বলিলেন, "কানাই-বাবু আমার এখানে কাজ করেন। আজ তিন দিন তিনি কাজে আসেননি। গণপতি মিত্রের বাড়ীতে তিনি থাকেন। সেখানে গেলে দেখা পেতে পারেন।"

তার পর তাহারা সেখানে আসিয়া শুনিল যে, কানাই আজ তিন চার দিন বাসায় যায় নাই। কোথায় আছে, তাঁহারা বলিতে পারেন না।

গণপতি তখন বাড়ীতে ছিলেন না। নলিনীই বাড়ীর মধ্য হইতে এই কথা শুনাইয়া দিল। কানাই-দা'র খোঁজে দল বাঁধিয়া এমন করিয়া কাহারা আসিয়াছে ভাবিয়া সে ব্যাকুল হইল; আবার তাহারা কানাই-দা'র যে আপনার জন ইহা বুঝিয়া অনেকখানি নিশ্চিন্তও হইল।

তাহারা তখন নিরাশ হইয়া নৌকায় ফিরিল এবং মহেশ্বরীকে সকল কথা বলিল। মহেশ্বরী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া শুনিলেন। এত কাছে আসিয়াও মিলিল না; ভবিতব্য বুঝি তাকে এম্নি করিয়াই দূরে সরাইয়া রাখিবে। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "তিন-চার দিনের কথা যখন—তখন হয়ত সে এই সহরেই আছে। খেয়ে দেয়ে দুই খুড়ো-ভাইপো আবার সন্ধান ক'রে দেখো।"

আহারাদি শেষ করিয়া বলাই ও গোকুল আবার বাহির হইয়া পড়িল। যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, দেখিল তাহারা প্রায় সকলেই কানাই-লালকে চিনে। কেহ বা দুইদিন আগে দেখিয়াছে; কেহ বা বলিল, তিনদিন হইল তাহার একটি ছেলেকে চিকিৎসা করিতে সে তাহাদের বাড়ীতে গিয়াছিল। কেহ সেই অগ্নিকাণ্ডের কথাই বলিল। কিন্তু তাহার বর্ত্তমান অবস্থিতির কথা কেহই বলিতে পারিল না। সমস্ত সহরটি যখন তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা শেষ হইল, তখন সন্ধ্যাকালে তাহারা নৌকায় ফিরিল। পরদিন প্রাতঃকালে নৌকার ধারে একটি বালককে খেলিতে দেখিয়া মহেশ্বরী তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, "কানাই-বাবুকে খুবই চিনি। তিনি আমার স্কুলের মাহিনা-পত্তর দিয়ে থাকেন।"

মহেশ্বরী ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এবার কোন্ তারিখে মাহিনা দিতে তোমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন?"

"বাড়ীতে যান্ না। আরও ছেলেরা তাঁর নিকট বেতন পায় কি না? তিনি প্রতি মাসে ঐ তারিখে স্কুলে গিয়ে আমাদের প্রধান শিক্ষকের হাতে সকলেরই বেতন এক সঙ্গে দিয়ে এসে থাকেন।"

"সকলের বল্‌ছ—স্কুলের সকল ছাত্রই কি তাঁর নিকট বেতন পায়?"

"না। যারা পড়াশুনার খরচ চালাতে পারে না, তারাই পায়। শুধু আমাদের স্কুল্ নয়। এখানে যে-কটি স্কুল-পাঠশালা আছে, সব ক'টিরই গরীবের ছেলেরা তাঁর কাছে কিছু-কিছু পায়।"

মহেশ্বরীর চক্ষু সজল হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাবো বলো দেখি?"

"তিনি থাকেন গণপতি-বাবুর বাড়ীতে। আর বাজারে এক মহাজনের ঘরে কাজ করেন।"

মহেশ্বরী বলিলেন, "সে-সব জায়গা আমরা দে'খে এসেছি—কোথাও পাইনি।"

বালক কহিল, "তিনি আবার ডাক্তারিও করেন। কখন্ কার বাড়ী থাকেন, কিছু ঠিক নেই।"

মহেশ্বরী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তারি করেন ?"

"হাঁ। খুব ভালো লোক তিনি। পয়সাকড়ি কা'রও কাছ থেকে নেন্ না। এখানকার সকলেই তাঁকে খুব ভালোবাসেন। সেদিনকার আগুনের কথা জানেন না ? তিনি না থাক্‌লে ঐ যে অতবড় বাজারটা দেখ্‌ছেন, সমস্তই পু'ড়ে ছার্‌খার হ'য়ে যেত।"

মহেশ্বরীর প্রাণ আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি বালককে নৌকার উপর ডাকিলেন। বালক আসিলে তিনি পুত্রবধূকে বলিল, "শৈল, একে কিছু খেতে দাও।"

শৈল বালককে কিছু জলযোগ করাইল। মহেশ্বরী তাহার কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁর বয়স কত হবে বলো দেখি ?"

বলাইকে দেখাইয়া সে কহিল, "ঐ বাবুটিরই মতন।"

"গায়ের রং ?"

"ফর্শা। কেন আপনারা তাঁকে দেখেননি ?"

"দেখেছি। আমরা এখানে নূতন এসেছি। তুমি আর কারও কথা বল্‌ছ কি না, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।"

বালকটি বলিল, "আর কার কথা বল্‌ব ? কানাইলাল মজুমদার ত, এ সহরসুদ্ধ লোক সবাই তাঁকে চিনে।"

[illegible] একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

[illegible] জিজ্ঞাসা করিল, "আমি এখন যাই ?"

মহেশ্বরী বলিলেন, "একটু বোস। তাঁকে তুমি কতদিন আগে দেখেছ বলো ত, বাবা?"

"এই ত চার-পাঁচ দিন আগে দেখেছি।"

"আচ্ছা! আগে যে-রকম দেখেছ, এখনও কি সেই-রকমই আছেন? শরীর-টরির খারাপ হয়নি?"

বিস্মিত বালক বলিল, "একটু খারাপ হয়েছে ব'লেই বোধ হয়। সেদিন মাঠের ধারে অনেকক্ষণ বসেছিলেন, মনও সেদিন খুব খারাপ দেখেছিলাম। আমি এখন যাই, বাড়ীতে একটু কাজ আছে।"

বালক চলিয়া গেলে মহেশ্বরী কাঁদিয়া ফেলিলেন। শৈল তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। একটু সুস্থ হইলে মহেশ্বরী কহিলেন, "সে এ-সহর ছেড়ে চ'লে গেছে' কি না তোমরা খেয়ে স্কুল-পাঠশালাগুলিতে একবার খবর নেবে। যদি সন্ধান না পাও, রমাপ্রসাদ-বাবু ও মহাজনের নিকট ব'লে আস্‌বে যে, সে এলে কল্‌কাতায় আমাদের যেন একটা সংবাদ দেন। ঠিকানা রেখে এস। আর একথা কানাইকে বল্‌তে নিষেধ ক'রে দিও। বোলো,—বাড়ীতে মা'র সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছেন।"

বলাই ও গোকুল পুনরায় সন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। মহেশ্বরীর সাম্‌নে যাইতে তাহাদের ভরসা হইতেছিল না। কিন্তু যাইতে হইল, নিষ্ফল চেষ্টার কথাও বলিতে হইল। তারপর নৌকাখানি রাণীচক অভিমুখে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

মহেশ্বরী আর একটি কথাও বলিলেন না। কিন্তু কপালের করাঘাতটা যখন অন্তরের মধ্যেই বাজিতে থাকে, তখন যত অন্তরেই সে বাজুক না কেন, মুখ ও চোখ হইতে তাহার ছাপ্‌টা লুকাইয়া রাখিতে পারা যায় না। শৈল বসিয়া-বসিয়া তাহার শ্বশ্রূর হৃদয়ের তাপ অনুভব করিতে

লাগিল। তিনি নৌকার এককোণে বসিয়া নদীর জলের দিকে অন্যমনে চাহিয়া রহিলেন।

নৌকাখানি ঘাটাল-সহর ত্যাগ করিয়া অনেকটা পথ আসিলে গোকুল একবার ডাঙ্গায় উঠিল। সে ফিরিবার সময় দেখিল, একটি লোক গাছের তলায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। সে নৌকায় আসিয়া সে-কথা বলিতে বলাই ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ডাঙ্গায় যাইয়া উঠিল; এবং দ্রুতপদে গোকুলের সঙ্গে সেই গাছতলায় যাইয়া দেখিল, লোকটি মাটির দিকে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে, হাত-দু'খানি মাথা বেড়িয়া থাকায় মুখখানি ঢাকা পড়িয়াছে। বৎসরাধিকাল চিন্তায়-চিন্তায় কানাইলালের দেহ অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তথাপি বলাই দেখিল, অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই যেন তাহার কানাই-দা'রই মত। সে তখন আনন্দে অধীর হইয়া দৌড়াইয়া নৌকার নিকটে আসিল, এবং মহেশ্বরীকে ডাকিয়া কহিল, "বড় মা! ঠিক যেন কানাই-দার মত—তুমি বেরিয়ে এস, শীগ্‌গিরি এস, দেখ্‌বে।"

মহেশ্বরী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহার পরিহিত বস্ত্রখানি অঙ্গের কোথায় রহিল—কোথায় রহিল না—জ্ঞান নাই। শৈলও পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিল।

প্রাণে যাহার ক্ষুধা জাগিয়া আছে, তাহার কি বস্তু নির্ণয় করিতে বিলম্ব হয়? দূর হইতেই মহেশ্বরী শীর্ণ বালকের দেহ দেখিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি মাটির উপর বসিয়া-পড়িয়া কানাইলালের নিদ্রাচ্ছন্ন মুখখানি ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

কানাইলালের তখনও নিদ্রা ভাঙ্গে নাই। দুই-তিনটি রাত্রি সে গাছতলায় একরূপ অনাহার ও অনিদ্রায় যাপন করিয়াছিল। মহেশ্বরী দেখিলেন, তাহার চক্ষু কোটরগত, মুখমণ্ডল বিবর্ণ এবং নিদারুণ ক্ষুধার

জ্বালায় তাহার দেহের সমস্ত সৌন্দর্য্য শুকাইয়া তাহাকে কাঙাল ভাগ্যহীনের মত বিশ্বের করুণ দৃষ্টির কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছে!

মহেশ্বরী তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিলেন, "কানাই!"

কানাই চক্ষু মেলিল। দেখিল করুণা ও শুচিতার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা—অনাথ-জননী—তাহাব মহেশ্বরী-মা সারা সংসারের স্নেহ চক্ষে লইয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। কানাইলাল চক্ষু মুদ্রিত করিল। হায়! হায়! এমন বিশ্ব-জননীকে দুই হস্তে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সে আজ স্বেচ্ছায় সঙ্গীহাবা পথহারা হইয়া পড়িয়াছে। মূর্খ সে—এমন মা'র উপর অভিমান কবিয়াছিল। কানাইলাল পুনরায় যখন চক্ষু মেলিল, তখন অশ্রুধারা তাহার গণ্ডদেশ সিক্ত করিয়া সমুদ্রের মত বহিয়া যাইতেছিল। আনন্দে লজ্জায় বেদনায় তাহার অন্তর মথিত হইয়া উঠিতেছিল।

মহেশ্বরী কহিলেন, "ছিঃ! ছিঃ! এত অভিমান তোমার?"

নয়নাশ্রুর মধ্য দিয়া একটা স্নিগ্ধ অনুযোগ যেন কানাইলালের দুই চক্ষুব উপর ফুটিয়া-ফুটিয়া বাহিব হইতে লাগিল। তাহার বেদনার ভিতর, লজ্জার ভিতর এখনও অভিমান উঁকি দিতেছিল।

মহেশ্বরী তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিতে-দিতে কহিলেন, "অবোধ ছেলে! মায়ের উপর অভিমান—এ যে অতি-লোভের চূড়ান্ত পুরস্কার! এতে কি শুধু মায়ের প্রাণ জ্বলে? নিজেও যে ভাজা-ভাজা হ'তে হয়।"

কানাই এবার কথা বলিল। কহিল, "তুমি আমায় ফেলে চ'লে যেতে পার্‌লে—একা—এই পথের মাঝখানে—" তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। মহেশ্বরীর ক্রোড় হইতে মস্তক নামাইয়া লইয়া সে আবার মাটির দিকে মুখ গুঁজিয়া পড়িল।

"তা'র প্রতিশোধ বুঝি এম্‌নি ক'রে দিতে হয়? একবার দেখ্‌তেও ত হয় যে কেন গেল?"

কানাই শুষ্কমুখে সেইরূপ মুখ গুঁজিয়াই কহিল, "তুমি যেতে পার—আর আমি পারিনে?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "শোন্ শৈল! একবার কথা শোন্; আমি ত বেশী দূর যাইনি—আর তুই যে—যাতে বুকখানা খালি হয়, ততদূরে চ'লে এলি?"

কানাই কহিল, "না—বেশী দূর যাও নি! সেতুবন্ধ বুঝি কম পথ,—সে ত ভারতবর্ষটা ছেড়ে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "ভারতবর্ষ ছেড়ে গেলেও আমি যে তোবই কাছে ছিলাম। কিন্তু তুই যে পৃথিবী ছেড়ে যাবার আয়োজন করেছিস্?"

কানাইলালের শরীরের দিকে চাহিয়া মহেশ্বরীর চক্ষু-দু'টি জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "ক'দিন খাস্‌নি? নে—নৌকায় চল্। আর কথা-কাটাকাটিতে কাজ নেই। এখন আগে মুখে জল দিবি চল্।"

কানাইলালের চক্ষু দিয়া ঝলকে-ঝলকে জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে বলিল, "আমি যাব না—"

মহেশ্বরী কহিলেন, "যাব না কি রে? তবে কোথায় যাবি?"

"যেখানে ইচ্ছে।"

"এই ইচ্ছেটা যতদিন তোমার না যাবে, ততদিন দুঃখ ঘুচ্‌বে না।"

কানাইলাল কহিল, "ঘুচুক—না ঘুচুক, তোমার তাতে কি?"।

মহেশ্বরী হাসিয়া কহিলেন, "আমার যে কি—তা' মনে-মনে বেশ জানিস্। নে—এখন মান রাখ্—নৌকায় চল্। কিছু খেয়ে আগে সুস্থ হ'—তারপর ঝগ্‌ড়া কর্‌বি।"

বলাই কানাইলালের হাত ধরিয়া কহিল, "কানাইদা! কি আবোল-

তাবোল বক্‌ছ? বড়-মার কি সেতুবন্ধ যাওয়া হয়েছে নাকি? তুমি যেমন পাগল, তাই বিশ্বাস কর্‌লে। আজামশাই ত যত গোল বাধালে। আস্‌ছে-আস্‌ছে ব'লে নাম্‌তে দিলে না। তার পর বড়-মা কেঁদে-কেটে পবের ষ্টেশনে নেমে পড়্‌লেন। কল্‌কাতায় এসে কত খোঁজা-খুঁজি—তুমি যে লম্বা দিয়েছ তা' কি আর পাবাব যো ছিল? এই এক বছরের মধ্যে আমরা কেউ দেশে-ঘরে যাইনি—কেবল প'ড়ে-প'ড়ে তোমারই খোঁজ কর্‌ছি।"

কানাই উঠিয়া বসিল। বলাইকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে কহিল, "বলা, আয় ভাই, চেয়ে ত্থাখ্‌ আমার চারিদিকে—আমি কতটা একলা হ'য়ে পড়েছি! ছোট-মা—"

এই বলিয়া সে শৈলবালার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

শৈলবালা কহিল, "ছিঃ! বাবা; আমাদের এমন ক'রে কাঁদাতে আছে? তুমিও পর হওনি—আমরাও হইনি। কপালে দিন কতক ভোগ ছিল, তাই হ'য়ে গেল। চল বাবা! নৌকায় চল।"

কানাইলাল মহেশ্বরীকে দেখাইয়া কহিল, "ওই বুড়ীর কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, ক্ষমা কর্‌তে পেরেছে কি না! আর তোমরাও আমাকে—"

মহেশ্বরী দুঃখের সহিত হাসিয়া কহিলেন, "হাঁরে পাগ্‌লা! এখানে ক্ষমা ছাড়া যে কিছুই নেই। কিন্তু তুই যে-রকম কাঁদিয়েছিস্‌, তাতে কষে-কষে তোর পিঠে পাঁচ বেত মারা উচিত।"

কানাইলাল কহিল, "তা ত তুমি কতই পার? তাই পিঠে একটা বেত পড়্‌তে দেখে ক'দিন খাওয়া-নাওয়া ত্যাগ করেছিলে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "আমি মার্‌তে যাব কেন? মার্‌বার লোক এবার জোগাড় কর্‌ছি। এবার এমন বন্ধনে বেঁধে ফেল্‌ব, যাতে এক'পাও নড়্‌তে না পারিস্‌।"

কানাই এবার হাসিয়া কহিল, "তুমি যে-বন্ধনে বেঁধেছ মা, তা'র উপর আর কেউ বন্ধন আঁটতে পার্‌বে না।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সেইটে বুঝি এবার প্রমাণ করে' দিলি ?"

কানাই কহিল, "আমি কি প্রমাণ কর্‌তে পারি, মা ? তুমিই বেঁধেছ—তা'রই জোরে আজ আবার কাছে পেয়েছ। ছিঁড়্‌তে গিয়েও ফির্‌তে হ'ল।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "যা', আর বাচালতা কর্‌তে হবে না। শৈল, যাও ত, মা! লুচি-সন্দেশ কি আছে—ওকে আগে খেতে দাও।"

সকলে নৌকায় উঠিলে নৌকা তীর ছাড়িয়া চলিল।

কলিকাতায় আসিলে কানাই বলিল, "আমি দিনকতক এখানে থেকে সহরটা দেখে-শুনে যাব।"

তাহাই স্থির হইল। একদিন সে মহেশ্বরীকে কহিল, "বড়-মা, ঘাটালে আমার এক বোন্ আছে—নাম নলিনী। তারা বড় গরীব। আমার একটা প্রধান কর্ত্তব্য হয়েছে তার বিয়ে দেওয়ান। কি হ'বে, বড়-মা ?"

"তারা কি বামুন ?"

"না। মিত্র।"

মহেশ্বরী একবার চমকিয়া উঠিলেন। কে এ মেয়েটি ? কিন্তু কানাইএর মুখের দিকে চাহিয়া মনের প্রশ্ন মনেই চাপিয়া গেলেন।

মহেশ্বরী তাঁহাদেরই গ্রামে একটি পাত্র স্থির করিয়া উভয়পক্ষের অভিভাবকগণের সহিত পত্র-ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কথাবার্ত্তা স্থির হইলে দুই পক্ষেই পাত্র ও পাত্রী সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় মহেশ্বরীর বাসা-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুখেন্দুও আসিলেন। নলিনীকে দেখিয়া মহেশ্বরীর মনটা আবার

কাঁদিয়া উঠিল। এই যে ঠিক উপযুক্ত হ'ত ; কিন্তু উপায় নেই। পরকে দিয়া মুখ বুজিয়া থাকিতে হইবে। তার পর নির্দ্দিষ্ট দিনে সম্পূর্ণ মহেশ্বরীর ব্যয়েই শুভকার্য্য নিষ্পন্ন হইল। কানাই একা দশ জনের কাজ করিল। মহেশ্বরী বর ও বধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নলিনীর কৃতজ্ঞ চক্ষু-ছ'টি কানাইলালের প্রতি সজল হইয়া উঠিল। সে মিষ্ট করুণ হাসিতে চক্ষু-ছুটি ভরিয়া বার-বার কানই-দাকে দেখিল, কিন্তু আগের মত তেমন করিয়া গল্প করিতে পারিল না। হাসিয়া-কাঁদিয়া অধীর হইয়া নীরবেই সে কানাই-দার কাছে বিদায় লইয়া শ্বশুর-গৃহে চলিয়া গেল।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেখিতে-দেখিতে আরও তিনটি বৎসর অতীত হইল। সুখেন্দুর বিষয়-কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণের ভার এখন কানাইলালের উপর। সে যেমন স্থায়নিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ, তেম্নি শিষ্ট, শান্ত ও বিনয়ী। তাহার মনের যে একটু উচ্ছৃঙ্খল ও চঞ্চল ভাব ছিল, এই বড় আঘাতটা পাওয়ার পর হইতে তাহা অতিমাত্রায় সংযত হইয়াছে। সে এখন বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া কোনো কাজই করে না। গ্রামবাসী সকলেই তাহার উপর সন্তুষ্ট ও শ্রদ্ধাবান্।

মনিবের সহিত প্রজাদের কোনো গোলযোগ ঘটিলে তাহারা কানাই-লালকে আসিয়া ধরিত। তাহারা জানিত—কানাইলাল মধ্যস্থ থাকিলে একটা সুবিচার হইবে। এইরূপে কানাইলালের সংসর্গে থাকিয়া সুখেন্দুর চরিত্রেরও অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

সুখেন্দুর বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে কানাইলালকে এখন প্রায়ই জমিদারির বিভিন্ন অংশে যাইতে হইত। সে কত বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের ভিন্ন-ভিন্ন আচার-ব্যবহার দেখিত। কেহ জল ছুঁইতে পায়—কেহ পায় না। কেহ ঘরে উঠিতে পায়—জল ছুঁইতে পায় না। আবার খাদ্য-সম্বন্ধেও জাতি-বিশেষে কত ইতর-বিশেষ হয়। কোনো কোনো খাদ্য একে যাহা খায়, অন্যের তাহা অখাদ্য। শিক্ষা, সংস্রব ও অভ্যাসের ফলে চরিত্রেরও বা কত ইতর-বিশেষ হয়।

কানাইলালের সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ-মুহুরী প্রায়ই থাকিতেন। তিনি কাছারী-বাড়ীতে রান্নাবান্নার কাজও করিতেন। এই ব্রাহ্মণ যুবকটি তাঁহার আচার-রক্ষার জন্য বিভিন্ন-জাতীয় লোকের সহিত যে ব্যবহার করিতেন, তাহা দেখিয়া কানাইলাল এইসকল জাতির শ্রেষ্ঠতা, নীচতা, ও হীনতার একটা ক্রম পাইত। তাহা ছাড়া নিজে স্বচক্ষে তাহাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়াও অনেকটা বুঝিয়া লইত। তাহার বয়স হইয়াছিল—বাংলা দেশে জন্মিয়া, মা'র আঁচলের বাহিরে আসিয়া, জাতিভেদ ও উচ্চ-নীচের প্রভেদ বুঝিতে তাহার কিছু বাকি রহিল না।

কানাইলাল প্রতি গ্রামের পাড়ায়-পাড়ায় কাজে-অকাজে ঘুরিয়া বেড়াইত, অনেক জাতি দেখিত। কিন্তু যে জাতিটার পরিচয় জানিবার জন্য তাহার মনে একটা প্রবল আগ্রহ ছিল, সেই বাগ্দী জাতিটা সে কোথাও দেখিতে পাইত না। কাহাকেও সাহস করিয়া জিজ্ঞাসাও করিতে পারিত না।

সে চাক্ষুষ দেখিতে না পাইলেও, এই যে সব অনাচরণীয় জাতি নিত্য তাহার সম্মুখে পড়িতেছে, ইহাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া তাহাদেরও আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি কেমন—এবং সমাজে তাহাদের স্থান কোথায়, সে সবই—কল্পনাবলে সে অনেকটা বুঝিয়া লইতে পারিত।

যে-আকাঙ্ক্ষা লইয়া সে আজ এই বিশুদ্ধ জ্ঞান ও নির্ম্মল চরিত্রলাভে সমর্থ হইয়াছিল, এইসব দেখিয়া-শুনিয়া পূজাগৃহে যাইবার এবং রান্নাঘরে ঢুকিবার সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষাটা আপনা হইতে তাহার হৃদয়ের কোন্ দূরদেশে যাইয়া থিতাইয়া পড়িয়াছিল। বরং এই ব্রাহ্মণ-পরিবার যে তাহার কত-কত অন্যায় ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া তাহাকে ঘরের ছেলের মতন আদরে-যত্নে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া নিয়ত তাঁহাদের চরণের ধূলি হইয়া থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইত।

কানাইলালের মনে এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায়, সে এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের কাছে সর্ব্বদা হীন জাতির মতন এমন সঙ্কুচিত হইয়া চলিতে আরম্ভ কবিল যে, এই শিক্ষিত ও শিষ্ট যুবকের তেমন ব্যবহাব পাইয়া সকলে লজ্জা পাইতেন। আপনার পদোচিত মর্য্যাদা ভুলিয়া অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে জাতির হিসাবে কানাইলাল যেরূপ সমাদব কবিয়া চলিত, তাহাতে তাঁহারাই সময়-সময় কুণ্ঠিত ও বিব্রত হইয়া পড়িতেন।

বাগ্দী-জাতি নীচ, মনে-মনে ইহা ধারণা করিয়া লইলেও, সে জাতি-হিসাবে যে কত নীচ—কত হীন, তাহা স্বচক্ষে দেখিবাব ও ভালো কবিয়া বুঝিবাব তাহার দৃঢ় সংকল্প ছিল। তাহার এই উচ্চ পদ এবং নির্ম্মল চরিত্র এই দু'য়ে মিলিয়া-মিশিয়া তাহাকে এ-বিষয়ে আবও অধিকতর অন্ধ করিয়া রাখিবার সুযোগ দিয়াছিল; কেননা গ্রামেব কোনো লোকই কোনো দিন তাহার জাতি-সম্বন্ধে ঘাঁটাঘাঁটি কবিয়া তাহার নিকট সেটি স্পষ্ট করিয়া তুলিতেন না। বরং তাহাকে যথেষ্ট সম্ভ্রম ও সম্মান করিতেন। এবং সে যে ব্রাহ্মণ-পবিবারের ঘরেব ছেলের মতন প্রতিপালিত হইয়াও আপনার জাতির বিশিষ্টতাটুকু রক্ষা কবিয়া চলিতেছে, ইহা ভাবিয়া সকলে বিস্মিত ও পুলকিত হইতেন। তাহার আচরণ দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিতেন না যে, এই যুবক তাহার জাতি সম্বন্ধে নিতান্ত অন্ধ।

একদিন সুখেন্দু কহিলেন, "কানাই! তুমি জমিদারির কাজকর্ম্ম সব দেখ্‌ছ—অথচ তোমার নির্দ্দিষ্ট আসনে তুমি বসো না। সাধারণ কর্ম্মচারী-দের মধ্যে ব'সে কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করো—এমন কর্‌লে তোমার সম্মান থাক্‌বে কেন?"

কানাই হাসিয়া কহিল, "আজ্ঞে, সম্মান দিয়ে কি হবে? কাজ চল্‌লেই হ'ল। যাঁরা আমায় সম্মান কর্‌বেন, তাঁদেব প্রাপ্য সম্মানটুকু না দিয়েও ত পারিনে।"

সুখেন্দু কহিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ, বোঝো না, এসব কাজে একটু রাশপসার রাখ্‌তে হয়।"

কানাই কহিল, "কিন্তু নিজেকে সকলের কাছে একটা ভয়ের বস্তু ক'রে তোলাও উচিত নয়। তা'তে অনেক সময় প্রাণের কথা প্রাণেই থেকে যায়—কাজ ভালো হয় না।"

সুখেন্দু কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "যদুখুড়োর সুদের টাকাটা নাকি বেকার ছেড়ে দিয়েছ?"

কানাই কহিল, "হাঁ। আসলই তাঁর দেবার চারা নেই। আমি নিজেই দেখেছি, পাঁচ-সাত দিন অন্তর তাঁর প্রায়ই এক আধ দিন উপোস যায়। তবে আসল টাকাটা পড়্‌বে না। আমি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তাঁকে একখানা মুদীখানার দোকান ক'রে দিয়েছি। তিনি লাভের টাকা থেকে মাসে-মাসে পাঁচ টাকা ক'রে আসলের বাবদে দেবেন।"

সুখেন্দু একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না।

মহেশ্বরীর প্রাণেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কানাই-লালের বয়স হইয়াছে—সে শিক্ষায় স্বভাবে সকল বিষয়েই কৃতী হইয়াছে। তাহাকে সংসারী করিতে মহেশ্বরীর প্রাণে প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু অতি কদর্য্য আচার-ব্যবহার যে-জাতিটার অস্থি-মজ্জায় জড়িত হইয়া আছে, তাহাদের গৃহ হইতে একটা ম্লেচ্ছ কন্যাকে আনিয়া কি করিয়া তাহার জীবনসঙ্গিনী করিয়া দিবেন? সেই মেয়েটি যদি হইত ত বেশ হইত।

কানাইলাল মজুমদার-উপাধিই লিখিত। সেই কোন্‌কালে সে ছোঁয়া-খাওয়া লইয়া প্রশ্ন তুলিলে মহেশ্বরী একদিন তাহাকে বাগ্দীর ছেলে নামে পরিচিত করিয়াছিলেন, সে-কথা কি সে আজিও মনে রাখিয়াছে? মহেশ্বরী ভাবিলেন,—সে যদি তাহার এই হীন মেরুদণ্ডের সূক্ষ্ম খবরটুকু আজ পায়, তাহা হইলে তাহার জীবনের কলরব হয়ত চিরদিনের মতন

থামিয়া যাইবে! চিরদিন উচ্চ স্থানে রাখিয়া আজ তাহাকে নিম্নের পংক্তিতে যাইয়া বসিতে বলিলে, সে-উত্তেজনার বেগ হয়ত সে সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিবে না।

কানাইলালের পরিচয় লুকাইয়া রাখিয়া পরিণামে তাহাকে ধাঁধার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া মহেশ্বরীর কোনো দিনই ইচ্ছা ছিল না। তিনি নবীনের সহিত তাহার সম্বন্ধ জানাইয়া নবীনের কত গল্পই তাহার সহিত বলিতেন। কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া কোনো দিন কিছু বলিতে পারেন নাই। ভাবিয়াছিলেন, বয়স হইলে আপনিই সে সব বুঝিয়া লইতে পারিবে। এমন-সময় তাহার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল! তাহার পর তাহাকে যখন শিক্ষায়, দীক্ষায়, স্বভাবে সকল দিকেই অতি পবিত্র অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাহাকে তাহার পরিচয় শুনাইতে তাঁহার মাতৃ-হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। তিনি এক দিন তাঁহার পুত্রবধূকে ডাকিয়া কহিলেন—

"শৈল! কানাইলালের ত একটা বে-থা দিতে হয়—কি করা যায় বল্ দেখি?"

শৈল কহিল, "তাই ত, অমন ছেলের গলায় একটা বাগ্দীর মেয়ে কি ক'রে এনে গেঁথে দেওয়া যায়?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তা-ছাড়া আর উপায় কি?"

শৈল কহিল, "না মা, আজন্ম কুমার থাকে সেও ভালো, সে যা জানে না, তা শুনিয়ে অমন একটা দুঃসহ দুঃখ তার প্রাণে ফুটিয়ে তুলো না, সে হয়ত সে-জ্বালা জুড়োবার স্থান পা'বে না।"

মহেশ্বরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কিছুই স্থির হইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কানাইলালের চিত্তের অন্তরালে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই চাঞ্চল্যের বশে সে একদিন প্রাতে অশ্বারোহণে নবীনের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। এই নবীনের সম্বন্ধে অনেক কথাই সে মহেশ্বরীর নিকট শুনিয়াছিল। সে শুনিয়াছিল, একমাত্র নবীনের সাহায্যেই তাহার পিতা-মাতার সৎকার হইয়াছিল। এবং সে এই মহদাশ্রয় লাভে সমর্থ হইয়াছিল। সে জ্ঞান হইবার পর নবীনকে কোনো দিন দেখে নাই। কিন্তু যখনই তাহার কথা স্মরণ হইত, কৃতজ্ঞতায় তাহার চক্ষু-দুটি জলে ভরিয়া উঠিত।

সুখেন্দুর জমিদারির সংলগ্ন অন্য-এক জমিদারের এলাকায় নবীনের বাস। কানাইলাল জমিদারি-পরিদর্শনে আসিয়া এক দিন প্রাতঃকালে কাছারী-বাড়ী হইতে অশ্বারোহণে একাকী নবীনের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। সে বাগ্দী-জাতির সন্ধান কবিতে-করিতে নবীনের খবরও পাইয়াছিল।

নবীন যে গ্রামে বাস করিত, তাহার নাম চাঁদপাড়া। কানাইলাল কত-কত প্রান্তর ও লোকালয় পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছিল। সুমন্দ বাতাসে তাহার অঙ্গের পরিচ্ছদ নাচানাচি করিতেছিল। পাখীরা কলরব করিতেছিল, গবাদি পশুগণ মাঠের দিকে চলিয়াছিল। সকলেই কোনো-না-কোনো কাজে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। চারিদিকে কেমন একটা আয়োজন ও ব্যস্ততার ভাব। কিন্তু তাহার চিত্ত আজ নিরতিশয় ব্যাকুল! সে বুঝি কৃত্রিমতার কৌশলে আপনার সম্মানের বোঝা ভারী করিয়া চলিয়াছে। সে-কৃত্রিমতা যে কতখানি, তাহাই জানিতে সে আজ ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার মনের এতকালের জিজ্ঞাসার মীমাংসা সে আজ

করিতে চায়। সে প্রাণের মধ্যে এমন-একটা লুকোচুরি কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতেছিল না। সে খোলাখুলিভাবে অতি নিষ্ঠুর সত্যও জানিবে। কিন্তু আজ যে তাহাতে কতখানি গ্লানি মর্ম্মে-মর্ম্মে বিঁধিয়া তাহার সহিষ্ণুতাকে দুঃসাধ্য করিয়া তুলিবে, তাহা কে জানে? মহেশ্বরীর স্নেহধারায় সে যে চির-বসন্তের মতন সুখে জীবন যাপন করিতেছিল! আজ সে জীবনকে অধঃপতিত, লাঞ্ছিত করিতে এবং হীনতার পঙ্কে তলাইয়া দিতে কি জানি কাহার ইঙ্গিতমত ছুটিয়া চলিয়াছে!

কিছুদিন হইতে তাহার মনে হইতেছিল যে এমন-একটা মিথ্যার চোরাবালির মধ্যে সে আর কিছুতেই আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু হয়ত তাহার আজিকার এই গন্তব্য-পথে এমন নির্ভরতা সে পাইবে না, যাহাকে ভর করিয়া সে যেমনটি ছিল, তেমনটি থাকিতে পারিবে। কিন্তু এই অকারণ লুব্ধতায় যে আত্ম-পরিচয় লুকাইয়া রাখিতে চায়, সে গৌরবের নামে আপনার মহামূল্য সম্পদ্‌টাই হারাইয়া ফেলে। জাতির গায়ে কোনো দুর্গন্ধ নাই। দুর্গন্ধ—সে কেবল আচার-ব্যবহার ও কর্ম্মের দোষে। তাহার মনে আপনার জাতিটার উপর যখন একটু সহানুভূতির ভাব আসিতেছিল, তখন একটা করুণ আনন্দের সুর প্রাণের মাঝে বাজিয়া তাহার চিত্তের সমস্ত অন্ধকার ও নিরানন্দকে ঠেলিয়া ফেলিয়া জীবনের সত্যকার পরিচয় পাইবার বাসনাকে সার্থক করিয়া তুলিতেছিল। অন্তরে এইরূপ তুমুল ঝড় তুলিয়া, কখনো উৎসাহে, কখনো অবসাদে টলিতে-টলিতে সে নবীনদের গ্রামে চাঁদপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

একটি পুষ্করিণীর ধারে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, দুইটি বালক ছিপ লইয়া মাছ ধরিতেছে। কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "নবীন-বাগ্দীর বাড়ী কোন্ দিকে?"

ছেলে দুইটি কিছুক্ষণ তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। পরে একটি বালক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি জমিদারের লোক?"

কানাই বলিল, "হাঁ।"

বালক বলিল, "সে যে বাগ্দী-পাড়ায়। ঐ বাঁদিকের রাস্তা ধ'রে যাও।"

"কত পথ হবে?"

"কত পথ আর হবে—যুগীপাড়া ছাড়ালেই ত বাগ্দীপাড়া।"

কানাইলাল অশ্বের মুখ বামদিকে ঘুরাইয়া দিল এবং মৃদুগতিতে চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহার গতি আরও মন্থর হইয়া আসিল। সে যেন তাহার নিজের ঐশ্বর্য্য নিজেই লুণ্ঠিত করিয়া শূন্য ভাণ্ডারের নগ্ন মূর্ত্তি দেখিতে চলিয়াছে! সে তখনও ভালো বুঝিতে পারিতেছিল না যে, কোন্ ক্ষীণ লালসার মোহে সে আপনার জয়-শ্রী হরণ করাকেই লক্ষ্মী-শ্রী বলিয়া মনে করিতেছে! কিন্তু শুধু স্বপ্নের মতন একটা আভাস কিছুদিন হইতে তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল যে, তাহার এই সুখ-শান্তির অন্তরালে একটু সত্যের কণ্টক গভীর অবসাদে যেন লুকাইয়া আছে, তাহা একদিন-না-একদিন মর্ম্মান্তিক হইয়া তাহাকে বিদ্ধ করিবেই। তাই সে তাহার সুখ-লালসা পরিত্যাগ করিয়া দুঃখের সহিত পরিচয় করিতে দীর্ণ-হৃদয়ে এমন ব্যগ্র হইয়া ছুটিয়াছে।

সে যখন বাগ্দীপাড়ায় আসিল, তখন বেলা মাথার উপর। সে প্রথমতঃ পরাণ-বাগ্দী নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কোম্পানীর লোক ভাবিয়া পরাণ শশব্যস্তে একখানি খাটিয়া টানিয়া আনিয়া তাহাকে বসিতে দিল এবং নমস্কার করিয়া কিছুদূরে যাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কানাই কহিল, "দাঁড়ালে কেন? বসো।"

পরাণ না বসিয়া দাওয়ার উপরে উঠিয়া একছিলিম তামাক সাজিল এবং একটুকরা কলার পাতা আনিয়া কল্‌কেটা তাহার সম্মুখে ধরিল।

কানাই কহিল, "আমি তামাক খাইনে।"

পরাণ তখন আপনার ডাবা হুঁকাটিতে কল্‌কে পরাইয়া কানাইলালের সম্মুখে বসিয়া ধুম উদ্গীরণ করিতে লাগিল। সে কহিল, "আপনারা ?"

কানাই বলিল, "আমরা এই তোমাদেরই মতন মানুষ আর কি !"

পরাণ সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "আমাদের মতন—বলেন কি মশাই ? আমরা পশুরও অধম। আপনারা সব দেব্‌তা-লোক। তা বামুন, কি আর-কিছু—জান্‌বার মন ক'রে কথাটা বলেছিলাম।"

কানাই কহিল, "হবো একটা-কিছু। তোমরা লেখাপড়া শেখো না কেন ?"

পরাণ হাসিয়া কহিল, "নেকাপড়া শিখ্‌তে কি বিধেতা আমাদের পাঠিয়েছে ? ওসব ভদ্দর-নোকের কাজ।"

কানাই বলিল, "বিধাতা কা'কেও 'তুমি এ কর্‌বে—তুমি ও কর্‌বে, ব'লে পাঠাননি ! লেখাপড়া শিখ্‌তে কারও মানা নেই। তোমাদেব জা'তের মধ্যে কি কেউ লেখাপড়া শেখে না ?"

পরাণ কহিল, "দেখিনে ত বড়।"

কানাই দেখিল, পরাণের দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে উঠানে পা ছড়াইয়া দিয়া রোদ-পিঠ করিয়া খাইতে বসিল। পরাণের স্ত্রী তিনখানি শান্‌কে আমানি ভাত ও দুটা করিয়া মাছ-পোড়া রাখিয়া গেল। মাছ-পোড়ায় না লাগিল তেল—না লাগিল নুন—না লাগিল লঙ্কা। এঁটোর বিচার নাই ; তাহারা যে-হাতে শান্‌ক ধরিতেছে সেই হাত গায়ে-কাপড়ে মাখামাখি করিতেছে। পরিহিত বস্ত্রগুলি মৃত্তিকা অপেক্ষাও মলিন ও দুর্গন্ধ।

কানাই ভাবিতে লাগিল, "ইহারাই বাগ্দী-জাতি ! ইহাদের ধমনীতে আর আমার ধমনীতে একই রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে ? এই হীন

বাগ্দী-জাতি আমি! ইহাদের লোকে পূজা-গৃহে, রন্ধন-গৃহে ঢুকিতে দিবে কেন?" তাহার চক্ষে সমস্ত জগৎ যেন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। আজ কোন্ পথে সে পা বাড়াইবে? কোন্ পথ ধরিয়া সে চলিবে? কোনো পথ নাই! পথ নাই!

সে নয়ন মুদ্রিত করিয়া নির্জীবের মতন বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "কি অসীম—কি পবিত্র মাতৃস্নেহ এই মহেশ্বরী-মায়ের! এই হীন অনাচরণীয় বাগ্দীর ছেলেকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন! দেশ ছাড়িয়া তাহারই সন্ধানে সুদূর ঘাঁটাল পর্য্যন্ত গিয়াছেন! আত্মীয়-স্বজনের সুতীক্ষ্ণ তীর-গুলি একে-একে বুক পাতিয়া লইয়াছেন! পুত্রকে যে-স্নেহ দেন নাই, বাগ্দীর ছেলেকে তাহা দিয়াছেন!" অশ্রুধারায় তাহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। সে মনে-মনে ডাকিয়া কহিল, "মা! ওমা! মহেশ্বরী-মা! সন্তানকে পথ দেখাও!!"

সে দেখিল, এমন মায়ের বিনিময়ে সকলই দেওয়া যায়। মহেশ্বরী যে তাহাকে বাগ্দীর ছেলে জানিয়া-শুনিয়াই স্নেহ করেন! এমন বিশ্বজননীর স্নেহ হইতে সে ত কোনো দিনই বঞ্চিত হইবে না। অথচ সে শূন্যের উপর সিংহাসন স্থাপন করিয়া যেন নূতন একটা-কিছু গড়িতে চাহিতেছে!

এইরূপ চিন্তা করিতে-করিতে তাহার অন্তঃকরণ তাহার জাতিটার দিকে যখন আবার সদয় হইয়া উঠিল, তখন সে দেখিতে পাইল, এই পরাণ-বাগ্দী যে শক্তি রাখে, তাহার সে-শক্তিও নাই। একটা বিরাট্ জাতির বিশাল শক্তি এই পরাণ-বাগ্দীর পিছনে-পিছনে, আর সে? সম্পূর্ণ নিঃস্ব নিঃসম্বল। কেবল মহেশ্বরী তাহাকে একে সহস্র করিয়া রাখিয়াছেন! মহেশ্বরীর অভাবে এত বড় একটা শক্তি তাহারও পিছনে থাকিতেও সে শক্তিহীন! নিঃসম্বল!! একাকী!!!

কানাইলালকে একাকী বসাইয়া রাখিয়া পরাণ বাগানে গরু তাড়াইতে গিয়াছিল। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার থাওয়াদাওয়ার কি বিধি হয়েছে ?"

কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "নবীনেব বাড়ী কোন্‌টা ?"

"এই ত চারখানা বাড়ী পরে।"

"তা'র বাড়ী আমাকে একবার যেতে হবে !"

"আসুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

পরাণ তামাক টানিতে-টানিতে আগে-আগে চলিল, কানাই পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

নবীন ভিন্নগ্রামে এক জমিদারের সরকারে পেয়াদা-গিরির কাজ করিত। সে অনেকটা আদবকায়দা ও সভ্যতা শিখিয়াছিল। এবং তাহার কথাবার্ত্তাও অনেকটা দুরস্ত হইয়াছিল। তথাপি পরাণ যখন এই জামা-জুতা-পরা চশমাধারী ঘোড়সওয়ারটিকে অকস্মাৎ তাহার দ্বারে লইয়া হাজির করিল, তখন তাহার পর্ণকুটীরে এমন একটি ভদ্রলোককে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িল। যাহা হউক, সে কানাইলালকে বসিবার জন্য একখানি মোড়া দিয়া পরাণকেও একখানি পিঁড়ি দিল। পরাণ কহিল, "এ' রি নাম নবীন।"

নবীনকে প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি লইতে গেলে সে চকিত হইয়া দুই হাত সরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "করেন কি মশাই ?"

কানাই বলিল, "তা হোক্, তা'তে দোষ নেই।" তা'র পর উপবেশন করিয়া কহিল, "আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

নবীন এই ভদ্রযুবকের আচরণ দেখিয়া উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিল। পরাণও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। নবীন কহিল, "আমরা আপনার পায়ের ধূলোমাটি ! আমাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য কি এরূপ ব্যবহার আরম্ভ

কর্‌লেন ?” পরাণের দিকে ফিরিয়া সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় পেলে এঁকে? পাগল নাকি ?”

পরাণ মৃদুস্বরে কহিল, “না। তেমন ত কোনো লক্ষণ পাইনি।”

কানাই এসব শুনিতে পাইল। সে বলিল, “আমি পাগল নই। আপনারা বয়সে বড়। আপনাদের সঙ্গে আমাদের এইরূপ আচরণই করা উচিত। আপনি জমিদার সুখেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানেন ?”

নবীন কহিল, “খুবই জানি। মুনিব-লোক তাঁরা! জানিনে ?”

কানাই জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কোনো সময়—সে অনেক দিনের কথা—বোধ হয় কুড়ি-বাইশ বছর হবে—একটি আড়াইবছরের শিশুকে তাঁর মায়ের কাছে রেখে এসেছিলেন ?”

নবীনের সে কথা বেশ মনে ছিল। সে একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, “হাঁ। সে ত নিতাই-খুড়োর ছেলে। ছেলেটা মানুষ হয়েছে শুন্‌তে পাই। এমন কাজের ঝঞ্ঝাট যে একদিন দে'খে আস্‌তেও পারিনে। যেমন পোড়া অদেষ্ট ক'রে এসেছিল, তা বিধাতা তা'কে দেখ্‌বেন না ত আর কা'কে দেখ্‌বেন ? পেট থেকে না পড়্‌তে বাপ মা ভাই বোন সবগুলিই খেলে।”

কানাই কহিল, “আমিই সে হতভাগা—রাক্ষুসে ছেলে!”

নবীনের বিস্মিত চক্ষু-ছুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। সে আত্মবিস্মৃত হইয়া কানাইলালকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে তাহার বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। করুণার্দ্রস্বরে কহিল, “আহা! নিতাই-খুড়ো এমন ভালো মানুষ ছিল, এমন ছেলে পেয়েছে একবার দেখে যেতে পার্‌লে না! পরাণ-দা! নিতাই-খুড়োকে ভু'লে গেলে ? এখানে এলে ত তোমাদের বাড়ীতে পাত না পেতে যেত না!” কানাই পরাণের পদধূলি লইল।

পরাণ লজ্জায়, সঙ্কোচে ও পুলকে অভিভূত হইয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত-

খানি কানাইলালের স্কন্ধের উপর রাখিল। তাহারা আজ কি-বস্তুই হাতে পাইয়াছে! ইহাকে কোথায় রাখিবে—কোথায় বসাইবে—কি বলিয়া আপ্যায়িত করিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না।

নবীনের বর্ত্তমানে চাক্‌রি ছিল না। সে তাহার স্ত্রী ও পুত্রটিকে লইয়া আজ দুই বৎসর রোগের সহিত লড়াই করিতে করিতে তাহার সামান্য দু'চার পয়সা যাহা ন্যস্ত ছিল, তাহা কোন্ ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া নিদারুণ দুর্দ্দশার মধ্যে পতিত হইয়াছিল। তাহার ঘরের চালে ছাউনি ছিল না। যেখানে একেবারে শূন্য সেখানটা পাটি দিয়া আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। ছেলেটিও ঔষধ-পথ্যের অভাবে কঙ্কালসার। কানাইলাল বসিয়া-বসিয়া এই সব দেখিতেছিল।

নবীন শুনিয়াছিল যে, নিতাই-খুড়োর ছেলে লেখাপড়া শিখিয়াছে, ভদ্র-আচরণ পাইয়াছে এবং বাবুদের সরকারে বড়দরের চাক্‌রি করিতেছে। কিন্তু এ যাবৎ দেখা-শুনা করিবার কোনো সুবিধাই সে পায় নাই।

কানাইলাল গাত্রোত্থান করিয়া নবীনের হস্তে পঞ্চাশটি টাকা দিল। এবং বলিল, "আমি ত আপনার ছোটো ভাই। আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আপনি এই টাকায় একখানা ঘর বাঁধ্‌বেন। আমি সময়-মত এসে মাঝে-মাঝে দেখে-শুনে যাবো।"

নবীন কহিল, "এত বেলায়—খাওয়া-দাওয়া—"

"সে আমি কাছারী থেকে সেরে এসেছি। আবার গিয়ে খাবো। আমার খাবার সেখানে প্রস্তুত আছে। ঘোড়ায় যেতে বেশী সময় লাগ্‌বে না।"

এই বলিয়া পরাণের হস্তেও পাঁচটি টাকা দিয়া সে প্রস্থান করিল। নবীনের চক্ষু-দুটি সজল হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কানাইলালের চক্ষের ধাঁধাঁ কাটিয়া গিয়াছে। যে-শক্তি ও সাধনের বলে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ তাহার জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই স্থানে সেই অক্ষয়পীঠে যাইয়া না দাঁড়াইলে তাহার কোনো জাতি নাই—শক্তি নাই—ধর্ম্ম নাই—সান্ত্বনাও নাই। সে কেবল তাহার জাতির নিকট দুর্ব্বিনয়ের একটা চিত্র হইয়া থাকিবে। যে রক্তের মধ্যে তাহার জন্ম, সে-রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে হইলে, সেই রক্তের উপর আসন পাতিয়াই তাহাকে তপস্যা করিতে হইবে। পিতৃপুরুষের সে-সিদ্ধপীঠ ত্যাগ করিয়া আসিলে তাহার শিক্ষা, দীক্ষা ও প্রতিভা একটা আকস্মিক ঘূর্ণীবায়ুর সহিত ঘুরিয়া অবশেষে আপনা হইতেই ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। তাহার অন্তরে যখন এইরূপ একটা সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন একদিন মহেশ্বরী হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "এখন ত আর এমন উড়ু-উড়ু থাকা ভালো দেখায় না বাছা! এখন একটা বে' থা' কর।"

কানাই হাসিয়া কহিল, "সে ত তোমার বাগদীর মেয়ে নইলে হবে না!"

মহেশ্বরী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! এতদিনেও সে তাহার জাতির কথাটা বিস্মৃত হয় নাই,—শিশুকালের শোনা সেই নিষ্ঠুর কথাটি প্রাণের মধ্যে বড় করিয়া রাখিয়াছে! তাহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত পরখ করিয়া দেখিবার জন্য মহেশ্বরীর চক্ষু-দুটি অতিমাত্র ব্যথিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার বেদনাতুর মুখখানি দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহার মাতৃস্নেহের নিমন্ত্রণে বালকের সকল খাদ্য জোগাইতে পারেন নাই। তাহার বাল্যকালের জানিবার শুনিবার সেই ক্ষুদ্র চেষ্টা এখন অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া

দাঁড়াইয়াছে, এবং অন্তর-বেদীর উপর দাঁড়াইয়া বিশ্বের সহিত বোঝাপড়া করিতেছে। মহেশ্বরী কোনো কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু-দুটি তাহার প্রতি নির্নিমেষ হইয়া রহিল।

কানাই কহিল, "মা! তোমাদের স্নেহ-স্রোত সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ কর্‌তে ব্যস্ত। কিন্তু সংসারে—সমাজে তা চায় না। তুমি তোমার প্রাণ-মন্দিরের মধ্যে আমাকে মুগ্ধ পূজারী ক'রে রাখ্‌তে পারো—কিন্তু বাগ্‌দীর ছেলেকে বামুন কর্‌বার হাত তোমার নেই!"

মহেশ্বরী নিম্নস্বরে কহিলেন, "সে ত জানি।"

কানাই বলিল, "তবে যে বিশাল শক্তিটা আমার পিছনে জেগে আছে, তা থেকে আপনাকে বঞ্চিত ক'রে রাখ্‌ব কেন? এখানে একমাত্র তুমি—মহেশ্বরী-মা ভিন্ন আমার আর কেহ নাই; কিন্তু সেখানে তুমিও থাক্‌বে,—আর শত সহস্র মা-ভাইও আমাব পিছনে থাক্‌বে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তাদের আচার-ব্যবহার যে—"

"অতি নীচ—তাই বল্‌ছ? হোক নীচ—হোক্ জঘন্য; তা' ব'লে পিতৃপুরুষকে কেহ ত্যাগ কর্‌তে পারে না। আর তা-ছাড়া আমি যাবোই বা কোথায়? আমার জাতের কতটা কি শক্তি আছে, জানিনে! কিন্তু অনেক স্থলে দেখ্‌তে পাই, লোকে এক জা'ত থেকে অন্য জাতে যায়। যারা যায়, তা'রা আপনার জাতিকে কিছু দেওয়া দূরে থাক্, নিজের অঙ্গ কেটে অন্যের অঙ্গ পুষ্ট করে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "কিন্তু তোমার জাতির মধ্যে কি তেমন পরিচ্ছন্ন মেয়ে পাওয়া যাবে?"

"না পেলেও যে আমি তাই চাই। আমাব রক্তটা যেখানে প'ড়ে আছে, তা অ-স্থান হোক্, আর কু-স্থান হোক্, তা'কে মমতারই চক্ষে আমাকে দেখ্‌তে হবে।"

মহেশ্বরী বলিলেন, "তবে কি বলিস্ ?"

"আমার বলাবলি কিছু নেই—তোমারও ভাবনার কিছু নেই। আমি জা'ত ছাড়্ব না—বে-ও কর্‌ব না। আমার বাপ-মা, ভাই-বোন্ যখন অকালে চ'লে গেলেন, তখন এ-দেহটার পরে আমার আর বিশ্বাস নেই। যে কয়দিন থাক্‌ব, তোমার সেবা, দেশের সেবা, আর আমার জাতির সেবা ক'রে তোমার শ্রীচরণে আমার শক্তির পরীক্ষা দেবো।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "চিরজীবনটা সন্ন্যাসী সেজে কাটাবি ?"

"সন্ন্যাসী কেন সাজ্‌তে যাবো ? পরের গৃহ নিজের ভেবে নেওয়াই আমার জীবনে তোমার শিক্ষায় বাঞ্ছিত অবস্থা।"

"কিন্তু আমি কি তা'তে শান্তি পাবো ?"

"তুমি বেশী শান্তি পাবে। পরিবার ছেড়ে বিশাল পরিবারের দিকে যার প্রাণের শুভ আশীর্ব্বাদ ছড়িয়ে পড়েছে, সে বাইরে না হ'লেও অন্তরে আরাম পাবে।"

মহেশ্বরীর মুখমণ্ডলে চিন্তার ছায়া ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। কানাই-লাল অনেকক্ষণ চাহিয়া-চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা! কি ভাবছ ?"

মহেশ্বরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "ভাব্‌ছি, অনেক কথা,—সে আর তুই শুনে কি কর্‌বি ?"

কানাইলাল বলিল, "করা-না-করা সে পরের কথা, আগে শোনাও ত ?"

মহেশ্বরী মৃদুস্বরে কহিলেন "ভাব্‌ছি, এ তোর ঘুমের আবেশ, না জাগরণের নেশা !"

কানাইলাল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, "তোমরা চোখ-দুটি এত দূরে ফেলেও দেখ্‌তে পারো ? ঘুমোলেও তোমার ওই কোল, জাগরণেও ওই কোল, তা'র আর ভাব্‌না কি ?"

মহেশ্বরী কোনো কথা বলিলেন না।

কানাই কহিল,"মা! আমার একটা বড় সাধ হয়েছে—পূর্ণ কর্‌বে ত?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তা কি ক'রে বল্‌তে পারি? আকাশের চাঁদ ধ'রে দিতে বল্‌লে হয়ত 'আয়! আয়! চাঁদ আয়!' ব'লেই নিরস্ত হ'তে হবে।"

কানাই হাসিয়া কহিল, "সে-বয়সটা বোধ হয় তোমার এ পর্ব্বতপ্রমাণ ছেলের কেটে গেছে।"

মহেশ্বরী শঙ্কিতা হইয়া কহিলেন, "ষাট্—ষাট্—অমন কথা বলে না। এখন কি বল্‌বি, শুনি?"

কানাই কহিল, "বাস্তু ভিটায় বাপ-মায়ের প্রদীপটা যাতে জ্বলে তা ত কর্‌তে হবে।"

"আমাকে ছেড়ে যাবি বুঝি? সেখানে একলাটি কি ক'বে থাক্‌বি?"

"থাক্‌ব ত তোমারই কাছে। শুধু আমি জান্‌তে চাই যে আমাব দাঁড়ানোর একটা স্থান আছে। আর আমার পিতৃপুরুষেরা জান্‌তে চান যে তাঁদের ভিটায় প্রদীপ জ্বল্‌ছে।"

* * * * *

তা'র পর কিছুদিনের মধ্যে নিতাই-বাগ্দীর ভিটার উপর কানাইলালের এক বাসভবন নির্ম্মিত হইল। সেখানে যাহারা বাস করিতেছিল, তাহাদের অন্যত্র জায়গা-জমি দিয়া সুখেন্দু কানাইএর জন্য একটি সুদৃশ্য পাকা-বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

গৃহের নাম রাখা হইল, 'মাতৃ-নিবাস।' কানাইলাল সুখেন্দুর নিকট হইতে বেতন-স্বরূপে যাহা পাইত, আপনার গৃহে বসিয়া সে তাহা হইতে কিছু-কিছু দরিদ্রদিগকে দান করিত। অবশিষ্ট অর্থ বাগ্দী-জাতির শিক্ষার্থে—বিভিন্ন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহারই উদ্দেশে ব্যয় করিত। এইরূপে তাহার জনহীন মাতৃ-নিবাস দিন দিন দরিদ্রদিগের কলকণ্ঠে মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এমন এক-একটা সময় আসে, যাহার জন্য কেহ কোনো দিন প্রস্তুত থাকে না। অথচ সুসময় হউক দুঃসময় হউক মানুষকে সে তাহাব স্রোতে ভাসিয়া যাইতে বাধ্য করে। কানাইলালেব সম্মুখে এমনই একটা দুঃসময় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুখেন্দুর গ্রামে প্যাবীমোহন রায় নামক আর একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস কবিতেন। একটি জমির অংশ-বিশেষ লইয়া উভয় পরিবাবেব মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। কানাইলাল এই বিবাদ মীমাংসাব জন্য অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়াও কোনো পক্ষকে ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য কবিতে পাবে নাই। এক দিন সুখেন্দুব পক্ষেব লোকে ঐ জমিতে থানা কাটিতে উদ্যোগী হইলে জমিব সীমানা লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ হয়। এবং প্যাবীমোহনের পক্ষেব লোকে বাধা দেয়। মহা গোলমাল বাধিয়া গেল। সুখেন্দুর হুকুম-মতে লাঠি চালাইতে যাইয়া—প্যারীমোহনের পক্ষের একটি লোক জখম হইয়া পড়িল। কানাইলাল তথায় উপস্থিত ছিল। তাহার উপস্থিত থাকাতেই তাহার ভাগ্যেব এক বিষম পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল।

প্যারীমোহন ফৌজদারী আদালতে মোকর্দ্দমা রুজু করিলেন। এবং তাঁহার পক্ষ হইতে কানাইলালকে সাক্ষ্য মান্য করা হইল। তাঁহারা জানিতেন কানাইলাল ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ। সে কথনও মিথ্যা বলিবে না। বিশেষতঃ সে সুখেন্দুর কর্ম্মচারী ও অনুগত লোক, তাহার দ্বারা আদালতে সত্য কথা প্রকাশ পাইলে তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে কানাইলালের উপর সমন হইল; তাহা দেখিয়া সুখেন্দু চিন্তিত হইলেন। তিনি কানাইকে চিনিতেন, তাহার স্বভাব জানিতেন। এক দিন তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমাকে ত ও-পক্ষ থেকে সাক্ষী মেনেছে—"

কানাই কহিল, "হাঁ, সমন পেয়েছি।"

সুখেন্দু সহজ সুরেই বলিলেন, "তোমাকে সাক্ষী মেনে ভালোই করেছে। ফরেদীপক্ষের সাক্ষী তাদের বিপক্ষে কথা বল্‌লে আসামী পক্ষেরই সুবিধা হয়।"

কথাটা কানাইলালের পছন্দ হইল না। সে সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি বল্‌তে বলেন?"

সুখেন্দু বলিলেন, "সে এখানে তা'র কি বল্‌ব? সে জন্তে ভাবনা কি? উকীল-মোক্তারে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবে। নিজেদের বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে ত!"

"কিন্তু আমি যা জানি তা'র উপর উকীল-মোক্তার কি শেখাবে?"

সুখেন্দু হাসিয়া বলিলেন, "পাগল আর কা'কে বলে? নিজের জানাজানি নিয়ে কি মাম্‌লা মোকদ্দমা চলে? তা'হলে যে খুন ক'রেছে—সে তা' বেশ জানে—আর তা ব'লে জেলখানার পথটা সোজা ক'রে নিতে পারে?"

কানাই গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা যা'রা নেয় না—তা'রা আর-একটা জেলখানার পথও সোজা ক'রে রাখে।"

সুখেন্দু কহিলেন, "সংসারী লোকে অতদূর ভাব্‌তে পারে না। ভাব্‌তে গেলে পদে-পদে তাদের পরাজয় ঘটে।"

কানাই মৃদুস্বরে কহিল, "নিজের বিবেকবুদ্ধি বলি দেওয়ার চেয়ে সে জয় কি খুবই ভাল?"

সুখেন্দু কিছু রুক্ষস্বরেই কহিলেন, "মা দেখ্‌ছি তোমার মাথাটা একেবারে বিগ্‌ড়ে দিয়েছেন। তুমি আমায় জেল খাটাবে নাকি?"

সে নীরবে মস্তক নত করিয়া রাখিল।

সুখেন্দু কহিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ, বুঝ্‌তে পার্‌ছ না। এ-মোকদ্দমায় হার্‌লে কি আমার সম্মান থাক্‌বে?"

কানাই মৃদুস্বরে বলিল, "মিথ্যে দিয়েই যদি সম্ভ্রম কিন্‌তে হয়, তবে সে-সম্ভ্রম হাতছাড়া করা কি আপনার উচিত হয়েছে?"

সুখেন্দু দেখিলেন, সংসার-বিষয়ে অনভিজ্ঞ এই অর্ব্বাচীন বালককে বিপক্ষেরা সাক্ষী মান্য করিয়া তাঁহাকে অত্যধিক বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছে। তিনি বলিলেন, "আমারই জমি—আমি অন্যায়-কিছু করিনি।"

কানাই কহিল, "তা হ'তে পারে। কিন্তু আপনার দাঙ্গা করা উচিত হয়নি। যদি করেছিলেন—এখন ঢাকৃতে যাওয়া অন্যায়।"

ইহার পর সুখেন্দু অগত্যা মহেশ্বরীর নিকট আসিয়া কহিলেন, "মা! তোমার সত্যবাদী যুধিষ্ঠির এবার আমায় আর জেলে না পাঠিয়ে ছাড়্‌লে না!"

মহেশ্বরী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুখেন্দু কহিলেন, "প্যারী-খুড়োদের সঙ্গে জমি নিয়ে এক ফৌজদারি বেধে গেছে, শুনেছ বোধ হয়? আমার লোকজনে থানা কাট্‌ছিল, এমন সময় তা'রা এসে বাধা দেয়। শেষে আমার হুকুম-মতে একটা দাঙ্গা বেধে একজন জখম হয়। জমিদারি কর্‌তে গেলে অমন খুন জখম আথ্‌ছাট্‌ হ'য়েই থাকে। কানাইলাল সেখানে উপস্থিত ছিল। প্যারী-খুড়োরা এক ফৌজদারী জুড়ে দিয়ে তা'কে সাক্ষী মান্য করেছে। তোমার যুধিষ্ঠির আবার সত্য বই মিথ্যা বল্‌বেন না।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সে ত সত্য বই মিথ্যা কোনো দিন জানে না। তা'র দোষ কি বাবা?"

"জানে না—তা জানি। কিন্তু সংসারটা কি নিছক সত্যের উপর চল্‌ছে? তা হ'লে ত লোকে এতদিন দেউলে হ'য়ে যেত। বিষয়-কার্য্য কাউকে আর কর্‌তে হ'ত না।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তা বোধ হয় যেত না। মিথ্যে যখন এসে পড়ে, তখন লোকে আবার মিথ্যে দিয়েই তাকে বাঁচায়। তাই সংসারে এতটা কৃত্রিমতা এসে সত্যকে একপাশে ঠেলে রেখেছে। যে জমিটে নিয়ে বিবাদ, ঐ জমি তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজনের এ-কথা সত্য। এবং সেই সত্যের আশ্রয় নিলে আজ এতটা মিথ্যের মধ্যে এসে পড়্‌তে হ'ত না।"

"তা'রাই ত মিথ্যে-মিথ্যে জমিটার উপর দাবি কর্‌ছে। আমি ত সত্যই বল্‌ছি।"

মহেশ্বরী বলিলেন, "আমি শুধু তোমার কথা ত বলিনি। সংসারটার কথাই বল্‌ছি। সংসারটা সত্যপথে চল্‌লে তা'রাই বা মিথ্যা গ্রহণ কর্‌বে কেন—তুমিই বা কর্‌বে কেন? আমরা আত্মাকে মেরে ফেলে মাথাটা বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চাই।"

সুখেন্দু কহিলেন, "সে-সব ধর্ম্মকথা বিচার কর্‌লে ত আর এখন চল্‌বে না। এখন সাম্‌নে যা এসে পড়েছে সেইটে সাম্‌লাতে হবে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "দেখ, এই মিথ্যার পথ কত অতিগামী। আমরা নিজে এই জালে জড়িয়ে প'ড়ে শেষে অন্যের নিকট বিচারহীন অনুরাগ পেতে চাই। অবস্থা-বিশেষে তা'রও সত্যটুকু বিক্রয় কর্‌তে বাধ্য করি।"

"তা হ'লে তোমরা সকলে মি'লেমি'শে আমাকে জেলে পাঠাও—এই ত তোমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি বল্‌ছে?"

সুখেন্দু বকিতে-বকিতে চলিয়া গেলেন।

শৈল মাতাপুত্রের কথোপকথন দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। এবং স্বামীর বিপদের কথা শুনিয়া—সে ভয়ে একান্ত অভিভূতা হইয়া পড়িতেছিল। সুখেন্দু চলিয়া গেলে সে মহেশ্বরীকে কহিল,

"মা! এমন-একটা বিপদ্—কানাইলাল দু'একটা মিথ্যা বল্‌লে যদি বিপদ্‌টা কেটে যায়—তবে কি তা'র বলা উচিত নয়?"

মহেশ্বরী বলিলেন, "উচিত কি না সে যে বল্‌বে, সেই জানে। সুখেন আমার পেটের ছেলে, সন্তানের বিপদ্ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কোনো মাতা আপনাকে মুক্ত ক'রে নিতে পারেন না। কিন্তু সত্য দিয়ে যে গ'ড়ে উঠেছে—মিথ্যার সামান্য সংস্রবকেও যে প্রাণের বিকৃতি ব'লে জানে, তা'কে মিথ্যে বল্‌তে বাধ্য করানো যে কতবড় বিপদ্ সে আমি জানি।"

এই সময় কানাইলাল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, "মা! বড়বাবুর বিপদের কথা শুনেছ?"

মহেশ্বরী বলিলেন, "শুধু বড়বাবুর কেন—তোমারও বিপদের কথা শুনেছি।"

কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "এখন উপায়?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "জননীরা সকল সময়ই সন্তানকে সদ্‌যুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু তাদের বিপদের সময়ে মায়ের বুদ্ধি-সুদ্ধি থাকে না। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, সুখেনের যেমন বিপদ্, তোমারও সেইরূপ। মা ইচ্ছা করেন না—একটি ছেলেকে মেরে ফেলে আর একটিকে বাঁচাতে। কিন্তু দু'টি ছেলেই যে কি উপায়ে রক্ষা পেতে পারে, তা ত বাবা আমি ভেবে উঠ্‌তে পারিনে!"

মহেশ্বরী ভাবিতে লাগিলেন। কানাইলাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরে সে কহিল, "কিন্তু তুমি ভিন্ন আর কে আমাকে পরামর্শ দেবে?"

মহেশ্বরী বলিলেন, "সে জানি। কিন্তু বিষয়-বুদ্ধি আমার কিছুই নেই, বাবা। বিশেষ দু'টি ছেলেব বিপদে কি আমার জ্ঞানবুদ্ধি সুস্থ আছে? পরস্পর আড়ি না ক'রে এক হ'য়ে দুজনায় যাতে রক্ষা পাও এমন কোনো সুপথ বেব করার চেষ্টা দেখ। আমি আর কি বল্‌ব?"

কানাইলাল আর-কিছু বলিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মোকদ্দমার দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। সুখেন্দুর চিন্তাও উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। মোকদ্দমায় জয়ী হইবার জন্য তিনি অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থা সমস্তই করিলেন ; কিন্তু কানাইলালকে হস্তগত করিতে না পারিলে তাঁহার সকল উদ্যোগ আয়োজনই যে ব্যর্থ হইবে। তিনি আর-একদিন তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "মোকদ্দমার দিন ত ঘনিয়ে এল। কি স্থির করলে ? আমার মান-সম্ভ্রম রাখ্‌তে সামান্য এক-আধটু মিথ্যা বল্‌লে কোনো দোষ হবে না। আমার কথা শোনো, ভালো ক'রে ভেবে দেখ।"

কানাইলাল অবনত মস্তকে বলিল, "মায়ের নিকট তেমন শিক্ষা আমি পাইনি।"

"তা না পে'তে পারো, কিন্তু আমার বিপদটা ত তোমার দেখা উচিত! সেটাও তোমার কর্ত্তব্য ব'লে শিখেছ।"

কানাই কহিল, "জোর ক'রে বিপদ টেনে এনে বিপদ্‌টা বাড়িয়ে তোলাও বোধ হয় উচিত হয়নি।"

"সে যা হয়নি তা নিয়ে মাথা ঘামালে কোনো ফল হবে না। এখন বিপদ্‌টা কিসে কাটে তাই দেখ্‌তে হবে।"

কানাই সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "সে আপনি দেখ্‌তে পারেন। কিন্তু অন্যকে টেনে নিয়ে তা'র বিপদ্ বাড়িয়ে দেওয়া কি আপনার উচিত ?"

সুখেন্দু কহিলেন, "বিপদ্-বিপদ্ ক'রেই ত আজ কয় দিন মাথা কাটাকাটি করছ। তোমার কি বিপদ্ শুনি ?"

কানাই বলিল, "বিপক্ষেরা কেন যে আমাকে সাক্ষী মান্য করেছে

আপনি বুঝেন। সেইটি আজ রসাতলে দিয়ে এলে তাদের ক্ষতি খুব কমই, কিন্তু আমার যে কি ক্ষতি হবে সে আপনি বুঝ্‌বেন না।”

সুখেন্দু রুষ্টস্বরে কহিলেন, “না—বু’ঝে-সু’ঝে তুমিই কেবল সর্ব্বজ্ঞ হ’য়ে পড়েছ। আমার অন্নে দেহ পুষ্ট ক’রে একথা বল্‌তে তোমার মুখে কিছুমাত্র আট্‌কাল না?”

সুখেন্দু দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

কানাইলালের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে ধীরে ধীরে পুষ্পোদ্যানে আসিয়া একখানি বেঞ্চের উপর বসিল। বিধাতা কেন এই নিঃসহায় নির্ব্বান্ধব যুবকের জন্য এমন কঠিন পরীক্ষার আয়োজন করিলেন? সে একবার ভাবিল, সুখেন্দু তাহার নিকট যে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বাস্তবিক সে তাঁহাদের অন্নে পুষ্ট হইতেছে, এমন কি তাঁহাদেরই কৃপায় সংসারের মাঝে পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে। তাঁহাদের বিপদে যদি সে কিছুমাত্র সাহায্য করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার জীবন-ধারণই বৃথা। এমন অকৃতজ্ঞ সাজিয়া পৃথিবীতে বাস করা আর যাহার পক্ষে সম্ভব হউক না কেন, তাহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্তু যেটা তাহার স্বভাবগত, সে চিরন্তন সনাতন সত্যকে ত্যাগ করিয়া সে তাহার প্রাণেব স্পন্দনকে অন্য কিছুতেই জাগাইতে পারে না। তাহার মনুষ্যত্ব যাচাই করিতে অন্দরের প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া কেহ যে কোনো দিন এমন ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ করিয়া দিবে, তাহা সে স্বপ্নেও মনে করিতে পারে নাই। সে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল, সুখেন্দুর স্বপক্ষে সাক্ষ্য না দিলে এ-বাড়ীতে মাথা হেঁট করিয়া বাস করা বিষের ছুরির ন্যায় তাহার অঙ্গে বিঁধিবে। তাহার মহেশ্বরী-মাও সে-আঘাত হইতে রক্ষা পাইবেন না। আর এ-বাড়ী ছাড়িয়া গেলে তাহার মহেশ্বরী-মাকে [illegible]সরাধিক

কাল যে কঠোর যন্ত্রণায় দগ্ধ করা হইয়াছে, তাহারও পুনরভিনয় করিতে হইবে। সে অনেকক্ষণ বসিয়া-বসিয়া ভাবিল, কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

একমাত্র মহেশ্বরীর স্নেহলাভ ভিন্ন সংসারে কোনো কিছুতে ত তাহার প্রয়োজনই ছিল না। সে একাকী নিরালায় দাঁড়াইয়া মায়ের চরণে সংসারের সকল সুখ, সকল সম্পদ্ একীভূত করিয়া উপভোগ করিতেছিল। তবে কেন বিধাতা অন্যের সম্পদ্ ও সম্মানের সহিত জড়ীভূত করিয়া এমন পরাজয়ের অন্তঃপুরে আনিয়া তাহাকে উপস্থিত করিলেন? সে কোনো দিকে কোনো কূলকিনারা না দেখিয়া বিষণ্নমনে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

মোকদ্দমার চা'র পাঁচ দিন পূর্ব্বে সুখেন্দু আসিয়া মহেশ্বরীকে বলিলেন, "মা! কোনো কিছু ব্যবস্থাই ত কর্‌লে না। ছোঁড়াটাকেও বাগে আন্‌তে পার্‌লাম না। দুধকলা দিয়ে কালসাপ পু'ষে এখন আমারই গায়ে ছোঁ মার্‌বে দেখ্‌ছি। সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি হাতে সঁ'পে দিয়ে বড় ক'রে রাখ্‌লাম—বাড়ীঘর, জমাজমি ক'রে দিলাম—এখন দেখ্‌ছি সবই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। জাতের কাঁটা না হ'লে কি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে? কিন্তু এও আমি ব'লে রাখ্‌ছি মা, ছোঁড়া যেন সে-বাড়াতে আর পা না দেয়। বাগান-সমেত পাকা বাড়ীটা বিলি কর্‌লে লোকে এখনি হাজার-দশেক টাকা সেধে বাড়ীতে তু'লে দিয়ে যাবে। আমার অমন দুষ্ট বলদের দর্‌কার করে না।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "ছি! বাবা! এ-সব কথা মুখে আন্‌তে নেই। নিজের স্বার্থ ষোলো আনা পূর্ণ হ'য়ে ঘরে না উঠ্‌লে মানুষের চোখ-দুটো অন্ধ হ'য়ে যায়। সে-অন্ধ-চক্ষে কৃত্রিম যেটা তা'কেই সে দেখ্‌তে পায়; আসল রূপের সঙ্গে পরিচয় হয় না। হাঁ বাবা! কানাইলালের সাক্ষ্যের উপর সত্যসত্যই তোর জেল হবে মনে করিস্?"

সুখেন্দু দুঃখের সহিত বলিলেন, "দুশো দিন তোমাকে ব'লে-ব'লে

বোঝাচ্ছি—আর এখন মরণকালে তুমি বল্‌ছ—সত্যসত্যই তোর জেল হবে? তুমি জান না যে দান-ধ্যান এবং পরের আপদে-বিপদে সাহায্য ক'রে ওর নাম এদেশ সেদেশ হ'য়ে পড়েছে। যাঁর এজলাসে বিচার হবে স্বয়ং সেই ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব-পর্য্যন্ত ওর সাধুতায় মুগ্ধ এবং ওকে যথেষ্ট বিশ্বাসও করেন। সেবার দুর্ভিক্ষের সময় সাহেবকে ব'লে এল যে, 'দশ হাজার টাকা পাঁচদিনের মধ্যে তু'লে দেবো।' ও-ছাড়া আর যাঁরা কথা দিয়েছিলেন কেহই সে-কথা রাখ্‌তে পারেননি। একমাত্র ওই যদি আমার পক্ষ হ'য়ে বল্‌তে পারে ত বাঁচ্‌তে পারি, নচেৎ জেল অনিবার্য্য।"

মহেশ্বরী ভাবিলেন, "দেশসুদ্ধ লোক যার সাধুতায় বিশ্বাস করে—ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবও করেন, আজ তা'কেই সেই সত্য হ'তে বঞ্চিত কর্‌তে হবে?" সুখেন্দুর মুখে এই অপ্রত্যাশিত সত্যগ্রহণের কথা শ্রবণের ফলে তাঁহার প্রাণের কোন্‌খানে অতি নির্জ্জনে যেন আনন্দের ধারা বহিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু বিষাদের সমস্ত চিহ্নটাই মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "কিন্তু বাবা! এ-জেল হবে না। আমি নিয়তই যে ভগবানকে ডাক্‌ছি।"

সুখেন্দু রাগিয়া কহিলেন, "তোমাদের মেয়েলোকের বুদ্ধিসুদ্ধিই আলাদা। ভগবান্ যাকে দিয়ে বলাবেন সেই যদি না বলে, তবে তিনি এসে কি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ব'লে যাবেন? ওসকল বাজে কথা রেখে দাও, এখনও যদি তা'কে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলাতে পারো দেখ; নচেৎ আমি ঠিক এই ব'লে দিয়ে যাচ্ছি, যে, এবাড়ীতে যদি ওকে দেখ্‌তে পাই—একটা অনর্থ ঘট্‌বে।"

কানাইলাল মহেশ্বরীর সহিত দেখা করিতে আসিতেছিল। দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া সকল কথাগুলিই সে শুনিল এবং ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গভীর অন্ধকারে তখন চারিদিক অন্ধকার হইয়া উঠিতেছিল। সুখেন্দুর তর্জ্জনী শাসনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত অভিভূত হইয়া কানাইলাল পুকুরের ঘাটে নির্জ্জনে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। একটা জীবনময় ক্রূর স্বপ্ন বিরোধের মধ্য দিয়া চলন্ত গ্রহের মত সমান বেগে চলিয়াছে—থামিয়া দাঁড়াইতে যেন শেষ আশ্রয় নাই। শৈশবের কথা সে এখনও ভুলিতে পারে নাই। সে-বয়সে যে-আঘাত করিতে লোকে আগু-পিছু করিত না, সে-আঘাত এখন অদৃশ্য ও অজ্ঞাত রূপ ধারণ করিয়াছে মাত্র; কিন্তু রক্তের তালে তালে নাচিতেছে। কানাইলাল ভাবিতেছিল, দুর্ব্বলের বুকে স্পন্দন তোলাই বোধ করি সৃষ্টির অকৃপণ লীলাশক্তি!

মহেশ্বরী অনেকক্ষণ তাহাকে গৃহে না দেখিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে ঘাটে আসিলেন। দূর হইতে তাহার উপর চোখ পড়িবামাত্র তাহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার পা-দুখানি থামিয়া গেল। তিনি দেখিলেন,—তাঁহার সে প্রেম-রস-পুষ্ট জীবন-ধারার গতি-পথটি গ্লানির আবর্জ্জনায় যেন আটকাইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। সে সুদীর্ঘ অবয়ব—প্রশান্ত ললাট—ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িবার জন্য যেন সম্মুখের দিকে ঝুঁকিতেছে! মহেশ্বরী পুত্তলিকার মত নিশ্চল দেহে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সুখেন্দুর মুখে জাতির খোঁটা এবং দুধ কলা দিয়া কালসাপ পুষিবার শ্লেষবাক্য কানাইলাল আজ কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। শিশু বুদ্ধির বশে তারিণীর মত অনেকেরই উপদ্রবের তীব্রতা যাহার অন্তরে

তেমন উপলব্ধি হয় নাই, বয়সের গুণে—জ্ঞান-বুদ্ধি, চেতনা ও অনুভব বৃত্তির সহায়তায় সে-সকল এখন তাহারই অন্তরে বিচার-শক্তির পরিসর ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠিয়াছে। যে রহস্য-জালে সে জড়িত—সেদিন নবীনের গৃহে উপস্থিত হইয়া নিজের জাতির সে নিঃসঙ্গ আলোক-স্তম্ভটি সে নিরীক্ষণ করিয়া আসিয়াছে। মহেশ্বরীর মত মায়ের সত্যাশ্রয়ের তলে মানুষ হইয়া সে যখন জগতের ঘৃণা এড়াইতে পারিল না, তখন সে আলোক-স্তম্ভকে স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে নির্ম্মম সংসার চিরদিনই যে কৌশল সঞ্চয় করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কানাইলাল ভাবিতে লাগিল—ব্রাহ্মণ-শূদ্রে প্রভেদ থাকুক; কিন্তু অতি নিম্নতম সত্যের প্রতিও লোকের শ্রদ্ধা থাকা ত উচিত। যে ইজ্জৎ তাহার মনিবের আছে—সে ইজ্জৎ মানুষ মাত্রেরই থাকিবে না কেন? জাতির কাঁটা হইলে বোধ করি সে মিথ্যা বলিতে পারিত—আর নীতিপরায়ণও হইত। লজ্জায় ঘৃণায় ও দুঃখে তাহার দেহের সমস্ত শোণিত মাথায় উঠিয়া যেন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল। এই সত্য বলিবার অপরাধে তাহার বাস্তভিটা সাধের মাতৃনিবাস হইতেও তাহাকে বিতাড়িত করিবার জন্য তাহার মনিব ইঙ্গিত করিতেছেন। হায়! বিচিত্র সংসার! এ সংসারে মিলিয়া মিশিয়া খাপ খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারা যায় কি? কানাইলালের কপাল দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল।

মহেশ্বরী বুঝিলেন, ক্ষণকালপূর্ব্বে ইহারই সম্বন্ধে যে সকল হীন উক্তি করিতে তাঁহার পুত্রের ভদ্রতায় বাধে নাই, সে সকলই বোধ করি এ অভিমানী ছেলে শুনিতে পাইয়াছে। তিনি কাছে আসিয়া সস্নেহে ডাকিলেন,

"কানাই!"

কানাই মুখ তুলিল। মহেশ্বরী বুঝিলেন, তাহার বুকের মধ্য দিয়া বিপ্লবের ধারা নীরবে বহিয়া যাইতেছে। তিনি বলিলেন,

"এমন একলাটি বসে আছিস্ কেন ? নে—ওঠ্, বাড়ী চল্।"

কি স্নেহ! এই ত—এই ঐশ্বর্য্যেরই ভিখারী ত সে—মান-অভিমান দিয়া সে কি করিবে! ইহার নিকট আত্মমর্য্যাদা সে বিক্রয়ই বা করিল? কিন্তু জাতির মর্য্যাদা কে না করে? না—দুর্ব্বলতার বশে পৌরুষ বিক্রয় সে করিবে না। তাহার সত্যত্যাগে তাহার জাতিরই পরাজয়। জাতির পরাজয় দিয়া ব্যক্তিবিশেষের সম্ভ্রম রক্ষা সে করিবে না। কানাইলাল ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মহেশ্বরী তাহা শীতল হস্তে মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। আর্দ্র চক্ষে তিনি বলিলেন,

"চল্।"

কানাই বলিল, "কোথায় যাব আমি? আমাকে কি মিথ্যা বল্‌তে বল?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "না। যিনি সংসার চালাচ্ছেন, তিনিই তোকে বলাবেন। তোর বিবেক-বুদ্ধিতে যা' বলে তাই তুই বলিস্। ভাবনা কি? এখন চল্।"

কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি আমাকে অমন করে চাও কেন?"

মহেশ্বরী মৃদুস্বরে বলিলেন, "তুই আমাকে চাস্ কেন?"

কানাই বলিল, "আমি মাতৃহারা—তাই। তোমার ত সন্তান আছে?"

মহেশ্বরী স্তব্ধ হইয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কানাই বলিল, "তুমি বিশ্বজননী—তাই আমাকে চাও। আমাকে চিরজীবন বেদনাই পেতে হবে। তুমি আর কত সহ্য কর্‌বে বল ত?"

মহেশ্বরী এবার কথা কহিলেন। বলিলেন, "তার ভাবনা তোমার নাই। নারীজাতি পৃথিবীর মত সহিষ্ণু।"

কানাই বলিল, "তুমি জান না মা,—আমি আমার নিজের সম্বন্ধে কতটা জেনেছি। জাতের কাঁটা হলে আমার সকল দোষই গুণের হ'ত। কিন্তু

আমার গুণই দোষের হবে। তাতে তোমার সুখ নাই। তোমাকে আর কত বেদনা দেবো! তুমি বলেছ,—নারী জাতি পৃথিবীর মত সহিষ্ণু। কিন্তু বেদনা সহা—আর বেদনা না পাওয়া ত এক কথা নয়!”

মহেশ্বরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, “এত বুদ্ধি তুই কোথায় পেলি বল ত?”

“তোমারই কাছে। তুমি জান না—কালসাপের ছোবল ধরাই প্রকৃতি। তাই ঘাটালে অভিমান করে বসে থেকে তোমার মত মাকে কাঁদিয়েছি; এই বয়েস পর্য্যন্ত তোমাকে কেবল আঘাত করেই এসেছি। এমন একটা পথ খুঁজে পাই না, যাতে তোমাকে আঘাত থেকে বাঁচাতে পারি। একটা কথা মনে ওঠে, কিন্তু সেতুবন্ধের ছাড়াছাড়িতে গঙ্গার সেতুর দিকে তোমার চোখ পাকিয়ে থাকার কথা যা শুনেছি, সে ভাবনা বেশী কিছু না—তোমার ভাবনায় আমার মাথায় আগুন ধরে উঠেছে। যদি একটা পথ খুঁজে পেতাম—বেঁচে যেতাম। আর এক ঘণ্টাকাল মাথায় যদি এই রকম আগুন চেপে থাকে, আমি বাঁচ্‌ব না।”

মহেশ্বরী কহিলেন, “বালাই, অমন কথা বলে না। যিনি পৃথিবীতে এনেছেন, তাঁকে স্মরণ কর,—তিনি উপায় বলে দেবেন। ভবিষ্যৎ ভেবে অত কাতর হস্‌নে। নে—এখন বাড়ী চল্।”

কানাই চুপ করিয়া রহিল!

মহেশ্বরী বলিলেন, “ওঠ।”

কানাই বলিল, “তুমি যাও, আমি পরে যাচ্ছি।”

মহেশ্বরী বলিলেন, “সে আমি যাব না।”

বাস্তবিকই কানাইলালের সর্ব্বদেহ হইতে যেন আগুনের ঝলক বাহির হইতেছিল। সে বলিল, “তবে দাঁড়াও, আমি একটা ডুব দিয়ে আসি।”

মহেশ্বরী বলিলেন, "এখন এই সন্ধ্যেবেলায় ডুব দেয় না। বাড়ী যেয়ে মাথা ধুয়ে ফেল্‌বি।"

কানাই বলিল, "না মা, আমি আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না। তুমি দাঁড়াও, দেখি মাথাটা যদি একটু ঠাণ্ডা হয়।"

কানাই সিঁড়ি ভাঙ্গিতে লাগিল। মহেশ্বরীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কানাই জলে নামিলে, মহেশ্বরীও নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া রাখিলেন।

কানাইলালেব বিষণ্ণ মুখও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমাকে ছেড়ে দাও মা, ভয় নেই, আত্মহত্যা আমি কোর্‌ব না।"

মহেশ্বরীর মনে প্রত্যয় মানিল না। তিনি কানাইলালকে ধরিয়া রহিলেন।

কানাই দুই তিনটি ডুব দিয়া জল হইতে উঠিল। তার পর মহেশ্বরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সে গৃহে আসিল। ঘরে ঢুকিয়া সে বস্ত্র ত্যাগ করিল এবং বিছানার উপর যাইয়া শুইয়া পড়িল। মহেশ্বরী আর কিছু বলিলেন না। তিনি আহ্নিক করিতে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় তাহাকে খাইবার জন্য ডাকিতে আসিয়া মহেশ্বরী দেখিলেন, কানাই লেপ মুড়ী দিয়া শুইয়া আছে এবং যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। গায়ে হাত দিতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাতে যেন ফোস্কা উঠিয়া গেল! বলিলেন, "এত বড় জ্বর হয়েছে তোর!" আলো কাছে লইয়া দেখিলেন, চক্ষু দুটি রক্তজবার মত লাল হইয়াছে। সে মুখ বিকৃত করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইতে লাগিল। মহেশ্বরী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কপালে জলের পটি দিয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। এবং ডাক্তার ডাকিতে লোক পাঠাইলেন।

ডাক্তার আসিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। রাত্রি যতই বাড়িতে লাগিল, কানাইলাল ততই সংজ্ঞা হারাইয়া ভুল বকাবকি করিতে

লাগিল। কখন বলিল,—"মা, আমাকে আর যেচে স্নেহ দিও না, আমি তার যোগ্য নহি।" কখন বা বলিল,—"আমাকে হলপ করাইতেছেন কেন? আমি সত্য বই মিথ্যা জানি না। মিথ্যা বল্‌লে—বিচারপতি আপনি—আপনারও যে ভুল হবে।" কখন বলিল,—"বাগ্দী বলে সবাই আমাকে নিমকহারাম বল্‌ছে আর খোঁচা দিচ্ছে; আমি সত্য বলে এসেছি, তোমার ত কোন রাগ নাই মা?" মহেশ্বরী একলাটি শিওরে বসিয়া ভয়ে বিস্ময়ে শুকাইয়া উঠিতে লাগিলেন।

সকালে অল্পক্ষণের জন্য কানাইলের সহজ জ্ঞান হইল। তখন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। কানাই তাঁহার দ্বারা একখানি সার্টিফিকেট লেখাইয়া লইল। এবং আদালতে দাখিল করিয়া সাবকাশ লইবার জন্য সুখেন্দুর বিপক্ষদের নিকট পাঠাইয়া দিল। বলিয়া দিল,—যদি সে ইতিমধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিতে পারে, পাল্কী করিয়া সে আদালতে উপস্থিত হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কানাইলালের অবস্থা উত্তরোত্তর আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। দিবা-রাত্রির অধিকাংশ সময়ই সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া শয্যায় পড়িয়া থাকে। যখন একটু হুঁস হয়, তখন সে শান্তিকে দেখিতে চাহে—নলিনীকে দেখিতে চাহে। বলাই ত সর্ব্বক্ষণই তাহার শিওরে বসিয়া আছে। মহেশ্বরীর আহার-নিদ্রা ছিল না। পূজা-আহ্নিকও তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। দুইজন গ্রাম্য ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছিলেন। সহর হইতেও একজন বিচক্ষণ ডাক্তার আনান হইয়াছিল। মহেশ্বরী বলিয়া দিয়াছিলেন,—"যত টাকা লাগে দিব, আমার কানাইকে আপনারা বাঁচাইয়া দিন।" ডাক্তারেরা একত্রে পরামর্শ করিয়া বিশেষ যত্নসহকারে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন প্রকারেই তাঁহারা রোগীকে সন্তোষজনক অবস্থায় আনিতে পারিতেছিলেন না। মোকর্দ্দমার জন্য কানাইলালকে সুস্থ করিয়া তুলিবার তাড়াতাড়ি সুখেন্দুর ছিল না। এদিকে দিনও ঘনাইয়া আসিল।

শান্তি ও নলিনীকে আনিবার জন্য মহেশ্বরী লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা আসিল। তাহারা সর্ব্বদাই কানাইলালের সেবায় তাহাকে বেড়িয়া লইয়া থাকিত। কানাইলালের যখন জ্ঞান হইত, তখন সে তাহাদের সহিত দুই একটি কথা বলিত। এক সময় শান্তিকে সে বলিল, "দিদি, আমার উপর তোমার যেন একটা সঙ্কোচ এসে গেছে। কেন? বোধ করি তোমার গৃহে তোমার ননদের ব্যবহারে যে ব্যথা আমি পেয়েছিলাম আর যে লজ্জা তুমি পেয়েছিলে, তার রেশ এখনও তোমার অন্তরে লেগে আছে। তখন ছোট ছিলে, আমিও ছিলাম। এখন ত বুঝ্‌তে শিখেছ; তাঁর কোন অপরাধ নাই।" আর এক সময় নলিনীকে

সে বলিল,—"নলিনি, আমি বাগ্দীর ছেলে।" নলিনীর হাতখানা মুঠোর মধ্যে লইয়া কিছুক্ষণ সে চক্ষু বুজিয়া রহিল। তাব পর বলিল,—"তোমার মাকে এ সংবাদটা দিও।" নলিনী মনে করিল, কানাই বুঝি বিহ্বল বকিতেছে। সে জিজ্ঞাসা কবিল ; "দাদা, এখন কেমন আছেন ?"

"বেশ ভাল আছি। মাথাটা বেশ হাল্‌কা বোধ হচ্ছে।"

নলিনী বলিল, "একটু আগে যে ভুল বকে উঠলেন ?"

কানাই চক্ষু ছুটি পাকাইয়া যেন কি স্মরণ কবিতে লাগিল। বলিল,—"কৈ—না, ভুল বকিনি ত ?"

নলিনী কহিল, "আমাব মাকে সংবাদ দেওয়াব জন্য যে কথা বল্‌লেন, তার ত কোন অর্থই হয় না।"

কানাইলালের শ্রান্ত চক্ষু ছুটি নলিনীব মুখেব উপব স্থিব হইয়া বিগলিত হইবার প্রয়াস করিতেছিল। সে পাশ ফিবিয়া শুইয়া—বালিশের দিকে মুখ গুঁজিয়া কহিল, "ভুল বকি নাই বোন্, সত্যই বলেছি। যখন ঘাটালে ছিলাম—তখন এ ভুল ছিল।"

নলিনী বুঝিল এবাবও কানাই যেন ভুল বলিতেছে। সে চুপ কবিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে কানাই আবার মুখ ফিবিয়া শুইল। নলিনীব হাতখানা পুনরায় নিজের হাতেব মধ্যে লইয়া বলিল, "আমার বেঁচে থেকে লাভ নেই নলিনি, একথা মাও জানেন। কিন্তু তাঁর স্নেহ এত বেশী যে ছুটি দিতে চান্ না। এবার তাঁর দুষ্ট গ্রহের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। তোমরাও ছুটি বোনে মায়ের পাশে এসে দাঁড়ালে। এতে আমাকে কাঁদাবে—তোমরাও কাঁদবে। কিন্তু একটা সুবিধা এই হ'ল যে, তুমি বেশ বুঝে যেতে পারবে তোমার মা বাপের উপর ঘাটালের সে নিষ্ঠুরতা আমার স্বেচ্ছাচাবিতা নয়।"

জলভারে নলিনীর চক্ষু ছুটি ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। বোধ করি

কানাইলালের প্রতি তাহার জননীর নির্য্যাতনের সকল কথাগুলিই একই সময়ে তাহার মনের মধ্যে উঠিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি আশঙ্কাও তাহার মনের মধ্যে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কানাইলালের সকল কথার অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া নলিনী এই সকল আলোচনায় যোগ দিতে পারিতেছিল না। অথচ বহুকাল পরে পীড়ার সূত্রে তাহাকে কাছে পাইয়া—তাহার যে অনেক কথাই বলিবার ও শুনিবার ছিল।

মহেশ্বরী ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "নলিনি, মা, তোমরা দুই বোনে চান্ করে এস, আমি এখানে বসি।" এই বলিয়া তিনি নলিনীর হাত হইতে তালপাতার পাখাখানা নিজের হাতে লইলেন। নলিনী বলিল, "মা, দাদা বড় বকাবকি কচ্ছেন। এত বক্‌লে যে আপনিই অসুখ বেড়ে যায়।"

মহেশ্বরী বলিলেন, "আচ্ছা, আমি নিষেধ কর্‌ছি। তোমরা তাড়াতাড়ি করে একটা ডুব দিয়ে এস।"

শান্তি ও নলিনী দুইটী পিতলের ঘড়া কক্ষে লইয়া পুকুরের ঘাটে গেল। নলিনী একখানি দগ্ধ অঙ্গার চিবাইতে চিবাইতে চলিল। বলিল, "দাদা এখন বেশ কথা বল্‌ছে। কিন্তু সব কথাগুলিই যে জ্ঞানের তা মনে হয় না।"

শান্তি কহিল, "হাঁ। এখন বিকার বেশ কেটে গেছে। তোমাদের কথাবার্ত্তা দরদালানে বসে বড়-মা আর আমি সব শুনেছি। বড়-মা বল্‌লেন, এই রকম থাক্‌লে আর কোন ভয় নাই।"

নলিনী বলিল, "তিনি যে আপনাকে বাগ্দীর ছেলে বল্‌লেন! তোমরা হয়ত সকল কথা সর্ব্বান্তঃকরণে শোননি।"

শান্তি কহিল, "সত্যি ত তিনি তাই।"

নলিনী বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া তাহার করপুচ্ছ চাপিয়া ধরিল। নলিনীর মুঠোর মধ্যে শান্তির করাঙ্গুলির পর্ব্বগুলি নড়িয়া-চড়িয়া উঠিতে লাগিল।

নলিনী মৃদুস্বরে কহিল, "এ যদি সত্যি হয়—তাঁর মত সাধু—তাঁর মত সজ্জন—তাঁর মত মহৎ আমি আর একটিও দেখি নাই।"

নলিনীর মনে পড়িয়া গেল, ঘাটালে তাহার জননী বাৎসল্য-স্নেহে আত্মহারা হইয়া দৃষ্টিক্ষীণতার দরুণ তাহাদের ভাই বোনের সম্বন্ধে আঘাত করিয়া উভয়ের মধ্যে যে একটা নূতন সম্বন্ধ পাতাইয়া দিবাব জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, এই নির্লোভ সন্ন্যাসী সেই মোহে মুগ্ধ হইলে দেবতার আদর্শ হইতে আজ তিনি কতটা নিঃস্ব হইয়া পড়িতেন।

শান্তি একটা নিশ্বাস ছাড়িল। বলিল, "কি যে দুষ্কৃতির গুরুভার মাথায় করে তিনি সংসারে এসেছেন জানি না! শৈশবের খেলাঘরে যাঁকে সহোদরের মত পেয়েছিলুম স্বামীর পাকাঘরে এখন তাঁকে একখানা বসবার আসনও দিতে পারি না। এরই নাম বোধ করি অরাজকতা।"

নলিনী গম্ভীরভাবে শান্তির কথাগুলি শুনিতেছিল। সে নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "আমি মনে করেছিলুম রোগের মুখে তিনি প্রলাপ বক্‌ছেন। তিনি যে ঘরে জন্মেছেন সে ঘরটা না হয় মন্দই হ'ল; কিন্তু তিনি ত ধ্রুবজ্যোতির মত ফুটে উঠেছেন!"

শান্তি ধীরে ধীরে যাইয়া জলে নামিল।

নলিনীও তাহার অনুসরণ করিল। কানাই কেন যে তাহার জাতির সংবাদটা তাহার মাতার নিকটে পাঠাইতে বলিয়াছে, সে কথাও তখন তাহার কাছে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

শান্তি অল্প কথায় ঘাটের পথে নলিনীর চোখে যাহার পায়ে বেড়ি পরাইয়া বিচ্ছেদের ব্যবধান সৃজন করিল, তাহাকে সোদরের স্নেহ দিতে বাহিরের প্রতিকুল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে সে নাই বা পারুক, যুদ্ধের জন্য ইতস্ততঃ করিবার যে এতটুকু অবসর থাকিতে পারে নলিনী কিন্তু সে কথা মনেও ভাবিতে পারিল না। সে বলিল, "কুসংস্কারাচ্ছন্ন

সমাজের বিধি নিষেধ ভেবে চিন্তে—সতর্ক হয়ে তাঁর দিকে পা বাড়ানো চলে না, কি বল দিদি ?"

শান্তি বলিল, "সে আমিও বুঝি। এখানে বড়মার জন্য কেউ পেরে ওঠে না। সেখানে তাঁদের চিন্তার ধারা আলাদা।"

নলিনী বলিল, "একের সঙ্গে অন্যের মিলনই সৃষ্টির ধর্ম্ম। বাক্য যখন মনের সঙ্গে মিলিত হয় তখন জাতি বিচার সে করে না। মন প্রাণের সঙ্গে—প্রাণ তেজের সঙ্গে—এবং তেজ পরম দেবতার সঙ্গে মিলিত হয়। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই ত এই বিধি চলে আস্ছে। স্রষ্টার সঙ্গে মিলনে কোন দিন বাধা হয় না—মানুষের সঙ্গে বাধে এ বড় আশ্চর্য্য।"

শান্তি কহিল, "কি জানি—এরা বিচ্ছেদকেই ধর্ম্ম বলে মনে করে।"

নলিনী আর কিছু বলিল না।

তাহারা তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া দুই বোনে কানাইলালের ঘরে আসিল। দেখিল, মহেশ্বরী সেইরূপই বসিয়া কানাইলালের গাত্রে হাত বুলাইতেছেন, আর তাহার প্রশ্ন সকলের উত্তর দিতেছেন। তাহারা উভয়ে রোগীর বিছানার উপর মহেশ্বরীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল। কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "মা, জাতের কাঁটা আমি না হ'তে পারি। কিন্তু এ ব্যবধান প্রকৃতিগত কি না শুধু সেইটুকু তুমি আমাকে বল।"

মহেশ্বরী নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

কানাই বলিল, "কথা বলো মা! আমাকে স্পষ্ট করে না শুনালে শুধু অন্তরের ব্যাকুলতা দিয়ে এই ছন্দহারা জীবনটা কি তুমি ধরে রাখ্তে পার্বে ?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তুমি যা' শুন্তে চাইছ তাতে মতবিরোধ আছে। যতদিন এই মতের সমন্বয় না হবে ততদিন আমার কাছে একটা কিছু শুন্লেও তোমার মনের দ্বন্দ্ব ঘুচ্বে না।"

কানাই বলিল, "কিন্তু আমার জাতির বিশেষত্ব যেটুকু সেইটুকুই আমার সম্পদ। আমার চোখে ঠুলী দিয়ে তা' ঢেকে রাখ্তে চাও কেন?"

মহেশ্বরী বলিলেন, "সংসারে জাতি একটা নয়—অ. প্রত্যঙ্গ নিয়ে অনেকগুলি। কিন্তু সর্ব্বদেহে রক্ত সঞ্চারিত হইবার হৃৎপিণ্ড একটি। এই কথাটা মনে রাখ্লে ঘৃণা থাকে না—ঈর্ষা থাকে না—ছোট বড় ভাব কল্পনাও থাকে না। কোন্ কুলে কার জন্ম এখন শুধু এই গৌরবের ব্যস্ততায় পরস্পব ফাঁক হ'য়ে যাচ্ছে।"

কানাই বলিল, "মা, আমি বড় হতে চাই না। আমার উপর আর আমার জাতির উপর লোকের ঘৃণাটা না থাকত!"

মহেশ্বরী বলিলেন, "যদি আমি তোমাকে মানুষ করে তুল্তে পারি, এ ঘৃণা একদিন যাবে। একটার আধিক্য হলে অপরটা চাপা পড়ে যায়। তোমাতে সেই গুণের আধিক্যই আমি পেতে চেয়েছি। তখন আর লোকের মনে জাতির সম্মানের খেয়াল থাক্বে না।"

নলিনী বলিল, "বড়মা ঠিক কথাই বলেছেন। অনেক সাধু সন্ন্যাসীর পদধূলি দেখেছি শ্রেষ্ঠ বর্ণের লোকেরাও সাগ্রহে মাথায় তুলে নেয়। অথচ তাঁদের জাতি সম্বন্ধে খোঁজ কর্বার কল্পনাও লোকের মনে ওঠে না।"

কানাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আর কি জান্ব! নলিনী ছেলেমানুষ, তাই আমাকে এ সকল শুনাচ্ছে। বোঝে না যে তাঁরা কত মহৎ, আর আমি কত হীন।"

মহেশ্বরী বলিলেন, "এ সকল তোমাকে জানিয়ে শুনিয়ে গড়ে তুল্ব সে ইচ্ছা আমি করি নাই। যাক্—কিন্তু সব চেয়ে বড় জানা আর বড় সান্ত্বনা এই যে, তুমি ও আমি একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেরই বিকার বা পরিণাম।"

কানাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আজ মো ন্দ্দমার দিন। আদালত গৃহে লোকে লোকাবণ্য হইয়াছে। কানাইলাল মনিবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে—সে কি বলে, কি করে দেখিবার জন্য গৃহে লোক ধরিতেছে না।

যথাসময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এজলাসে আসিলে মোকর্দ্দমার শুনানি আরম্ভ হইল।

ফরিয়াদী পক্ষ সর্ব্বপ্রথমে কানাইলালের পীড়াব সার্টিফিকেট সহ সাবকাশের জন্য দবখাস্ত দাখিল কবিলেন। একটিমাত্র সাক্ষীর অনুপস্থিতির কাবণে—সাহেব প্রথমতঃ সাবকাশ দিতে অনিচ্ছুক হইলেন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, ঐ একটিমাত্র সাক্ষ্যের উপরই ফরিয়াদীপক্ষ বিশেষ নির্ভর করিতেছেন, তখন তিনি এক সপ্তাহের সাবকাশ দিলেন। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যেও কানাইলাল আরোগ্য হইল না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সুখেন্দু সকাল সকাল আহার করিয়া কাছারী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবং একবার কানাইকে দেখিতে আসিলেন। সেদিন তাহার অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি ডাক্তারের মুখে শুনিয়াছিলেন মানসিক উত্তেজনার দরুণ রোগীর মস্তিষ্কে অত্যধিক রক্ত সঞ্চিত হইয়াছে। হয়ত আপনা আপনি সুফল দিতে পারে, ঔষধ-পত্রের দ্বারা বিশেষ ভরসা করা যায় না। সুখেন্দু চিন্তিত মনে কাছারী চলিয়া গেলেন।

শান্তি ও নলিনী প্রাণপণ যত্নে কানাইলালের সেবা করিতেছিল। কিন্তু সেদিন কানাইলালের এক একটা লক্ষণ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তাহাদের হাত পায়ের জোর কমিয়া যাইতেছিল। তাহারা দেখিতেছিল সর্ব্বনাশের শেষ মুহূর্ত্ত পায় পায় ধাইয়া আসিয়া কানাইলালকে যেন পরদার আড়ালে

ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। মহেশ্বরী একবার রোগীর শিওরে একবার ঠাকুর ঘরে ছটফট্ করিয়া বেড়াইতেছেন। যখন কানাইলালের জন্য প্রার্থনায় বসিতেছেন তখনও গৃহের সমবেত কণ্ঠের একটা বিপদ-জ্ঞাপক আর্ত্ত ঝঙ্কার যেন অতর্কিতে কর্ণের ছিদ্র পথে ঢুকিয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় তাঁহার মন-প্রাণ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। শৈলবালারও রান্নায় মন বসিতেছিল না। সে এক একবার হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া কানাইলালকে দেখিয়া যাইতেছিল।

কানাই এতক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিল। কিন্তু তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস জোরে জোরে বহিতেছিল। সে এক সময় বাম হস্তে জলের পটিটা কপাল হইতে তুলিয়া ফেলিয়া নলিনীর হাতের পাখাখানিও কাড়িয়া লইল। তার পর শান্তি ও নলিনীর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া সে যেন দৃষ্টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আর কাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। নলিনী জিজ্ঞাসা করিল,

"দাদা, কা'কে খুঁজ্ছ? বড়মাকে ডেকে দেবো?"

কানাই ঘাড় নাড়িল।

শান্তি যাইয়া মহেশ্বরীকে ডাকিয়া আনিল।

মহেশ্বরী আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার অঞ্চলের নিধি—নিষ্ঠুর সংসারে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের সহচর—অনাথ বালক মাতৃক্রোড় শূন্য করিয়া কোন্ অজানা দেশে যাইবার জন্য বুকের খাঁচা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতেছে!

মহেশ্বরীর মাতৃহৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। যে সন্ধানে সে ব্যাকুল হইয়া ফিরিতেছে সেই সত্যের সন্ধান করিতে না পারিবার দরুণই বুঝি সে এমন নিষ্ঠুরের মত ছাড়িয়া চলিয়াছে! তথাপি তিনি ভাবিলেন ঘাটালে ক্ষুধার তাড়নায় সে যেমন অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল—কিবা পথ্য খাইতেছে—আজও বুঝি ক্ষুধার জ্বালায় সেইরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছে। তিনি

তাহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কানাই, এমন হলি কেন বাবা ?"

কানাইলাল একবার মহেশ্বরীর দিকে বিকট দৃষ্টিতে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

মহেশ্বরী সর্ব্বান্তঃকরণে যাহা ভাবিতে পারিতেছিলেন না তাহাই ভাবিয়া তাঁহার দেহ কাঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন,

"বাবা, আমি ত কোন অপরাধ করি নি। আমাকে ছেড়ে যাস্ নি।"

কানাইলালের যেন একটু চেতনার সঞ্চার হইল। সে মহেশ্বরীর হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"ছোট মা ?"

শৈলবালা শিওরের কাছেই ছিলেন। তিনি সম্মুখে আসিয়া বসিলেন।

কানাই বলিল, "মাতৃনিবাস থেকে আমাকে বঞ্চিত কোর না।"

শৈল বলিল, "না বাবা, তুমি ভালো হয়ে ওঠ। বলা'র সহোদর যে—সে কি আঁমাদের কৃপার পাত্র যে ভিক্ষা চাইবে ? তোমার মাতৃনিবাস ত এখনও পূর্ণ কলেবর পায় নি। শত সহস্র নর-নারী যাতে তোমার মাতৃনিবাসের পবিত্র ধূলি মস্তকে ধারণ ক'রে, সে ব্যবস্থা আমরা করে দেবো।"

কানাই স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, "বলা ?"

বলাই সরিয়া বসিয়া সাশ্রু নেত্রে তাহার করপুচ্ছ নিজের হাতে লইল।

কানাইলাল মহেশ্বরী ও শৈলর পদধূলি চাহিয়া লইয়া—শান্তি, নলিনী, বলাই, শৈল ও মহেশ্বরী—যাঁহারা তাহাকে বেষ্টন করিয়া লইয়া বসিয়াছিলেন, একে একে সকলের দিকে সে দৃষ্টি ফিরাইতে লাগিল। ক্ষীণ কণ্ঠে

সে বলিল, "এই আমার স্বর্গ।" কিন্তু তখনি তখনি তাহার চক্ষু দুটি যেন আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল।

ধৈর্য্যের বাঁধ বুঝি আর থাকে না। মহেশ্বরী অধীর হইয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "আর আমি পারিনে—এইবার তুমি আমাকে নাও।"

এই সময় সুখেন্দু কাছারী হইতে গৃহে ফিরিলেন। রকের উপর শৈলকে দেখিতে পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মা কোথায়?"

শৈল বলিল, "পূজোর ঘরে।"

সুখেন্দু সরাসরি পূজার দালানের বারাণ্ডায় যাইয়া ডাকিলেন, "মা, মোকর্দ্দমায় আমার জয়লাভ হয়েছে।"

মহেশ্বরী হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিলেন এবং সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এমন সময় শান্তি ও নলিনী গোলমাল করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মহেশ্বরী সুখেন্দুকে সঙ্গে লইয়া ত্বরিত পদে তথায় ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু তিনি শত-চক্ষু মেলিয়া কানাইলালকে নিরীক্ষণ করিতে যাইয়া দেখিলেন যে বুকে স্পন্দন নাই। "বাবা আমার!" বলিয়া মহেশ্বরী সে মৃত্যু-মলিন দেহের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। ডাক্তার যাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন সে দেহেরও স্পন্দন ফুরাইয়া গিয়াছে। যে-চক্ষে ইতর-বিশেষ নাই, সেই উদার চক্ষে বাগ্দীর ছেলেকে লইয়া মহাপ্রাণা ব্রাহ্মণ-জননী মহা-নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। আর সুখেন্দু?—জড়ের মতন—পাথরের মতন বসিয়া বসিয়া মাতা ও পুত্রের সে মহামুক্তি দর্শন করিতে লাগিলেন!

সমাপ্ত